# বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন

অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

# বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন



অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ,
জেনারেল প্রিন্টার্স র‍্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রথম সংস্করণ
জন্মাষ্টমী, ১৩৭০

মূল্য—পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর : শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস
১৮৬।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৪
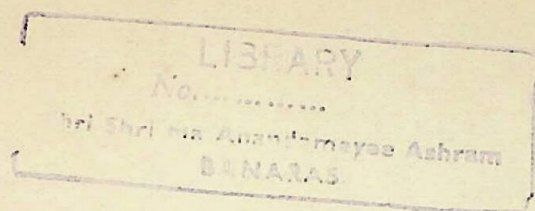
যাঁদের মহান জীবনে বিবেকানন্দের বৈদান্তিক
জীবনাদর্শের জীবন্ত রূপায়ণ দেখে আমি ধন্য,
সেই
পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ
ও
পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে
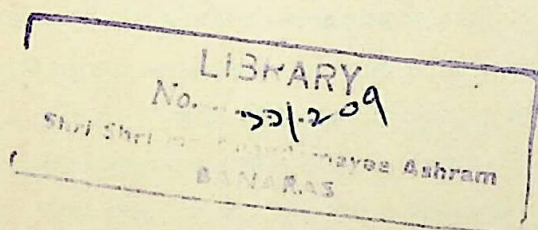
## নিবেদন

'বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ'—কথাটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় লাভ ঘটে মনীষী অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয়ের নিকট হ'তে ১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে। অধ্যাপক সরকার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বিবেকানন্দের তেজোময় রূপ ও অগ্নিময় বাগবিন্যাস এমন ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন যে, আমরা জীবন্ত দেখতে পেয়েছিলাম সেই নরোত্তমকে যাঁর মানুষের জন্য ভালবাসার অন্ত নেই, বেদনারও অন্ত নেই। কিন্তু বিবেকানন্দ একজন অবৈজ্ঞানিক রোমান্টিক সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের এ সিদ্ধান্ত আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। কারণ বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত থাকায় জানতাম যে যুক্তি-পরিপন্থী ও বিজ্ঞান-বিরোধী এমন একটি কথাও তিনি বলেন নি, বরং তাঁর চিন্তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর অপূর্ব যুক্তিবত্তা ও ঐকান্তিক বৈজ্ঞানিকতা। কার্যতঃ সেজন্য অধ্যাপক মহাশয়ের উক্ত মন্তব্য শোনবার পর হ'তেই আমার অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ হয়।

আমার কার্যের প্রধান লক্ষ্য হয়েছে বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসন্ধান। ১৯৪৮–৪৯ সালে অধ্যাপক সরকারের ছাত্র অধ্যাপক ত্রিলোচন দাস একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করেন 'The Social Philosophy of Swami Vivekananda' নাম দিয়ে। পুস্তিকাখানি অধ্যাপক সরকারের অভিমতেরই প্রতিধ্বনি। ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত তাঁর 'Swami Vivekananda—The Patriot-Prophet' গ্রন্থে প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-চিন্তার পশ্চাতে অবস্থিত পুরাতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতামতের তথ্যবহুল আলোচনা করতে প্রয়াসী হ'ন।

কিন্তু তাঁর আলোচনার উদ্দেশ্য বিবেকানন্দের মতামতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসন্ধান ছিল না, ছিল বিবেকানন্দ যে মার্কসবাদের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত তাই প্রমাণ করা। পূর্বপোষিত এ ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে অগ্রসর হওয়ায় তাঁর আলোচনা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি। শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁর 'ভারতের সাধনা' নামক অধুনা লুপ্তপ্রায় গ্রন্থে বিবেকানন্দের মতামতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদর্শনের প্রচেষ্টা করেন, কিন্তু সে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় বিবেকানন্দের একটি মাত্র সমাজ-চিন্তা—'জাতীয় বৈশিষ্ট্য-তত্ত্ব', সমাজতন্ত্রবাদের কোন আলোচনা তাতে সন্নিবেশিত হয় নি। ভূতপূর্ব 'উদ্বোধন' সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সুন্দরানন্দ মহারাজ .৯৫২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' 'স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজতন্ত্রবাদ' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এ বিষয়ে প্রভূত আলোকপাত করেন। জীবব্রহ্মবাদই, মার্কসবাদ নয়, বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি—এ কথাই তিনি সেখানে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। তিনি বিবেকানন্দের সামগ্রিক সমাজ-চিন্তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসন্ধান করবার প্রয়াস পান নি।

আমার পূর্বে যাঁরা বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন বা সমাজতন্ত্রবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা কেউই স্বামীজীর চিন্তার পশ্চাতে অবস্থিত বৈজ্ঞানিকত্ব বিচার করতে প্রয়াস করেন নি। সেজন্য পূর্বসূরীদের গবেষণার কোন ভিত্তি আমি পাই নি। ফলে আমাকে পদে পদে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিশেষ করে অসুবিধার কারণ, স্বামীজী নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উক্তির মাধ্যমে তাঁর ধারণা সমূহ উপস্থাপিত করেছেন—তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলীর মধ্যে সেগুলি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এজন্য তথ্য-সংগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ কাজ হয়েছে। তাছাড়া তাঁর চিন্তারাশির এমন ব্যাপকতা আছে এবং তাঁর মধ্যে জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রের এত বিচিত্র চিন্তাসমূহ স্থানলাভ করেছে যে, তাঁর বিচ্ছিন্ন উক্তিগুলি প্রথমে পরস্পর-বিরোধী বলে বোধ হয় এবং কখনও কখনও পাঠকের বিভ্রান্তি

ঘটায়। এদের মধ্যে যে সংযোগ সূত্র আছে তা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত আয়াসসাধ্য কাজ। সেজন্য তথ্য-সংগ্রহ হতেও তথ্য-সংযোজনা আরও দুরূহ ব্যাপার। সর্বোপরি বিবেকানন্দ তাঁর সমাজ-দর্শনের উপাদান স্বরূপ ব্যবহার করেছেন—দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, মিশরীয় তত্ত্ব, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও অন্যান্য মানব-বিদ্যা, বিশ্বের বহু বিভিন্ন দেশের বিচিত্র পুরাকাহিনী (Mythology—তাদের বৈজ্ঞানিক বিচারসহ), নানা ধর্মের আকর শাস্ত্রগ্রন্থ, যথা, বেদ (তার বিভিন্ন ভাষ্যসহ এমন কি বহু অপরিচিত ও লুপ্তপ্রায় ভাষ্যসহ) বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি (তাদের ঐতিহাসিক বিচারসহ)। দীর্ঘকাল ধরে কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করলেও এই সকল উপাদানের সম্যক্ পরিচয় গ্রহণ ও পরিমাপ করা যে কোন একজন গবেষকের পক্ষে সাধ্য নয়। বিপুল জ্ঞানরাশি সহায়ে বিবেকানন্দ অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে যে সকল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা নানা ভাবোদ্দীপক, নানা তাৎপর্যপূর্ণ ও জীবনের বহুক্ষেত্রে সেগুলির প্রয়োগ। এ-সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য সূত্র খুঁজে না পেলে তাঁর মধ্যে যে বিজ্ঞান-সিদ্ধ অপূর্ব লজিকাল চিন্তা-পদ্ধতি আছে তার সন্ধান মেলে না। তার সন্ধান পেতে হলে শুধু তাঁর ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক উপাদানই নয়, তাঁর চিন্তাধারার পশ্চাতে অবস্থিত অন্য দু'টি উপাদানকেও যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হয়। এ দু'টি উপাদান—প্রত্যক্ষ অনুভূতি-লব্ধ সত্যজ্ঞান ও নানা দেশের গণ-মানসের প্রত্যক্ষ পরিচিতি। বিবেকানন্দ নিছক সমাজতত্ত্ববিদ্ নন, শুধু মনীষী বিদ্বান নন, তিনি সত্যদ্রষ্টা। তাঁর সত্যদৃষ্টিতেই সেই অদৃশ্য সংযোগ-সূত্র আছে যা সব কিছু বিপরীতকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

তাঁর মত সত্যদ্রষ্টা মহামনীষীর বিপুল জ্ঞান ও বিদ্যা সামগ্রিক ভাবে আয়ত্ত করব বা তার সম্যক পরিচয় আমি দিতে পারব, এমন অসম্ভব স্পর্দ্ধা আমি কখনও করি না। আমার সামান্য জ্ঞান, সঙ্কীর্ণ বিদ্যা, ক্ষুদ্র শক্তি, অকিঞ্চিৎকর অধ্যবসায় ও অনিশ্চল নিষ্ঠাদ্বারা আমি তাঁর বিপুল চিন্তা ও মননশক্তির যৎসামান্যই উপলব্ধি করতে

পেরেছি। প্রথম প্রয়াসের নানা প্রকার অসুবিধার দরুন এই রচনায় যে সব অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে। সহৃদয় পাঠক তা আমার গোচরে আনলে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ হ'ব।

এই অনুসন্ধান কার্যে আমাকে প্রথম পথ-প্রদর্শন করেন আমার পিতা শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত মহাশয় ( 'শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী' ও 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ-দ্বয়ের প্রণেতা ) স্বামীজীর 'Privilege ও 'Vedanta and Privilege' শীর্ষক বক্তৃতাদ্বয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি এ দুইটি বক্তৃতায় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সুপণ্ডিত প্রাচীন সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী বাসুদেবানন্দ মহারাজের নিকট হতে প্রভূত সহায়তা লাভ করেছিলাম তাঁর নির্দেশনায় নানা শাস্ত্র-গ্রন্থ ও আধুনিক দর্শন-শাস্ত্র পড়বার সুযোগ পেয়ে। অনুরূপভাবে আমার ধারণা গঠনে সহায়তা পেয়েছিলাম বেলুড় মঠের অপর শাস্ত্রজ্ঞ এবং প্রাচীন ও আধুনিক সামাজিক ইতিহাসে সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দ মহারাজের সঙ্গে নানা সময়ে নানা আলোচনায়। পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ পরিশোধ্য নয়। তাই আমি এখানে ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এঁদের সকলের উদ্দেশ্যে অর্পণ করে আমার অপরিসীম ঋণের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করছি। এঁদের মধ্যে শ্রীমৎ স্বামী বাসুদেবানন্দজী ও যাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে আমি প্রথম আলোক লাভ করেছিলাম সেই মনীষী অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয় আজ লোকান্তরিত।

এ সম্বন্ধে আমার প্রথম রচনা-'বিবেকানন্দের সাম্যবাদ' ১৯৪৮ সালে 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সম্পাদিকা শ্রীমতী মালবিকা দত্তের সৌজন্যে; দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'সমাজসংস্কৃতির রূপান্তর' 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী কর্তৃক পরিমার্জিত হয়ে। এ গ্রন্থের সূচনা ঠিক ঠিক হয় ১৩৬৬ সালে যখন বর্তমান 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের অনুরোধে 'বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন' নাম দিয়ে তিনটি প্রবন্ধ 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য রচনা করি এবং এ গ্রন্থ পূর্ণাবয়বত্ব প্রাপ্ত হয়

যখন বর্তমান বিবেকানন্দ-শত-বার্ষিকী বৎসরে অপর একটি প্রবন্ধমালা রচনার জন্য অনুরোধ পাই সম্পাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজের নিকট হতে। এই প্রবন্ধগুলি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ( আশ্বিন ১৩৬৯, অগ্রহায়ণ ১৩৬৯—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০ ) প্রকাশিত হয়েছে 'সমাজতন্ত্রবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ' শিরোনামা নিয়ে। প্রথম দু'একটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই লেখাগুলি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং অনেকেই আমাকে এবিষয়ে গ্রন্থ-প্রকাশনের অনুরোধ জানান। এ সময়েই জেনারেল প্রিন্টার্স ও পাবলিশার্সের সহৃদয় স্বত্বাধিকারী শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এ বিষয়ে গ্রন্থ-প্রকাশনের দায়িত্ব গ্রহণ করবার অভিপ্রায় আমাকে জানান। এঁদের সকলের কাছে উৎসাহ, প্রেরণা, সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমি অশেষ ঋণী এবং তজ্জন্য আমি এখানে এঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এছাড়া নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করে দিয়ে এবং অন্যান্য নানা প্রকারে আমাকে সাহায্য করেছেন প্রতাপচন্দ্র-স্মৃতি-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীনরেশচন্দ্র বসু। তাঁর কাছেও সকৃতজ্ঞ ঋণ-স্বীকৃতি এখানে রাখছি। শ্রীসুরেন্দ্র প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় অতি দ্রুত মুদ্রণ-কার্য শেষ করে দিয়ে আমাকে যে সহায়তা করেছেন তার জন্যে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই আমার চারপাশের বর্তমান যুগের প্রত্যেকটি মানুষকে, যাদের প্রত্যয়হীনতা ও সংশয়ের বেদনা আমাকে সত্যানুসন্ধান করতে অনুক্ষণ প্রেরণা দিয়েছে।

এ গ্রন্থ দ্রুত-প্রকাশনের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়েছে। শুধু যে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী বৎসরে গ্রন্থ প্রকাশিত করবার জন্য আগ্রহের দরুন এরূপ করা হয়েছে, তা নয়। 'উদ্বোধনে' আমার শেষোক্ত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নানা পত্রিকায় সে সব আলোচ্য বিষয় নিয়ে নানা নামে বহু আলোচনা শুরু হয়। এ আমার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন কোন প্রবন্ধে আমার রচনায় সন্নিবেশিত তথ্য-প্রমাণাদি, যুক্তি,

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সকল হুবহু ব্যবহার করা সত্ত্বেও কোন লেখক ঋণ-স্বীকার করা কর্তব্য বোধ করেন নি। এঁদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাঁদের নিজস্ব কিছু বলবার আছে, তাঁদের খ্যাত বা অখ্যাত লেখক ও গবেষকের নিকট ঋণ-স্বীকার করতে বাধা কোথায় ? যাই হোক, আরও কিছুকাল পরে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হলে হয়ত কোন মৌলিকত্য আমি দাবী করতে পারব না প্রধানতঃ এইজন্যই অতি দ্রুত প্রকাশন-কার্য সম্পন্ন করতে হ'ল। ফলে কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেল। যে পরিমার্জিত রূপ নিয়ে প্রকাশ করা সঙ্গত ছিল তা সম্ভব হল না। সেজন্য আমি সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি।

গ্রন্থ-মধ্যে উদ্ধৃতি-বাহুল্য সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কিন্তু আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত তর্কের বস্তু হওয়ায় প্রামাণিকতার দাবী আগে পূরণ করতে হয়েছে ; বিশেষ করে বিবেকানন্দের মতামত সম্বন্ধে তাঁর বিচ্ছিন্ন কয়েকটি মাত্র উক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে কোন কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনা করায় যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করবার জন্যই বিবেকানন্দের সমগ্র বক্তব্য তাঁর ভাষাতে উপস্থাপিত করতে হয়েছে। তাছাড়া একই কারণে বিবেকানন্দের চিন্তা-পদ্ধতির মূল্যায়ণ করতে গিয়ে যাঁদের মতামত উল্লেখ করতে হয়েছে তাঁদের কথাও যথাসাধ্য তাঁদের ভাষায়ই বলবার চেষ্টা করেছি। ফলে, প্রকাশভঙ্গীর প্রাঞ্জলতা দু'এক স্থানে ব্যাহত হয়েছে। প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবে এই গ্রন্থ যদি কোনও সত্যানুসন্ধী মুক্ত-দৃষ্টি গবেষককে কিছু মাত্র প্রেরণা দিতে পারে, যদি কোন জিজ্ঞাসুকে যুগের প্রত্যয়হীনতার অভিশাপ ও সংশয়ের বেদনা হ'তে মুক্তির আশ্বাস দিতে পারে, তবেই আমার শ্রম সার্থক বলে বিবেচনা করবো।

জন্মাষ্টমী
১৩৭০

বিনীতা
গ্রন্থকর্ত্রী

# সূচীপত্র

## অবতরণিকা

১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দ দেহরক্ষা করার পর আজ একষট্টি বৎসর কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ ছয় দশক কাল ধরে তাঁর সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা হয়েছে। দেশে বিদেশে বহু মনীষী এই কার্য সম্পন্ন করেছেন। সেই সকল আলোচনা হতে বিশ শতকের মধ্যপাদের মানুষ আমরা এই জেনেছি যে নতুন যুগে ভারতবর্ষে জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে অন্যতম প্রধান শক্তি ছিলেন বিবেকানন্দ, আর সমগ্র বিশ্বের ধর্ম-দর্শন সংক্রান্ত চিন্তাধারায় তাঁর নববেদান্তবাদ (প্রয়োগমূলক বা ফলিত বেদান্ত) এক অমূল্য অবদান। সংক্ষেপে, তিনি জাতীয় জাগরণের গুরু, স্বদেশপ্রেমিকদের সেনাপতি, বেদান্তধর্মের নির্ভীক ও শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা—তাঁর এই পরিচয়ই আমরা এতাবৎকালে পেয়েছি। উনিশ শতকের শেষ দশ বৎসর ছিল তাঁর কার্যকাল। সে এক মহাযুগ-সন্ধিক্ষণ; সেই সময় ভারতের সুপ্রাচীন সমাজ-জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন পূর্ণ গতিবেগ প্রাপ্ত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন। স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন কি ভাবে, কোন্ পথে আরম্ভ হবে তার অপেক্ষায় ছিল। বিবেকানন্দের আবির্ভাব সেই দৃষ্টির বাধা দূর করে দিল; এই অগ্নিময় তেজোময় পুরুষের বীরমূর্তিখানি সম্মুখে রেখে, তাঁর প্রাণের আগুন হ'তে আপনাদের প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে সৈনিকেরা আপন পথ আবিষ্কার করে নিলেন। সেই আন্দোলনে অলক্ষ্যে কেন্দ্রশক্তিরূপে কাজ করেন বিবেকানন্দ; লক্ষ লক্ষ সৈনিক তাঁর জীবন, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মোৎসর্গ করেছেন। তখনকার জীবনে প্রতিক্ষেত্রে পরিবর্তন ও

উন্নতি রূপ পেয়েছে তাঁর বাণী থেকে। এ কথা সে যুগের মনীষী কর্মী ও ঐতিহাসিক সকলেই স্বীকার করেছেন।[১]

কিন্তু, সেই জাতীয় জাগরণের প্রথম প্রভাত ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের মুহূর্ত আজ অতিক্রান্ত। সমাজ-জীবন কালবশে আমূল রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও শেষ হয়েছে। অর্থাৎ তখনকার অধিকাংশ সমস্যাই আজ আর নেই। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। শুধু ভারতেই নয় সমগ্র পৃথিবীতে সমাজ-সভ্যতার যে পরিণতি ঘটছে তা উনিশ শতকের শেষপাদেও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। নানা পরিবর্তন সমাজের রূপান্তর সাধন করেছে; রূপান্তরিত হয়েছে এমন কি আমাদের মূল্যবোধ। পূর্ব যুগের জীবন-মূল্য আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, তার অনেক কিছুই আজ আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে; অনেক কিছুই আজ আমরা মানব-জীবন-দর্শনে শেষ কথা নয় বলে জেনেছি। বিশ শতকের এই মধ্যপাদে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে এক শতাব্দী কাল মধ্যে আমরা সহস্র বৎসরের সম্ভাব্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছি। যন্ত্র আবিষ্কার ও যন্ত্র প্রয়োগ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে; এবং এরই বিপুল অপ্রতিরোধ্য প্রভাব সমাজ-মানসের উপর আজ দেখা যাচ্ছে। ঐহিক উন্নতির চরম শিখরে অধিষ্ঠিত আজ মানুষ, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনায়াসলভ্য সুখের উপকরণ চারদিকে তার ছড়ানো, তবুও শান্তি সুখ তার বুঝি সম্পূর্ণ করায়ত্ত নয়।

এই যুগের জীবন-দর্শন রচয়িতা কে? এ কথা চিন্তা করে দেখতে গেলে যুগসন্ধিক্ষণের আগ্নেয় লগ্নে আবির্ভূত বিরাট পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বিগত যুগের নিকটতম সমস্যার উপর তাঁর আধিপত্য নিয়ে আমরা আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলাম বলে এ ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই মনে

১। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং এ বিষয়ে স্বীকৃতি রেখে গিয়েছেন। রোঁমা রোঁলা রচিত বিবেকানন্দের জীবনীর ইংরাজী অনুবাদের ১২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে যে বাংলায় তথা ভারতে বিবেকানন্দের যুগের অবসান হয়েছে। অনেক যশস্বী সমাজতত্ত্ববিদও এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছেন।[২] কিন্তু, যুগান্তরের অধিনায়করূপেই যে বিবেকানন্দের আবির্ভাব—আগামীকালের সেই স্রষ্টার দিকেই যে আমরা আশাপথ চেয়ে বসে আছি, সে কথা উপলব্ধির দিন আজ এসেছে। এতকাল বিশেষ কারও নজরে পড়েনি যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দেরও একটি সমাজ-দর্শন আছে—এতকাল আমরা তা প্রায় উপেক্ষা করে এসেছি। অবশ্য এ উপেক্ষা ইচ্ছাকৃত নয়, কালান্তরের পূর্বে নবযুগ সৃষ্টিকারী দর্শন-চিন্তা লোকমনের আয়াসসাধ্য ছিল না বলে এটা ঘটেছে। কালের পরিবর্তন আজ আমাদের দৃষ্টির বাধা অপসারিত করেছে, তাঁর প্রতি কথা, তাঁর বক্তৃতাবলী ও কথোপকথনের প্রতি ছত্রে আজ আমরা নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ইংগিত দেখতে পাচ্ছি।

অবশ্য এর থেকে কেউ যেন একথা না মনে করেন যে সমাজতত্ত্ব রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সযত্ন প্রয়াসে মার্কসীয় সমাজ-দর্শনের মত একখানি সমাজ-দর্শন রচনা করেছেন।[৩] স্বল্পকালব্যাপী কর্ম-জীবনে তাঁর সে সময় ছিল না, অতি তরুণ বয়সেই তাঁকে ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছিল। আর বসে বসে থীসিস রচনাও তাঁর কাজ ছিল না। তিনি এসেছিলেন এক জীবন্ত প্রেরণা হয়ে, জ্বলন্ত সূর্যের মত সক্রিয় শক্তিরূপে। তাঁর স্বল্পকালব্যাপী জীবন একটি নিদ্রিত মহাজাতির ঘুম ভাঙাতে ও তার গৌরবময় ঐতিহ্যের পথে পুনর্বার গতিবেগ সঞ্চার করতে এবং বিশ্ব-মানব সভ্যতাকে অদূর ভবিষ্যতের আসন্ন ধ্বংসের সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য গঠনমূলক কাজ করতেই ব্যয়িত হয়েছিল। কিন্তু, মানব-সমাজ পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা যাঁর ছিল, তাঁকে সমাজ-জীবনের গঠন, মূল-প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, বিবর্তনের বিধি-নিয়ম সবকিছু সম্বন্ধেই সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করতে হয়েছিল। তাঁর

২। বিনয় ঘোষ—বাংলার নবজাগৃতি।

৩। Karl Marx রচিত Das Capital গ্রন্থে প্রধানত তাঁর সমাজ-দর্শন বিধৃত হয়ে আছে।

সেই সকল চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে আছে তাঁর আট-দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন বক্তৃতায় ও রচনায়। তাঁর বেশীর ভাগ বক্তৃতাগুলি পূর্ব পরিকল্পিত নয়, প্রস্তুত-না-করা (extempore) বক্তৃতা বলেই তাঁর জীবনীকারেরা বলেন। কিন্তু, আশ্চর্যের কথা এই যে তাঁর সমাজ-চিন্তা মোটেই এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত বা অসম্পূর্ণ নয়, তা রীতিমত সুসম্বন্ধ ও সুগঠিত এবং এর ভিত্তি ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-তত্ত্ব, গণ-মানসের প্রত্যক্ষ পরিচিতি ও গভীর প্রজ্ঞালব্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এই সকল চিন্তাধারার মধ্যে কোনো অসংগতি বা অযৌক্তিকতা স্থান পায়নি। তবে হয়তো অনেক কথাই সূত্রাকারে আছে, যা ভাষ্যকারের অপেক্ষা রাখে। আরও লক্ষ্যণীয় এই যে এ সমাজ-দর্শন আদৌ অবাস্তব আদর্শবাদ নয়। তাঁর অনেক সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী ইতিহাসসম্মত। কিছু পরবর্তী ইতিহাস সত্য বলে প্রমাণিত করেছে, কিছু উত্তরকালে সমাজ-তত্ত্ববিদেরা স্বতন্ত্র গবেষণা দ্বারা বহু আয়াসে সত্য বলে প্রমাণিত করেছেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও সমগ্র মানবশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তির প্রমাণ এখানে। এজন্য তাঁর সমাজ-চিন্তার সংগে সাম্প্রতিককালের কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এবং এজন্যই এঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক তাঁদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত, একথাও অনেকে বলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের সমাজশাস্ত্রীদের মধ্যে অনেকে যাঁরা অনেক নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা বা নতুন-তথ্যের উদ্ঘাটন করেছেন, তাঁরাও অনেকেই তাঁর মতকেই সু-প্রতিষ্ঠিত করেছেন দেখা যায়। পূর্ববর্তীদের মধ্যে কঁতে, ফিক্‌টে, হার্ডার, মার্কস, এঙ্গেলস প্রভৃতি ও পরবর্তীদের মধ্যে টয়েনবী ও সোরোকিনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু, বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন সম্পর্কে এতাবৎকালে সত্যনিষ্ঠ গবেষকদের অনুসন্ধানের অভাব হেতু অনেক ভুল ধারণা, অনেক হাস্যকর ভ্রান্ত মতের সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে একটি প্রচলিত ভ্রান্ত মত হ'ল: তাঁর ধর্মচিন্তার জন্য বিবেকানন্দ বেদান্ত-দর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ঋণী, কিন্তু তাঁর সমাজ-চিন্তার জন্য তিনি

সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদের নিকট ঋণী। এবং এই প্রকল্প হতে কেউ কেউ আরও সিদ্ধান্ত গঠন করেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ 'মধ্যযুগীয়' প্রভাবের মধ্যে তিনি যদি না পড়তেন, তাহলে তিনি তাঁর চিন্তাধারায় ও কার্যকলাপে অধিকতর প্রগতিশীলতার পরিচয় দিতে পারতেন, দেশ ও সমাজের উপকারে লাগতেন। এ মত এমনই হাস্যকর যে এ নিয়ে আমাদের সময় অপচয় করা অনুচিত হবে। বিবেকানন্দরূপ শক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ গঠন করেছেন, এ কথা বিবেকানন্দের নিজের।[৪] সেই বিরাট অধ্যাত্ম-সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত বিবেকানন্দ তাঁরই অপরদিক—সমাজ-সংসারের সক্রিয় গঠন-শক্তি, যেমন সূর্যের তেজকণায় সঞ্জীবিত পৃথিবীর প্রাণ-লীলার চাঞ্চল্য সেই সৌর-শক্তির রূপান্তর মাত্র। রামকৃষ্ণের সমন্বয়-বাণীর ধারক, বাহক ও পালক বিবেকানন্দ বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার হতে গ্রহণ করেছেন সকল যুক্তিসিদ্ধ সত্যতত্ত্বকে, স্থান দিয়েছেন সুসামঞ্জস্যের সঙ্গে নিজের সুবিশাল চিন্তাধারার। কিন্তু বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে যে ঐক্য-সূত্রটি বর্ত্তমান তা হ'ল এক বিশ্ব-সত্য যাতে বিশ্বের সকল তত্ত্ব বিধৃত এবং যে বিশ্ব-সত্যের রামকৃষ্ণের ধ্যানে পূর্ণ রূপায়ণ ঘটেছিল। অতএব বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের পটভূমিকা হ'ল বিশ্ব-সত্যের পূর্ণরূপটি। তাকে বুঝতে হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ না করে, স্বীকৃতি না দিয়ে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও ইতিহাস যা বিশ্ব-সত্যের প্রতিফলনের যুক্তি-সিদ্ধ ব্যাখ্যা প্রদান করবার চেষ্টা করে, তার সাহায্যেও তিনি তার সমাজ চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস এই ধর্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সমাজ-দর্শন ব্যাখ্যানে যে স্থান অধিকার করে আছে, তার পরিচয় আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পাব।

---

৪। "তাঁর ( শ্রীরামকৃষ্ণের ) কৃপাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ তৈরী হয়"—বিবেকানন্দ।

# প্রথম অধ্যায়

## বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস

"চাই স্বচ্ছ দৃষ্টি ও মুক্ত দৃষ্টি"

—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

সম্প্রতি আমাদের ইতিহাস-সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি উন্নতির লক্ষণ। যে কোনও উন্নত ও গতিশীল জাতিই ইতিহাস-সচেতন না হয়ে পারে না। আমরা আমাদের স্মৃতির চেতনায় সমগ্র প্রবহমান অতীতকে বহন করে চলেছি। তারই মধ্যে আছে আমাদের পরিচয়। এই অতীতকে আমরা জানতে চাই, চিনতে চাই—সে জানা আর সে চেনা নিজেকেই জানা, নিজেকেই চেনা। উন্নত মানুষ মাত্রেই নিজেকে জানতে চায়, চিনতে চায়। কারণ উন্নত মানুষ অনায়ত্ত অন্ধ শক্তির হাতে ক্রীড়নক হয়ে থাকতে চায় না, সে নিজেই তার ভাগ্যনিয়ন্তা হতে চায়। সেইজন্য বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এবং মননশীলতা-প্রসূত প্রজ্ঞা দ্বারা নির্ধারণ করে সে আপন জীবনের কক্ষপথ গড়ে তুলতে চায়। এইজন্যই সে অতিমাত্রায় ইতিহাস-সচেতন। এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সচেতনতার ফলে আজ আমাদের দেশে নতুন করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা করবার যে বেগ এসেছে তাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে ও কৃতজ্ঞচিত্তে অভিনন্দন না জানিয়ে পারি না।

এইরূপে যাঁরা ইতিহাস রচনায় হাত দিয়েছেন তাঁরা নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞান-সহায়ে ও সমাজ-তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আমাদের দেশের ইতিহাস-রচনায় এই সমাজ-তাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কত যে অজানা সম্পদের সন্ধান দিয়েছে, কত যে দুর্বোধ্য বস্তুকে আলোকিত করে তুলেছে তার ইয়ত্তা

নেই। ফলে পাঁচহাজার বছরের পুরানো একটি বিরাট জাতির সমাজ সংস্কৃতি নতুনরূপে আমাদের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এই সমাজ-তাত্ত্বিক পদ্ধতির মূল প্রয়াস হ'ল ইতিহাসের একটি গতিক্রম নির্দেশ করা। সমাজ-তাত্ত্বিক মর্গানের মূল্যবান গবেষণা অবলম্বন করে ইতিহাসের একটি গতিপথ নির্দেশ করেছেন মার্কস্ ও এঙ্গেলস্। এঁদের সিদ্ধান্তানুসারে ইতিহাসের গতিক্রম তিনটি স্তরে বিভক্ত: প্রথম আদিম সাম্যসমাজ, তারপর শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, তৃতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীবিহীন সমাজ। এই প্রত্যেকটি স্তরেরই আবার নানা উপবিভাগ আছে। তার বিশদ বর্ণনা এ প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। এই স্তর বিভাগের ভিত্তি হ'ল উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্নতা। এঁদের মতে উৎপাদন প্রথাই মানুষের ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-কর্ম, শিল্প-প্রচেষ্টা প্রভৃতি মানসিক বিকাশের স্বরূপ নির্ণয় করে থাকে। এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্র' নামক পুস্তকে এ তত্ত্ব বিস্তারিত হয়েছে। সমাজ-বিজ্ঞানীরা সকলেই অবশ্য এ তত্ত্ব মেনে নেয় নি। এর পেছনে যুক্তির ভিত্তিগত দৌর্বল্য তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। আমাদের দেশেরই একজন সুপণ্ডিত সমাজ-বিজ্ঞানী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "মার্কস্‌বাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যায় মধ্যে মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতির অর্থনৈতিক বাস্তব ভিত্তির উপর অত্যধিক অসম গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলে তা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে, জীবন্ত সত্য হয়ে ওঠে না। যান্ত্রিক বাস্তবতায় সত্যের সমগ্রতা প্রতিফলিত হয় না।...... নানাবিধ পরস্পর-বিরোধী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইতিহাসের রথচক্র ঘরঘরিয়ে চলে, তাতে অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাব অস্বীকার্য নয়। সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে তার বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়েই ইতিহাসের বিশেষ করে সংস্কৃতির স্বরূপটি ফুটে উঠে।[১]

অর্থনৈতিক উপাদান ব্যতীত ধ্যান-ধারণা, দেব-দেবী কল্পনা, শিল্প-সৃষ্টি, ধর্ম-দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন মৌল উপাদান সমাজ-সংস্কৃতির রূপ

১। বিনয় ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ-৩৮

প্রদান করে থাকে—এ কথা আজ সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃত। এর কোনও একটি উপাদানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ যুক্তিযুক্ত নয় এবং তা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের বিঘ্ন ঘটায়। যদি ইতিহাসের গতিপথ সম্পর্কে সত্য নির্ণয় আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমাদের এ বিষয়ে অবহিত হ'তে হবে, প্রত্যেকটি উপাদানের যথাযথ প্রভাব স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু কোনও একটি উপাদানের ওপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করা হ'ল কিনা তা বিচার করা যাবে কি উপায়ে? সমাজতত্ত্ববিদের উত্তর হ'ল দেখতে হবে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে কি না। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্যটি খুব সহজ নয়, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনেক সময়ই আমাদের সত্যচ্যুত করে। মার্কসীয় একদেশদর্শী ইতিহাস ব্যাখ্যাও বৈজ্ঞানিকত্ব দাবী করে থাকে। অতএব, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান তত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনার প্রয়োজন। দেখা যাক প্রকৃত 'বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' কি, কি তার ধর্ম, কি তার সর্ত।

এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও সংস্কৃতি বিজ্ঞানী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল জাতি-সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রভূত আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসকল প্রয়োগ করলেই যে সত্য আবিষ্কার করা যায় তা নয়। বিভিন্ন বিজ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রয়োগ করলে আমরা পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্ত পেয়ে থাকি। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির অবসান করতে হলে বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে প্রথমে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করে পদ্ধতিটিকে যুক্তিসিদ্ধ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। তা ছাড়া, সমাজ একটি সক্রিয় ও সচল প্রতিষ্ঠান, প্রতিমুহূর্তে নব নব রূপ পরিগ্রহ করছে, তাকে কোনও প্রকার যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা চলে না। ঐতিহাসিকের দায়িত্ব অনেক। তাদের হাতে মানুষের ভবিষ্যৎ, সভ্যতার ভবিষ্যৎ। সে দায়িত্ব তাকে পালন করতে হ'লে

চাই স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টি ও সত্য দৃষ্টি।”[২] আচার্য শীলের কথাগুলি অনুধাবন করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সকলের সামঞ্জস্য বিধান করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি গঠন করতে হবে। যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতি, শুধু বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসকলের প্রয়োগমাত্র নয়। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাস ব্যাখ্যা কোনও প্রকার যান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা চলে না: কারণ, ইতিহাস যার ব্যাখ্যাতা সেই সমাজ নিত্য পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ, ইতিহাসের গতিক্রম নির্ণয় করতে গেলে কোনওরকম “pre-conceived ideas” থাকলে চলবে না। কিন্তু, সন্দেহ নাই কার্ল মার্কস্ তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যায় অতিমাত্রায় অর্থনীতি বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৩] তাঁর এই একদেশদর্শীতা তাঁর পদ্ধতিকে যান্ত্রিক করে তুলেছে এবং তাঁকে ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে।[৪]

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান আমাদের মধ্যে যেমন একদিকে যুক্তি-নিষ্ঠা এনেছে, তেমনি এনেছে এক ধরনের নতুন কুসংস্কার। এবং এ কুসংস্কার এইজন্য অধিক ভয়াবহ যে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠার কারণে মানুষের মনে এর প্রভাব অপরিসীম। বর্তমান যুগের মানুষের যুক্তি-নিষ্ঠার মোহ যুক্তি-নিষ্ঠা অপেক্ষা বেশী। এই মোহের দরুণই বিজ্ঞান মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা না এনে এনেছে দাসত্ব, যান্ত্রিকতা, যার ফলে প্রকৃত সত্য আমাদের করচ্যুত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই। এই কারণে আমরা এই ধরনের যুক্তি-পরিপন্থী উক্তি পাই যে, ‘বিবেকানন্দ প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন’, কিম্বা ‘তিনি প্রকৃতপক্ষে ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন।’ আবার ‘ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি রূপায়ণে একমাত্র শক্তি অর্থনৈতিক উপাদান ও বস্তুবাদই ভারতের মূল-দর্শনতত্ত্ব”।[৫]

২। Brojendranath Seal —“The Meaning of Race, Tribes and Nation.”

৩। মার্কস্ অতিমাত্রায় ১৮শ শতকের শিল্প বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি উক্ত ঘটনার অল্প পরেই জন্মেছিলেন—Manheimn—Systematic Sociology—Chapter on ‘Social Change.’

৪। শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল। ফলে ইতিহাস-ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক রীতি তিনি গঠন করতে প্রভূত সহায়তা করলেও ইতিহাসের মুক্তি ঘটেনি তাঁর দ্বারা। তাঁর মস্ত ভ্রান্তি সেখানেই হয়েছে যেখানে অর্থনীতিকেই তিনি সমাজের সবকিছু মনে করেছেন।

৫। শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ‘লোকায়ত দর্শন’ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য এই কথাই।

বস্তুতঃ, আমরা পূর্বকল্পিত ধারণার বশবর্তী হয়ে তথ্যাদি এমনভাবে সংগ্রহ করতে পারি এবং সেগুলির এমন সমাবেশ সাধন করতে পারি যে আমাদের এই সকল ধারণাই অপরিহার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তসকলের ভিত্তি তাঁদের এইরূপ পূর্বকল্পিত ধারণা। এঁরা পূর্ব হতেই বিশ্বাস করেন যে, যে কোনও ধর্মপ্রচারকই প্রতিক্রিয়াশীল, অতএব তথ্য প্রমাণাদি এরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন. যে স্বতঃ প্রমাণিত হয় এই সিদ্ধান্ত, যে বিবেকানন্দ প্রতিক্রিয়াশীল। যাঁরা বিশ্বাস করে আসছেন যে, যে কোনও সমাজ-সংস্কৃতির রূপায়ণে একমাত্র অর্থনৈতিক উপাদান ও বস্তুবাদই প্রধান শক্তি, তাঁরাই 'তথ্যপ্রমাণ' সহ অকাট্যরূপে প্রতিপাদন করেছেন যে ভারতেও সমাজ-সংস্কৃতির রূপায়ণ একমাত্র এই দুইটি শক্তির দ্বারাই ঘটেছে। এই ধরনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সত্যনিষ্ঠার পরিচয় নেই। অথচ তথ্যের উল্লেখ ভূরি ভূরি এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তসকলের প্রয়োগ স্থানে অস্থানে। জনমনে এই সকল ব্যাখ্যার প্রভাব অনস্বীকার্য্য, ভূরি ভূরি তথ্য ও বিজ্ঞানের অজস্র প্রয়োগ তাদের মনে নিদারুণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। সেইজন্যই দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন, "ঐতিহাসিকের দায়িত্ব অনেক। তাঁর হাতে মানুষের ভবিষ্যৎ, সভ্যতার ভবিষ্যৎ। সে দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হ'লে চাই স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টি ও সত্য দৃষ্টি।" ইতিহাস নিছক ঘটনাপঞ্জী নয়, তার নিজস্ব বক্তব্য আছে। সে বক্তব্য মানুষের পথপ্রদর্শক, অতএব তার সে বক্তব্য সম্বন্ধে ভ্রান্তমত গঠন করলে মানুষের অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

কিন্তু, তার অর্থ কি এই যে আমাদের যুক্তিসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করবার প্রয়োজন নেই? তা নয় নিশ্চয়ই। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যা হল যুক্তিসিদ্ধ তা ছাড়া কোন আলোচনাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু, এই যুক্তিসিদ্ধ উপায়টি কি? এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের অপর একজন মনীষী একটি গভীর চিন্তাদ্যোতক আলোচনাকালে প্রভূত আলোকপাত করেছেন। স্বর্গীয় অতুলচন্দ্র

গুপ্ত মহাশয় তাঁর 'ইতিহাসের মুক্তি' শীর্ষক পুস্তিকায় বলেছেন, "সকল বিজ্ঞানের সাধারণ কোনো বৈজ্ঞানিক রীতি নেই। যা সকল বিজ্ঞানে সাধারণ, তা হ'ল সত্যনিষ্ঠা। এবং বিনা প্রমাণে বা অপ্রমাণে কোনো কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ না করা। এবং প্রমাণ-বিরুদ্ধ হ'লে চিরপোষিত মত ও চিন্তাধারা পরিত্যাগে দ্বিধাহীনতা। যে ইতিহাস সত্যনিষ্ঠ প্রকৃত ইতিহাস, কল্পনাবিলাস নয়, সে ইতিহাসে এই সকল গুণ অবশ্য থাকবে।" অর্থাৎ চিরপোষিত মতদ্বারা অপ্রভাবিত ইতিহাসই সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস এবং তা প্রামাণিক যুক্তিসিদ্ধ হ'লেই বৈজ্ঞানিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবাদীদের নিকট ইতিহাস 'কল্পনাবিলাস' মাত্র, আপন কল্পনার পরিপূরক হিসাবে ইতিহাস তাদের সান্ত্বনাস্থল ও অবলম্বন। ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে 'স্বচ্ছ মুক্ত দৃষ্টি' যা একান্ত প্রয়োজন, তারই অনেক ক্ষেত্রেই একান্ত অভাব।

ইতিহাস আলোচনার পদ্ধতি নিয়ে উপরে আমরা যে আলোচনা করলাম তা অসম্পূর্ণ সন্দেহ নেই। আরও যুক্তি আছে, আরও তথ্য আছে যা এখানে আলোচিত হয়নি। পণ্ডিতেরা আরও দক্ষতার সঙ্গে বক্ষ্যমাণ যুক্তিজাল বিস্তার করতে পারবেন সন্দেহ নেই। সেই সকল উত্তম অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণের আশাতেই আমরা এখানে এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আশা করি যতটুকু আলোচনা করেছি তাতে একথা বোঝাতে পেরেছি যে ঐতিহাসিকেরা যদি বাঁধা ছক হাতে নিয়ে অগ্রসর হন, তা হ'লে তাঁরা সত্য হ'তে বহু দূরে চলে যাবেন। বিজ্ঞানকে তাঁরা যদি যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করেন, তা হ'লে তা' মানুষের চিন্তার মুক্তি না এনে আনবে কুসংস্কার। ধর্ম যেমন কুসংস্কারে পরিণত হ'তে পারে, বিজ্ঞানও পারে। ধর্মের কুসংস্কার ভয়াবহ, কারণ তার ফলে সমাজ শ্রেণী-বৈষম্যের নিগড়ে আবদ্ধ হয়— নিষ্ঠুর পুরোহিততন্ত্রের অত্যাচারে জর্জরিত হয়। কিন্তু, বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার আরও ভয়াবহ, কারণ তা মানুষকে সত্যপথচ্যুত করে। যা সত্য নয়, তা কখনও মানুষের কল্যাণ সাধন করে না। বৃহদারণ্যক

উপনিষদে বলা হয়েছে—'ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধু'—সত্যই হচ্ছে সর্বভূতের মধু,—প্রকৃত কল্যাণের আধার। যিনি সত্যিকারের বিজ্ঞানী তিনি সত্যানুসন্ধানী, সত্যই তাঁর লক্ষ্য। সেই সত্যই আমাদের হাতে সমাজবিজ্ঞানীরা পৌঁছে দিন, তাঁদের কাছে আমাদের এই ঐকান্তিক দাবী।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা প্রবঞ্চিত হচ্ছি, ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমাদের হাতে যা পৌঁছে-দিচ্ছেন তা সত্য নয়। এ প্রসঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই ধরা পড়ে তা হ'ল জনসাধারণের ধ্যান-ধারণায় অধ্যাত্মবাদের প্রাধান্য। অন্য কোনও দেশে এরূপ চোখে পড়ে না। এত অগণন সাধক, সন্ত, মহাপুরুষ, অবতার পুরুষ প্রতি যুগে যাঁদের প্রাধান্য, জগতের অন্য কোনও দেশে দেখা যায় না। সমাজ-ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, দৈনন্দিন জীবনের প্রতি কার্যে অধ্যাত্মতার এইরূপ প্রভাব একমাত্র ভারতবর্ষেই পরিলক্ষিত হয়। ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, "ভারতের মানুষের জীবন যেন প্রতিমুহূর্তে দেবারতির ছন্দে গাঁথা।" এর কারণ কি? এ তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে কোনও 'বৈজ্ঞানিক' ঐতিহাসিক এইরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্যান-ধারণার বৈশিষ্ট্যই বস্তুবাদ, ভারতবর্ষে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখি না। পরবর্তীকালে এই প্রাক্-বিভক্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষের উপর শ্রেণী সমাজ উদ্ভূত হ'ল, তখনই এল অধ্যাত্মবাদ ও একেশ্বরবাদ। এই অধ্যাত্মবাদ উপস্থিত হয়েছে উপনিষদসমূহে। উপনিষদের সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। রাজন্য-শ্রেণী সর্বসাধারণকে ইহলোক-বিমুখ করবার উদ্দেশ্যে এই মতবাদের সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ ইহলোক বিমুখ জনগোষ্ঠী শোষিত হ'লেও প্রতিবাদ করবে না[৬]

এঁদের মোটকথাঃ আদিতে বস্তুবাদই ছিল মানুষের প্রধান দর্শন-

---

৬। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—লোকায়ত দর্শন।

মত। দ্বিতীয় শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এল অধ্যাত্মবাদ। পরবর্তী শ্রেণীবিহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধ্যাত্মবাদের অবসান ঘটবে, বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

এঁদের প্রথম মৌলিক প্রকল্পটি—অর্থাৎ আদিম সমাজে বস্তুবাদই ছিল মানুষের প্রধান দর্শন-মত—যথেষ্ট সন্দেহজনক। এঁদের মতে আদিতে মানুষের বেঁচে থাকাই ছিল প্রধান সমস্যা এবং জীবিকা-প্রয়াসই ছিল তার অনন্য প্রয়াস। অনায়ত্ত প্রাকৃতিক শক্তির কাছে মানুষ ছিল একান্ত অসহায়। ফলে, তার অপরিণত মনে নানা উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে জীবজন্মের নিকটতম সম্পর্ক কল্পনা ক'রে আজকের দিনের পক্ষে নিদারুণ উৎকট ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্ভব তারা করেছিল এবং অনায়ত্ত প্রাকৃতিক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবী সকল কল্পনা করেছিল। কিন্তু, এ ব্যাখ্যা কি আমাদের যুক্তিকে সন্তুষ্ট করতে পারে? তাদের দেবদেবী পরিকল্পনা কি অনায়ত্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করবার প্রয়াস নয়? ধর্মবিশ্বাসের মূলকথা প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা। সেই মূল প্রচেষ্টা শুধু আহার্য সংস্থান বা জীবিকাপ্রয়াসের সঙ্গেই আদিম কৌম সমাজে সংযুক্ত নয়। এই বিশ্ব-সৃষ্টি স্বভাবতই আদিম মানুষের কৌতূহল জাগ্রত করেছে। সৃষ্টির রহস্য সে জানতে চেয়েছে, সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। মানুষের এই জানার তাগিদ আহার্য সংস্থানের তাগিদের চেয়ে কম শক্তিশালী নয়।

ভারতবর্ষে প্রাচীনতম মানুষদের গ্রন্থ ঋগ্বেদ। এই গ্রন্থে আদিম মানুষের জীবিকা-প্রয়াস ও তার জীবন-জিজ্ঞাসা দুই-ই প্রকটিত। অবশ্য তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবাদী'রা জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশগুলি পরিহার করে শুধু জীবিকা প্রয়াসের সঙ্গে সম্পর্কিত অংশের উপর ভিত্তি করে তাদের ইতিহাস রচনা করেছেন। অথচ আমরা দেখি ঋক-মানব প্রশ্ন করে চলেছে, "দিনমানে তারারা কোথায় থাকে? বন্ধনহীন অবলম্বনহীন সূর্য কেন স্খলিত হয় না? দিবা ও রাত্রির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? বাতাস কোথা হ'তে আসে, কোথায় যায়"

(ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল—১৬৮ সূক্ত)। আদিম হ'লেও মননশীল মানুষের স্বাভাবিক প্রশ্ন নয় কি এগুলি? "কেমন করে এই সৃষ্টি উদ্ভূত হ'ল? সে কেমন বন, কেমন বৃক্ষ—যা দিয়ে ঐ দ্যুলোক ভূলোক নির্মিত হ'ল" (ঐ ৩১ সূক্ত—৭ ঋক)।

মননশীল জীব মানুষ, বিশ্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধে এই সকল প্রশ্ন না করে পারে নি। দেখা যাচ্ছে জীবিকা প্রয়াসই মানুষের একমাত্র প্রয়াস নয়, সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটন করা মানুষের কাছে আর একটি দুর্নিবার প্রয়াস। সে প্রশ্ন করেই চলেছে, "এই বিশ্বের অধিষ্ঠান কোথায়? আরম্ভই বা কোথায়? এখন কি'ভাবে আছে? পূর্বেই বা কিভাবে ছিল, যা থেকে সেই সর্বদর্শী বিশ্বকর্মা তাঁর মহিমাবলে ভূমিকে সৃষ্টি করলেন, দ্যুলোককে প্রকাশ করলেন?" (ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল ৮।১২)। তারপর তাঁরা উত্তর পেলেন, 'আছেন এক দেবতা জীবন ও বল যথায় বিচ্ছুরিত, দিব্যধাম-বাসীরা যাঁকে সম্মান করেন, অমরত্ব ও মৃত্যু যাঁর ছায়া মাত্র, (ঋগ্বেদ: দশম মণ্ডল)। অর্থাৎ ঋক-মানবের কল্পনা বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, সাবিত্রী, রুদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতাদের নিয়ে এবং তাদের কাছে ঐহিক বাসনাসকল পূরণের প্রার্থনা দিয়ে আরম্ভ হ'লেও ক্রমে তার বুদ্ধি-প্রগতি তাকে বিশ্ব-সত্য উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছে। ঋগ্বেদের দশম-মণ্ডলের উৎপত্তি শ্রেণী সমাজে হ'তে পারে। কিন্তু, তার মধ্যে যে অদ্বৈতবাদ ও অধ্যাত্মবাদের স্ফুরণ দেখা যায়, তার মূল আরও সুদূর অতীতে প্রসারিত। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এ সম্পর্কে খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন: "It cannot be right to class every poem and every verse in which mystic or metaphysical speculation occur as modern, simply because they resemble the language of the Upanishads. These Upanishads did not spring into existence all on a sudden. Like a stream which has received many a torrent and is fed by many a rivulet, the literature of the Upanishads prove better than

anything else that the elements of their philosophical poetry came into from a more distant fountain. (History of Ancient Sanskrit Literature)."

বস্তুতঃ,উপরোক্ত উক্তির সারবত্তা আমরা ঋগ্বেদের প্রাচীন অধ্যায়গুলি বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাই। প্রাচীন অধ্যায়গুলির মধ্যেও অদ্বৈতবাদের ছায়া প্রকটিত। যথা—প্রথম মণ্ডলে একস্থলে বলা হয়েছে যে, "আকাশে সর্বতোবিসারী চক্ষুর দৃষ্টির ন্যায় বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সর্বদা দর্শন করেন (১।২২।২০)।" "স্তুতিবাদক ও সদা-জাগরূক মেধাবী লোকেরা বিষ্ণুর পরমপদ সর্বদা দর্শন করেন।" (১।২২।২১)।[৭]

মোটের উপর একথা অনস্বীকার্য যে আদিম কৌম সমাজেই মানুষের অস্ফুট চেতনায় একেশ্বরবাদ ও অধ্যাত্মবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। সুসভ্য মানুষ যে জটিল অধ্যাত্ম-তত্ত্ব জটিলতর যুক্তিজাল সহায়ে বিস্তার করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তত্ত্ব-জ্ঞানটি তার মনে হঠাৎ গজাতে পারে না। এর স্ফুরণ মানুষের মননশীলতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষিত হয়। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এই অর্থে সনাতন তত্ত্ব, চিরন্তন বিশ্বসত্য উপলব্ধি, এবং তা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের 'ভূত' নয়। সেইজন্য, আদিম কৌমসমাজেই তার স্ফুরণ দেখা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের 'Necessity of Religion' শীর্ষক আলোচনায় এ সম্পর্কে প্রচুর আলোক পাওয়া যায়। এই আলোচনায় তিনি প্রথমে ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রচলিত দু'টি মতবাদ—(১) ধর্মের উৎপত্তি মৃতের উপাসনা হতে, (২) ধর্মের উৎপত্তি প্রকৃতি উপাসনা হ'তে—আলোচনা করে তিনি বলেছেন : "Whichever is the case one thing is certain, that he (man) tries to transcend the limitations of senses. He cannot remain satisfied with his senses; he wants to go beyond them······Man is man, so long

---

৭। এ সম্পর্কে এক তথ্যপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায় ১৩৫৪ সালের মাসিক বসুমতীতে (আষাঢ়, শ্রাবণ) স্বামী বাসুদেবানন্দ কৃত "ঋগ্বেদ পরিচয়" প্রবন্ধে।

as he is struggling to rise above Nature and this Nature is both internal and external" অর্থাৎ মানুষ ইন্দ্রিয়ের সকল প্রকার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তার পশ্চাতে অবস্থিত সত্যকে জানতে চেষ্টা করছে। তাঁর মতে ধর্মতত্ত্ব তো এই নিয়েই আলোচনা করে যে কি উপায়ে ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে সত্যে উপনীত হওয়া যায়। মানুষের এই বিশ্ব-সত্যকে জানবার প্রচেষ্টা তার স্বভাবসিদ্ধ, তাই এ প্রয়াস তার মধ্যে চিরন্তন। এই প্রয়াস চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে উপনিষদের যুগে। অবশ্য একদিনে এই চরম উৎকর্ষ লাভ ঘটে নি। হাজার হাজার বৎসরের প্রয়াসের ফলে মানুষ চরম সত্যকে জেনেছে। কাজেই আদিম কৌম ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যুগে যুগে নতুন নতুন জ্ঞান-সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু সে জ্ঞান প্রক্ষিপ্ত নয়, জোর করে চাপানোও নয়। লোকায়ত দর্শনগুলির উপর অধ্যাত্মিকতার যে প্রলেপ পড়েছে তা মানবের দেহ-মন-বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে হয়েছে।

সুতরাং যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নাতিবৃহৎ রচনাবলীর মধ্যে আমরা সত্যনিষ্ঠ ও যুক্তিসিদ্ধ এক ইতিহাসের ব্যাখ্যা পাই যা প্রভূত আলোকসম্পাত করছে মানবেতিহাসের ওপর। বস্তুতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাস ব্যাখ্যার[৭] মধ্যে আমরা একখানি অতি-বৈজ্ঞানিক প্রামাণিক ইতিহাস-সম্মত সমাজ-দর্শনের পরিচয় পাই। এই সমাজ-দর্শনের ভিত্তি একদিকে প্রামাণিক ইতিহাস—পুরাতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সিদ্ধান্তসকলের মধ্যে সামঞ্জস্যে গ্রথিত বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, অপরদিকে বিশ্ব-সত্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। এই সমাজ-দর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবিসম্বাদিত। বিবেকানন্দের এই সমাজ-চিন্তার ইঙ্গিত যাঁরা প্রথম পেয়েছিলেন, যেমন পরলোকগত মনীষী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রভৃতি, তাঁরা কিন্তু তাঁর সমাজ-দর্শনের এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি লক্ষ্য করেন নি। অধ্যাপক সরকার

৭। 'জগতের কাছে ভারতের বাণী', 'বর্তমান ভারত', ও 'ভারতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশ' ইত্যাদি।

এবং স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তসকল দেখে চমকিত হয়েছিলেন। যথা তাঁর নিজেকে 'socialist' বা 'সমাজতন্ত্রবাদী' বলে ঘোষণা উভয়েই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু উভয়েই তাঁকে অবৈজ্ঞানিক দার্শনিক বলে অভিহিত করেছেন।

আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে হ'লে আমাদের আর একটি যে বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন তা হ'ল বিচারহীন বস্তুনিষ্ঠা। 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে'র মতই 'বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের'ও বর্তমানে প্রভূত প্রভাব আমাদের দেশে পরিলক্ষিত হয়। সত্যনিষ্ঠাই প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই 'বস্তুনিষ্ঠা' বলতে আজকাল আমাদের দেশে যা প্রচলিত তা যে একটি মানসিক বিভ্রান্তির ফল তা একটু বিচার করে দেখলেই দেখা যাবে এবং এ বস্তুনিষ্ঠা যে সত্যনিষ্ঠা হ'তে অনেক দূর—তাও প্রমাণিত হবে। এই বস্তুনিষ্ঠাবাদীরা বিবেকানন্দকে বিচার করতে গিয়ে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। এই বস্তুনিষ্ঠার মোহ হ'তে মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি প্রয়োগ না করতে পারলেও আমরা বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করতে অক্ষম হবো। এই বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস বিচারে— "একথা প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে অহিংস নীতি বা আধ্যাত্মিকতা ভারতীয় প্রকৃতির একচেটিয়া বৈশিষ্ট্য বলে কখনোই মনে করা চলে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের থেকে ভারতবাসীর বস্তুতান্ত্রিকতা বা সংসারনিষ্ঠা কোনও দিনই গভীরতায় বা ব্যাপকতায় কিছুমাত্র কম ছিল না। ভারতবর্ষ কেবল বুদ্ধ, রামদাস ও রামকৃষ্ণেরই জন্ম দেয় নি; কৌটিল্য, শিবাজী ও নেতাজীরও তা' জন্মভূমি: রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে অন্যান্য জাতিরা বাস্তব পৃথিবীর শতসহস্র আবেদনে যেভাবে যুগে যুগে সাড়া দিয়েছে, ভারতবাসীদের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।"[৮]

---

৮। "ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের যথার্থ স্বরূপ"—উমা মুখোপাধ্যায়: হরিদাস মুখোপাধ্যায় (দেশ, ১৯শে মাঘ, ১৩৬৯)

এই বস্তুনিষ্ঠাবাদের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে হ'ল এই যে ঃ 'এ জগত সংসারে সর্বত্র ভাল-মন্দের সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয় এবং সেইজন্য কোনও সমাজ কখনও সম্পূর্ণ দোষমুক্ত ছিল না এবং কখনও সেরূপ হবে না। সত্যযুগের কল্পনা সম্পূর্ণ ভুয়ো। এ জগত কখনও পূর্ণতা-ধর্মও প্রাপ্ত হবে না। যাঁরা কল্পনা করেছেন যে জগতটা এককালে বর্তমান ত্রুটি ও অপূর্ণতা হ'তে মুক্ত হ'বে তারা কতকটা ভাববিলাসী উন্মাদ।' পরলোকগত সমাজশাস্ত্রবিদ্ বিনয়কুমার সরকার ছিলেন এদেশে এ মতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারক। তিনি সেইজন্য যাবতীয় অধ্যাত্ম-বাদীদের পূর্ণতাবাদী ও অবস্তুনিষ্ঠ বলে অপাংক্তেয় করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে কিছু কিছু বস্তুবাদ লক্ষিত হয়, তিনি সেটুকু গ্রহণ করে, বাকী অধ্যাত্মবাদের জন্য তাঁকে পূর্ণতাবাদী বলে আখ্যায়িত করতেন। এই বস্তুনিষ্ঠাবাদীদের মতে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে 'পূণ্যভূমি আর্যঋষিদের দেশ' 'আধ্যাত্মিকতার লীলাক্ষেত্র' প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করবার দরুণ অবস্তুনিষ্ঠ এবং কল্পনাবিলাসী।

অথচ বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে বিবেকানন্দের মায়াবাদ হতে বিনয় সরকারের বস্তুনিষ্ঠাবাদের বিশেষ পার্থক্য নেই, বিনয় সরকার মহাশয় অনেক ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ভাষাশুদ্ধ হুবহু প্রয়োগ করেছেন। বিবেকানন্দ তাঁর একখানি পত্রে বলেছেন, "বাস্তব জগৎ সর্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণরূপে বিদ্যমান থাকবে। আর প্রত্যেক ভালটির সঙ্গে মন্দটিও ছায়ার মতো জড়িয়ে আছে। তার কারণ ভাল-মন্দ দু'টি পৃথক বস্তু নয়, আসলে এক। পরস্পরের মধ্যে প্রকারগত কোনও প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত।"··· "একটি ভুল আমরা প্রতিনিয়তই করে থাকি-তা এই যে, ভাল জিনিসটাকে আমরা ক্রমবর্ধমান কিন্তু মন্দ জিনিসটার পরিমাণ নির্দিষ্ট বলে ভাবি। তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করি যে, প্রত্যহ কিছু কিছু মন্দ ক্ষয় হয়ে এমন সময় আসবে, যখন কেবল ভালটিই অবশিষ্ট থাকবে, কিন্তু এই অপসিদ্ধান্তটি একটি মিথ্যাযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।"

"জগতে উন্নতি বলতে যেমন বেশী সুখভোগ বুঝায়, তেমনি বেশী দুঃখভোগ বুঝায়। এই যে জীবন-মৃত্যু, ভাল-মন্দ জ্ঞান-অজ্ঞানের সংমিশ্রণ এই-ই মায়া বা প্রকৃতি"। অতএব বিবেকানন্দের এই মায়াবাদ মতবাদ মাত্র নয়, এ হ'ল প্রত্যক্ষ সত্য বা Statement of facts এবং তাঁর এই প্রত্যক্ষবাদ ও বস্তুনিষ্ঠাবাদের কথা একই। অবশ্য, এক ভ্রান্তিমূলক শিক্ষার দরুণ আমরা মায়াবাদকে Illusion-বাদ বা অলীকতাবাদ বলে ধরে রেখেছি। "জগত তিনকালে নেই"—মায়াবাদ সম্পর্কে এই বহু প্রচলিত উক্তিটি যে ভ্রান্ত বিবেকানন্দ তা বহু যুক্তি সহকারে তাঁর 'জ্ঞানযোগ' শীর্ষক বক্তৃতামালায় উপস্থাপিত করেছেন। অথচ মায়াবাদ ও অলীকতাবাদ এক ও অভিন্ন মনে করে আমরা ধরে নিয়েছি যে মায়াবাদী সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই বাস্তবতা হ'তে বহু দূরে থাকবেন। কিন্তু, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যাকে অধ্যাত্মবাদীরা 'মায়াবাদ' বলছেন তাই বস্তুনিষ্ঠাবাদীদের 'বস্তুনিষ্ঠাবাদ'। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, আজকের বস্তুনিষ্ঠাবাদীদের বস্তুনিষ্ঠ বিচারে বিবেকানন্দ পূর্ণতাবাদী। অবশ্যই তিনি তা নন। বস্তুনিষ্ঠাবাদীদের বিচার তাদের ভুল সিদ্ধান্ত দিয়েছে। হেগেল পূর্ণতাবাদী, তিনি বিশ্বাস করেন অপূর্ণ বিশ্বসংসার একদিন পূর্ণতায় পৌঁছুবে। মার্কস পূর্ণতাবাদী. কারণ মার্কস্ বিশ্বাস করেন আগামী শ্রেণীবিহীন সমাজ হবে সর্বদোষবিমুক্ত সমাজ। কিন্তু বিবেকানন্দ পূর্ণতাবাদী নন। তিনি বলেন যে, জগতের উন্নতির ফলে মানুষ যত সুখভোগ করবে, ঠিক ততখানি দুঃখভোগ করবে। মন্দের পরিমাণ কখনও স্বল্প হ'বে না, সর্বাবস্থায় এক থাকবে। আগামী শূদ্রশাসিত সমাজ ( proletariat rule ) কখনও আদর্শ সমাজ নয়, সে সমাজে মানুষের সংস্কৃতিগত অবনতি ঘটবে।

তথাপি বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন, "যদি এই পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনও দেশ থাকে যাহাকে পুণ্যভূমি নামে বিশেষিত করা যাইতে পারে······তাহা আমাদের মাতৃভূমি।" অবশ্যই বিবেকানন্দ বিশ্বাস

করতেন ভারতের জাতীয় জীবনের মর্মমূলে অবস্থান করছে ধর্ম। প্রতীচ্য বর্হিবিশ্বকে জানবার জন্য অনাদিকাল হতে প্রয়াস করে আসছে আর এই প্রাচ্য ভারত অন্তর্জগতকে। ভারতের এই প্রয়াস যুগে যুগে অক্ষুণ্ণ দেখা যায়। এর মানে এই নয় যে বিবেকানন্দ ভারতের সাধারণ মানুষকে অন্য দেশ অপেক্ষা কম সংসারনিষ্ঠ মনে করেছেন। তার প্রমাণ এই যে, বৌদ্ধগণ প্রচারিত ব্যাপক সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ তিনি কোনও দিন সমর্থন করেন নি। তাঁর মতে বৌদ্ধধর্মের অবসানের অন্যতম প্রধান কারণ এই ব্যাপক সন্ন্যাসধর্ম প্রচার। শুধু তা নয়, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মুক্তি চর্চার জন্য সমাজে সর্বসাধারণ ইহলোক বঞ্চিত হ'বে এরূপ বিধানের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন—"The present Hindu Society is organised only for spiritual men and hopelessly crushes out everything else. Why ? Where they shall go who want to enjoy the world a little with its frivolities." তা হ'লে কি বলতে হবে যে, বিবেকানন্দ পরস্পর-বিরোধী উক্তি করেছেন ? তা নয়, ভারতের ইতিহাস চর্চা এবং গণ মানসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁকে এই সিদ্ধান্তই দিয়েছিল যে ভারতের জাতীয়জীবনে কেন্দ্রশক্তিরূপে কাজ করে আসছে আধ্যাত্মিকতা। এখানে অন্যদেশের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। অতএব বিবেকানন্দ পূর্ণতাবাদী বা কল্পনাবিলাসী ছিলেন না, তিনি যা বলেছেন তা ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ ( অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ ) বিচার দ্বারা বলেছেন। তা ছাড়া, মনে রাখতে হবে যে কোনও অদ্বৈত-বেদান্তী পূর্ণতাবাদী হ'তে পারেন না। কারণ অদ্বৈত বেদান্তমতে যা বিকাশশীল তা অপূর্ণ, আর যা অপূর্ণ তা কখনও পূর্ণতাধর্মপ্রাপ্ত হ'তে পারে না।[৯] এই জগত-সংসার বিবর্তনশীল। অতএব তা কখনও পূর্ণতা সিদ্ধি অর্জন করবে না। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বস্তুনিষ্ঠাবাদীরা

৯। Perfection means infinity and manifestation means limit and so it means that we shall be unlimited limits which is self-contradictory'—Maya and Illusion

বিবেকানন্দকে বিচার করতে গিয়ে স্বধর্মচ্যুত হয়েছেন অর্থাৎ বাস্তব সত্যচ্যুত হয়েছেন। অদ্বৈত-বেদান্তী বিবেকানন্দ কোন দিক দিয়েই পূর্ণতাবাদী ছিলেন না।

সুতরাং, বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের বিচারে আমাদের দু'টি বিষয় সযত্নে পরিহার করতে হ'বে। এক, বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার ও যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ। দুই, বিচারহীন বস্তুনিষ্ঠার প্রতি আসক্তি। তবেই আমরা বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবো। সে দর্শন যে কাউকে গ্রহণ করতে হবে তা নয়। কিন্তু তার স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্তমত পোষণ করা কখনই সমীচীন নয়। এজন্য পূর্বপোষিত ধারণানুযায়ী তথ্যসমাবেশ ঘটানোরও প্রয়োজন নেই। সামগ্রিক বিচার যে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত দেবে তাই সত্য বলে ধরে নিতে হবে, সে সিদ্ধান্ত আমার নিকট গ্রহণযোগ্য হোক আর না হোক। অর্ধ তথ্যের ভিত্তিতে অর্ধ সত্য যা মিথ্যা হতেও নিন্দনীয় ও ভয়ঙ্কর, সেরূপ অপসিদ্ধান্ত সযত্নে পরিহার করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।
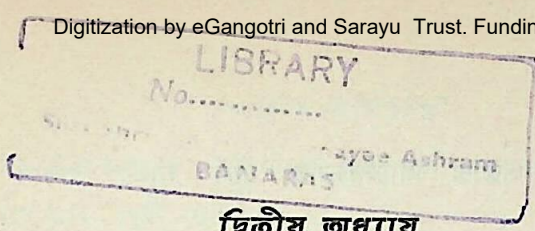
# দ্বিতীয় অধ্যায়

## সমাজ-দর্শনের দার্শনিক ভিত্তি ঃ বৈজ্ঞানিক জড়বাদ ও বৈজ্ঞানিক অদ্বৈতবাদ

"The universe begins to look more like a great thought than like a great machine."—James Jeans.

প্রত্যেক সমাজ-দর্শনের একটি দার্শনিক ভিত্তি আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক দার্শনিকেরই একটি সমাজ-দর্শন আছে। সমাজ-জীবনের ভিত্তি মানুষ, সমাজ মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়। তাই মানব জীবন সম্পর্কে ধারণা—তার প্রকৃতি, স্বরূপ ও উদ্দেশ্য নিরূপণের উপর নির্ভর করে সমাজ কি করে গড়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে বিচার। ইতিহাসের তথ্য এই দার্শনিক-চিন্তার ডৌলেই তত্ত্বরূপ নেয়। যাঁরা দার্শনিক তাঁরা মানবজীবনের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য নির্ণয়ের পর এ বিচার না করে পারেন না সমাজ-জীবনে তার প্রতিফলন কতদূর প্রতীয়মান হচ্ছে।

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের পশ্চাতে যে দর্শন চিন্তা বর্তমান, তা সারা পৃথিবীর মধ্যে অতি দুঃসাহসিক দর্শন চিন্তা। এবং আশ্চর্য এই যে, এ দর্শন জগতের প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকার না করেও সমাজ-জীবন নিয়ে অত্যন্ত মাথা ঘামিয়েছে। বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এজন্য অনেকে স্বীকার করেন না। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখব যে তাঁর ভ্রাতা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁকে মার্কস্‌পন্থী সমাজতন্ত্রবাদী বলে অভিহিত করবার প্রাক্কালে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণকালে সমাজ-বিপ্লবীদের ভাবধারায় ওতপ্রোত হয়ে তিনি তাঁর ধর্মদর্শন ত্যাগ করেছিলেন। এই সকল মতের সত্যাসত্য বিচারপূর্বক আমরা বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের মূলীভূত দর্শন-তত্ত্ব আলোচনা করব। এ-জন্য আমাদের প্রয়োজন মার্কস্ ও বিবেকানন্দের দর্শনতত্ত্বের তুলনামূলক

আলোচনা। অন্যান্য আলোচনার পূর্বে আমরা প্রথমে সেই প্রয়াসই করব।

কার্ল মার্কস্ বলেন পরিবর্তনীয়তাই সমগ্র বিশ্বের ও সৃষ্টির মূলতত্ত্ব, অপরিবর্তনীয় বলে এখানে কোন কিছু নেই। ত্রিভঙ্গী নয় প্রণালী (dialectical process) দ্বারা জগত পরিবর্তিত হচ্ছে। অবস্থা হতে (thesis) অবস্থান্তরে পরিণতির পূর্বে সেই অবস্থার বিরুদ্ধে এক নতুন শক্তির আবির্ভাব হয় (anti-thesis): এই বিরোধের ফলে পরিশেষে সম্পূর্ণ নতুন অবস্থার উদ্ভব এবং প্রাচীন অবস্থার বিনাশ ঘটে। মার্কসের মতে বিরোধকালে যে নতুনের উদ্ভব হয়, তার মধ্যে পুরাতনের স্থান নাই। মার্কসের দর্শন 'ত্রিভঙ্গী জড়বাদ' (Dialectical Materialism) নামে খ্যাত। এই জড়বাদের বিশেষত্ব এই যে, এ মতে প্রাণ ও চিন্তা নিষ্ক্রিয় জড়পদার্থ নয়; যদিও জড়ের মধ্যে প্রাণ ও চিন্তা নাই। কিন্তু জড়পদার্থ হতেই প্রাণ ও চিন্তার উদ্ভব হয়। প্রাণ ও মনের আবির্ভাবের পূর্বে প্রাণ ও মনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রাণ ও মন সম্পূর্ণ নতুন পদার্থ, কিন্তু বিশেষ অবস্থাপ্রাপ্ত জড়পদার্থ হতে তারা উদ্গত হয়। এই নতুন পদার্থ মানুষের মধ্যে মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক গুণরূপে প্রকাশিত হয়। জড়ের মধ্যে আছে কেবল রাসায়নিক শক্তি, প্রাণশক্তি তার মধ্যে কোথাও নাই। রাসায়নিক শক্তিসম্পন্ন জড়ের এক বিশেষ অবস্থায় প্রাণের আধার প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ উদ্গত হয়। প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ হতে বিবিধ জীবদেহের উৎপত্তি এবং জীবদেহের এক বিশেষ অবস্থায় মনের উদ্ভব হয়। প্রাণ অথবা মনের কোন গুণই জড়ের মধ্যে নাই। জীবদেহের মধ্যে যেমন জড়ের অতিরিক্ত প্রাণশক্তি দেখা যায়, তেমনি মানুষের মধ্যে প্রাণের অতিরিক্ত মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রাণ ও মন জড়ের বাইরে অন্য কোথাও ছিল পরে জড়ে সঞ্চারিত হয়েছে তাও নয়। জড়ের মধ্যে প্রকাশিত হ'বার পূর্বে তাদের অস্তিত্বই ছিল না। পরিবর্তন অথবা গতি জড়ের ধর্ম, প্রাণ গতিরই বিশেষরূপ, জটিলতর রূপ। আর যতপ্রকার গতির সঙ্গে

আমাদের পরিচয় আছে, তার মধ্যে চিন্তা সর্বাপেক্ষা জটিল। চিন্তা গতি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

জড় নানা ক্রমে অভিব্যক্ত হয়। প্রত্যেক ক্রম পূর্ববর্তী ক্রম হতে উদ্ভূত হয়; এই ক্রমগুলি উদ্ভবের মধ্যে কোন অপ্রাকৃতিক (ঐশীশক্তি) ব্যাপার নাই। যে ক্রম এইরূপে উদ্গত হয় তা সম্পূর্ণ নতুন। তাতে যে যে গুণ আছে তাদের অস্তিত্বই পূর্বে ছিল না, এই বিশ্বসৃষ্টির কোথাও ছিল না। 'পরিমাণের গুণে পরিণতি' হতে এই নতুনত্ব উদ্ভূত হয়। ডিমের মধ্যে ক্রমে যে সকল আণবিক পরিবর্তন ঘটে, তার ফলে এক সময় হঠাৎ তার মধ্যে প্রাণশক্তির আবির্ভাব হয়। এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের পূর্বে দীর্ঘকাল ধরে অল্প অল্প পরিবর্তন হয়, বহুকাল সঞ্চিত পরিবর্তনের ফলে হঠাৎ একদিন নতুন গুণের আবির্ভাব হয়। মার্কসের মতে জড়ের এই বিকাশ পূর্বে উল্লিখিত ত্রিভঙ্গীমূলক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সংসাধিত হয়। মার্কস্ জড়ের ক্ষেত্রের এই বিকাশের নীতি অনুযায়ী মানব সমাজের বিবর্তন ব্যাখ্যা করেছেন এবং সামাজিক পরিবর্তন এই বিপ্লব-পদ্ধতিতেই সংঘটিত হয় বলেছেন।[১]

মার্কস্ এই 'ত্রিভঙ্গ নয় প্রণালী' হেগেলের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলেন। তবে হেগেল আত্মায় বিশ্বাস করেন, মার্কস্ করেন না। হেগেলের মতে ডায়ালেকটিকস্ পদ্ধতি অনুসারে আত্মার অভিব্যক্তি ক্রমানুসারে মানবীয় ইতিহাসের বিকাশ সংঘটিত হয়। মার্কস্ বলেন, যে শক্তি অভিব্যক্ত হয় তা জড়শক্তি। মানুষের আবির্ভাবের পরে মানুষের ও জড়প্রকৃতির সম্বন্ধ দ্বারা মানবীয় ইতিহাসের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ ও প্রকৃতির যে সম্বন্ধ, তার মধ্যে পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিই ইতিহাসের বিকাশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য মার্কসের জড়বাদ শেষ পর্যন্ত অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। তাঁর মতে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিতরণ প্রণালী কর্তৃক প্রত্যেক যুগের রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, দর্শন, এবং কলা-নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে।

---

১। তারকচন্দ্র রায়—'পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের ইতিহাস'—তৃতীয় খণ্ড।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হ'তে মার্কসীয় দর্শনের যে মূলতত্ত্বটি পাওয়া যাচ্ছে তা হ'ল এই—

প্রথমতঃ, জড়শক্তি হতে জ্ঞান-মন উদ্ভূত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিতরণ প্রণালী কর্তৃক প্রত্যেক যুগের রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন এবং কলা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে।

তৃতীয়তঃ, পরিবর্তনীয়তাই একমাত্র সত্য, অপরিবর্তনীয় কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

আমরা দেখতে পাই বিবেকানন্দ মার্কস্-এর এই তিনটি মূলতত্ত্বকেই খণ্ডন করেছেন। প্রথম তত্ত্বটির বিরুদ্ধে তিনি দু'টি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন।

প্রথমতঃ তিনি বলছেন যে জড়শক্তি হতে প্রাণ ও চিন্তাশক্তির উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর যুক্তি তাঁর ভাষাতেই উপস্থাপিত করছি—"আজকাল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতেছে[২] : জড়পদার্থের সমষ্টি এই দেহই কি আত্মা, চিন্তা প্রভৃতি বলিয়া কথিত শক্তির বিকাশের কারণ ; অথবা চিন্তাশক্তিই দেহের কারণ ? অবশ্য জগতের সকল ধর্মই বলেন চিন্তা বলিয়া পরিচিত শক্তিই সকলকে ব্যক্ত করে—ইহার বিপরীত মত তাঁহারা স্বীকার করেন না। কিন্তু, আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ের মত চিন্তাশক্তি কেবল শরীর নামক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির কোন বিশেষ ধরনের সন্নিবেশে উৎপন্ন।" "যদি আত্মা বা মন যে সকল জড়পরমাণু শরীর ও মস্তিষ্ক গঠন করিতেছে তাহাদেরই রাসায়নিক মিশ্রণে উৎপন্ন হয় তাহাতে এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যায়—শরীর গঠন করে কে ? কোন শক্তি পদার্থের অনুগুলিকে শরীররূপে পরিণত করে ? কোন শক্তি জড় পদার্থ হইতে কিয়দংশ লইয়া তোমার শরীর একরূপে, আর আমার শরীর একরূপে গঠন করে ? এই সকল বিভিন্নতা কিসে হয় ? আত্মা ভৌতিক পরমাণুগুলির বিভিন্ন সন্নিবেশে উৎপন্ন বলিলে

২। এখানে যা বলা হয়েছে তাতে মনে হয় বিবেকানন্দ ফয়ারবাক-মার্কসের মতই যেন উল্লেখ করেছেন। উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ 'বাণী ও রচনা'র ফুট নোটে এ মত Comte-এর বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বামীজী বলেছেন এ হ'ল আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ের মত।

'গাড়ির পিছনে ঘোড়া জোতার' ন্যায় হয়"...'শক্তি কখনও জড় হইতে উৎপন্ন হয় না, কাঠিন্য প্রভৃতি জড়ের গুণ সকল বিভিন্নপ্রকার গতি ও স্পন্দনের ফল। যাহাকে আমরা পদার্থ বলি তাহার কোন অস্তিত্ব নাই; কিন্তু বিপরীত মতটি প্রমাণ করা যায় না।" (১) "শরীরের মধ্যে এই যে শক্তি জড়পরমাণুগুলি নিয়ে আকৃতি-বিশেষ লইয়া মনুষ্য-দেহ গঠন করিতেছে। এই রহস্যময় শক্তিটি আত্মা।"

দ্বিতীয় যে যুক্তিটি স্বামী বিবেকানন্দ মার্কসের প্রথম প্রকল্প খণ্ডন করতে উপস্থাপিত করেছেন তা হ'ল এই যে অনস্তিত্ব হতে কখনও অস্তিত্ব উদ্গত হ'তে পারে না,জড় হতে কখনও প্রাণ ও মন—যা মার্কস্ বলছেন জড়ের মধ্যে নেই, পৃথিবীর কোথাও নেই, বিশ্বের কোথাও নেই,—তা উৎপন্ন হতেপারে না। বিশ্ববিধান বিশ্লেষণ করেবিবেকানন্দ দেখাচ্ছেন যে কখনও শূন্য হতে সৃষ্টি সম্ভব নয়, অসৎ থেকে সৎ উৎপন্ন হবার দৃষ্টান্ত জগতে কোথাও নেই। প্রাণ থেকেই প্রাণের উৎপত্তি, ইট কাঠ ইত্যাদি জড়বস্তু হতে কোথাও প্রাণের উৎপত্তি হয় না। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের মত একটি গাছ বীজ হতে উদ্গত হয়ে পরিশেষে একটি বীজ রেখে যায়, ডিম হতে পাখী উদ্ভূত হয় আবার একটি ডিম রেখে যায়, ভবিষ্যৎ পক্ষীকুলের বীজ; এমনি করে দেখা যায় "আদি ও অন্ত প্রায় সদৃশ"।[৩] "পর্বতের উৎপত্তি বালুকা হতে, বালুকায় আবার উহার পরিণতি; নদী বাষ্প হইতে আসে আবার বাষ্পে ফিরিয়া যায়। উদ্ভিদ জীবন আসে বীজ হইতে, আবার বীজেই ফিরিয়া যায়,মনুষ্যজীবন আসে জীবাণু হইতে,আবার জীবাণুতেই ফিরিয়া যায়। নক্ষত্রপুঞ্জ, নদী, গ্রহ-উপগ্রহ, নীহারিকাময় অবস্থা হইতে আসিয়াছে, আবার সেই নীহারিকায় লয় পায়।"[৪] অতএব, দেখা যায় এ এক আদি অন্তহীন ধারা—অব্যক্ত হতে ব্যক্ত অবস্থায় আসা এবং আবার ব্যক্ত হতে অব্যক্তে ফিরে যাওয়া। ব্যক্ত অর্থাৎ স্থূল অবস্থা—কার্য, আর সূক্ষ্মভাব তার কারণ। আমরা দেখছি যে

৩। আত্মার যথার্থ স্বরূপ—বিবেকানন্দ।

৪। "জগৎ-বহির্জগৎ'।

সূক্ষ্মতর রূপগুলি ধীরে ধীরে ব্যক্ত হচ্ছে, ক্রমশঃ স্থূল হতে স্থূলতর হচ্ছে। অতএব কার্য কারণের রূপান্তর মাত্র এবং কার্য কারণ অভেদ। অতএব, প্রাণ, মন, চিন্তা বা আত্মা এ সকল জড়ের দ্বারা হঠাৎ উৎপন্ন নয়—এগুলি আত্মশক্তিরই রূপান্তর। কারণ ছাড়া কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। সূক্ষ্মরূপগুলি ব্যক্ত হয়ে যে স্থূল স্থূলতর হয় তারই নাম ক্রমবিকাশ ; আর স্থূল চরম বিকাশের পর ক্রমে সূক্ষ্ম হতে যে সূক্ষ্মতর অবস্থায় পৌঁছায় তা ক্রমসঙ্কোচ। "বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু আবার আর এক বৃক্ষ ওই বীজের জনক।" প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া আছে। ডারউইন ক্রমবিকাশ তত্ত্ব লক্ষ্য করেছিলেন, ক্রমসঙ্কোচকে দেখতে পান নি। মার্কস্ আবার ডারউইনের এই ক্রমবিকাশবাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন, কারণ এ যুগান্তকারী তত্ত্ব মার্কসের অল্পদিন পূর্বেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। সে যাই হোক, বিবেকানন্দ প্রমাণ করেছেন যে বিশ্ববিধানে ক্রমবিকাশ থাকলে ক্রমসঙ্কোচ থাকতে হবে। প্রোটোপ্লাজ.ম্ থেকে যদি মানব, অতিমানব, বুদ্ধমানব উৎপন্ন হয়ে থাকে তা হ'লে প্রোটোপ্লাজ.মের মধ্যে বীজাকারে বুদ্ধমানব ছিল. পূর্ব ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়ার ফলে তাকে প্রোটোপ্লাজ.ম্ রূপে দেখা যাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে প্রাণ, মন, আধ্যাত্মিক সকল শক্তি নতুন পদার্থরূপে উৎপন্ন হচ্ছে। তা সম্ভব নয়, শূন্য হতে সৃষ্টি সম্ভব নয়। অতএব প্রেটোপ্লাজম্ হতে মানব—এ একটিই প্রাণ প্রবাহের ধারা -- উদ্ভিদ জীবন এর একটি পর্ব, নানারূপ বানর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী, মানুষ সকলই ঐ প্রাণ-শৃঙ্খলের এক একটি স্তর। ঢ কথা ক্রমবিকাশবাদীরা মানেন। কিন্তু এর সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচ তত্ত্ব প্রয়োগ করলে দেখা যায় নিম্নতম জন্তু হ'তে সর্বোচ্চ পূর্ণতম মানুষ অপর কিছুর ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। এই বস্তুটিকে ভারতীয়রা বলেন চৈতন্য। তাহলে চৈতন্যই জগতের উপাদান কারণ ও জগতরূপে অভিব্যক্তি তার কার্যরূপ। কিন্তু বিজ্ঞান বলে মানুষ ও উচ্চতর জন্তুতে এর অবস্থান, তৎপূর্বে চৈতন্য ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিধানের যে নিয়ম আমরা দেখছি তাতে যদি অন্তে পূর্ণমানব থাকে, আদিতেও

তা আছে। অতএব, পূর্ণতম মানবে যে উচ্চতম চৈতন্য দেখা যায়, তারই ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা ক্ষুদ্র প্রোটোপ্লাজ্‌ম্। অতএব সৃষ্টির আদি শক্তি বা বস্তু জড় পদার্থ নয়, তা চৈতন্য পদার্থ। এই চৈতন্য হতেই জগতের উদ্ভব[৫]। মার্কস্‌-এর তত্ত্বের ভিত্তিতে যে ক্রমবিকাশবাদ, তাকে বিবেকানন্দ অস্বীকার করেন নি। তাঁর তত্ত্ব বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই গঠিত এবং যুক্তির দিক থেকে তা প্রাণী বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করেছে ক্রমসঙ্কোচবাদের দ্বারা। এবং এই সম্পূর্ণতা হ'তে আমরা যে ব্যাখ্যা পেলাম এই সৃষ্ট জগত-সম্বন্ধে তার ভিত্তি তর্কশাস্ত্রের কোন বিধিকে লঙ্ঘন করে না। তার ভিত্তি বিশ্বের বাস্তব নিয়ম, কতগুলি দৃষ্ট সত্য। গাছ হতে বীজ, আর বীজ হতে গাছের আবির্ভাব—এ সকল বাস্তব সত্য, statement of fact। এইরূপে আমরা মার্কসের বিপরীত সিদ্ধান্ত পেলাম যে সত্য জড়পদার্থ নয়, চৈতন্য-বস্তু।

মার্কসের তৃতীয় (প্রথম ও তৃতীয়ের নিকট সম্বন্ধ হেতু তৃতীয়ের আলোচনা আগে করা হচ্ছে) প্রকল্প পরিবর্তনীরতাই সত্য এবং অপরিবর্তনীয় বলে কিছু নেই—এও বিবেকানন্দ অনুরূপ অকাট্য যুক্তি সহায়ে খণ্ডন করেছেন। জগতের ক্ষুদ্র অণু পরমাণু যে গতিধর্ম বিশিষ্ট বিজ্ঞানের এ সিদ্ধান্ত বিবেকানন্দ স্বীকার করেন। কিন্তু অপরিবর্তনীয় বলে কিছু নেই—তা তিনি মেনে নেন নি। তিনি বলেন যুক্তির দিক থেকে গতিকে থাকতে হ'লে স্থিতির অবস্থান অপরিহার্য। কারণ "গতি বা পরিমাণ আপেক্ষিক ভাবমাত্র, আমরা কেবল গতিহীন পদার্থের তুলনায় গতিশীল পদার্থের কথা ভাবিতে পারি।"[৬] অতএব অপরিবর্তনীয় বস্তু আছে। সে বস্তু হ'ল চৈতন্য। এই যে চৈতন্যের কথা বলা হয়েছে তা এক সামগ্রিক বিশ্বচৈতন্য। কারণ, ব্রহ্মাণ্ডে এখন যে জ্ঞানরাশি অভিব্যক্ত হচ্ছে, তার সমষ্টি অবশ্যই আদিতে ছিল, তা ক্রমসঙ্কুচিত সর্বব্যাপী চৈতন্যের অভিব্যক্তি

---

৫। "জগৎ-বহির্জগৎ।"

৬। "কর্মজীবনে বেদান্ত (৩)"

মাত্র। বিবেকানন্দ বলেন, এই যে সর্বব্যাপী বিশ্বচৈতন্য তা সেই অপরিবর্তনীয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে জড় বস্তুর পরিবর্তনশীলতা অনুভূত হয়। যে বস্তু অখণ্ড তা গতিশীল বা পরিবর্তনশীল হতে পারে না, কারণ গতি থাকতে হ'লে দুটি বস্তু চাই, এক গতিশীল বা পরিণামী, আর, দুই স্থিতিশীল অপরিণামী বস্তু। অখণ্ড চৈতন্যবস্তু কার সঙ্গে তুলনায় পরিবর্তিত হবে ? অতএব জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণুই সর্বদা পরিবর্তনশীল ও গতিশীল, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে জগৎ অপরিণামী। একে অত্যন্ত অসঙ্গত কথা বলে মনে হতে পারে! আমরা চারদিকে সকল বস্তুকে দ্রুতবেগে পরিবর্তিত হতে দেখছি। কিন্তু এও আমরা দেখেছি যে সত্য হ'ল এক অখণ্ড বস্তু-সত্তা, তার গতি নাই, পরিবর্তন নাই, পরিণাম নাই। তাহলে জগৎ সৃষ্ট হ'ল কি করে ? আর একটু আগে বর্ণিত ক্রম-বিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচবাদ কি মিথ্যা ? তা নয়।

যে দর্শন-মত হ'তে বিবেকানন্দ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে অখণ্ড সমষ্টি জগৎ অপরিণামী, তা সুবিখ্যাত অদ্বৈতবেদান্তবাদ, উপনিষদে যার প্রথম আবির্ভাব। এই অদ্বৈতবেদান্তবাদ বলে—কেবল একটি বস্তু আছে, অপরিণামী সর্বব্যাপী চৈতন্য, তাকেই পরিণামশীল বলে মনে হচ্ছে। সেই একই বস্তু নানারূপে প্রতিভাত হচ্ছে। রজ্জুই সর্প বলে প্রতিভাত হচ্ছে, সর্পের অস্তিত্ব নাই। অন্ধকারে রজ্জুকে সাপ বলে মনে হচ্ছে, জ্ঞানের উদয় হলে সর্পভ্রম ঘুচে যায়। এরূপ ভ্রমের নাম মায়া। কিন্তু মায়া অলীক পদার্থ নয়—যখন আমরা ব্যবহারিক সত্তা দেখি তখন পারমার্থিক সত্তা থাকে না, যতক্ষণ সাপ দেখি ততক্ষণ রজ্জুও সত্তাহীন আমার কাছে। আবার যখন পারমার্থিক সত্তা থাকে তখন ব্যবহারিক সত্তা থাকে না, অন্ধকার দূর হ'লে যখন রজ্জু থাকে তখন সাপের অস্তিত্ব নেই। তাই কখনও সেই একই বস্তু সেই দ্রষ্টারূপে প্রতীয়মান, কখনও দৃশ্য জগৎ বলে। সুতরাং মায়াকে আমরা অসত্য বলে অস্বীকার করতে পারি না—এ হ'ল statement of fact। এর স্বরূপ হ'ল অনির্বচনীয়—মায়া—ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, এইরূপ দ্বন্দ্বের সহাবস্থান। "এই মায়া মহাশূন্য বা অস্তিত্বহীন কিছু নয়—

অসৎ-ও নয়, সৎ-ও নয়, মায়া আছে একথাও বলা যায় না, আবার নাই তাও বলা যায় না।" অতএব অদ্বৈতবাদ আমাদের এই বিভিন্ন-রূপে প্রতীয়মান জগতকে ত্যাগ করতে বলে না, শুধু তার স্বরূপ বুঝতে বলে। "আমরা সেই অনন্তস্বরূপ, সেই আত্মা—সমুদ্রের জল যেমন সমুদ্র থেকে পৃথক নয়। অতএব যে অনন্তশক্তি, অনন্তজ্ঞান, অনন্ত অস্তিত্ব, অনন্ত আনন্দ ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমান, তার সমুদয় আমরা প্রত্যেকে।" "প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন কতকগুলি প্রণালীর মত যাহাদের ভিতর দিয়া সেই অনন্তসত্তা আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে; আর এই যে পরিবর্তন-সমষ্টিকে আমরা ক্রমবিকাশ নাম দিই, তাহারা বাস্তবিক আত্মার নানারূপ শক্তি-বিকাশ মাত্র।"[৭] সেইজন্য স্বরূপত সকলেই এক, প্রোটোপ্লাজম্ হতে দেবমানব পর্য্যন্ত, যা পার্থক্য তা এই বিকাশের। অতএব অনন্তসত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ আমাদের সকলেরই রয়েছে।

এর থেকে দেখা গেছে মার্কসের বিশ্লেষণ শেষ পর্যন্ত প্রসারিত নয়। এঁর মতের সঙ্গে বৌদ্ধদের মতের সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধরাও বলেন দৃশ্যমান অনন্ত পরিবর্তনশীল জগৎই আছে, তার পশ্চাতে অন্য কোন সত্তা নেই। তর্কের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছবার চেষ্টা করলে আমরা অদ্বৈত বেদান্তোক্ত সিদ্ধান্তগুলি পেয়ে থাকি।

মার্কসের দ্বিতীয় প্রকল্প এই যে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে সম্বন্ধ তার মধ্যে পণ্য উৎপাদন প্রণালীই ইতিহাসের বিকাশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ,—এও আমাদের যুক্তিকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। এঁর এমত ইতিহাস-প্রমাণে অসিদ্ধ। প্রথমতঃ মানুষের সকল প্রয়াসের মধ্য উৎপাদন প্রয়াস ও প্রণালী ইতিহাসে কেন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তার স্বপক্ষে মার্কস্ কোন যুক্তি দেখান নি। Manheim[৮] বলেন মার্কস্ শিল্পবিপ্লবের সার্থকতার প্রথমদিকে জন্মেছিলেন বলে তিনি অত্যন্ত বেশীমাত্রায় এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এবং

৭। ব্যবহারিক বেদান্ত—

৮। Manheim—Systematic Sociology—chapter on Social Change.

এজন্যই তিনি পণ্য উৎপাদন প্রণালীর মহিমার দ্বারা অভিভূত হয়েছিলেন। সে জন্য কোনরূপ যুক্তি প্রদর্শন না করে তিনি উক্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করেছিলেন। বর্ত্তমান কালের সমাজ-দার্শনিকেরা উৎপাদন প্রণালী, শিল্পকর্ম্ম, ধর্ম, দর্শন-চিন্তা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়— যার দ্বারা আমরা সৃজনশীলতার পরিচয় দিই—তার প্রত্যেকটিকেই সমাজ-পরিবর্ত্তনের মৌল উপাদান বলে গণনা করেছেন।[২]

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের প্রমাণ মার্কসের বিপক্ষে। উপরোক্ত প্রকল্প হতে মার্কস্ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে দ্রব্যের উৎপাদন প্রণালীর দ্বারা রাষ্ট্র নীতি দর্শন, ধর্ম্ম এবং কলা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। কৃষিজীবি প্রাচীন ভারতে কৃষিকার্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করত, তজ্জন্য বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের উপাসনা প্রবর্তিত হয়েছিল। এ কল্পনা করা অসম্ভব নয়। কিন্তু তা হ'লে প্রশ্ন এই যে, উপনিষদে যে দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় তার উদ্ভাবন হ'ল কোন্ উৎপাদন প্রণালীর ফলে? ভারতবর্ষ তো হাজার হাজার বৎসর ধরে কৃষি-নির্ভর ছিল, তা শুধু নয় তার উৎপাদন কুশলতা ( technology ) এই সেদিন পর্যন্ত ছিল এবং আজও বহুল পরিমাণে রয়েছে সেই মান্ধাতার আমলের। কার্ল মার্কস অবশ্য এ সঙ্গে আর একটা কথা বলেছেন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সৃষ্টি হ'ল অদ্বৈতবাদ, এবং এর ভিত্তি হ'ল সর্বক্ষমতাময় অর্থের প্রচলন। তা যদি হয় তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে অত্যন্ত জটিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজেও চার্ব্বাক দর্শন, এবং মার্কস্‌বাদীদের মতানুযায়ী আদি জড়বাদী বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন ও পরবর্তী কালের সহজিয়া কায়াসাধন ইত্যাদির মধ্যে কিরূপে জড়বাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হ'ল? এমন কি এঁদের মতে উপনিষদের যুগেও জনসাধারণ জড়বাদী ছিল, শুধু জনকতক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কারসাজীতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে অদ্বৈতবাদ সীমাবদ্ধ ছিল। এজন্য গার্গী জনক-রাজসভায় জড়বাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েও যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা নিহত হবার ভয়ে তা হ'তে বিরত হ'ন। গার্গীর প্রশ্নগুলি যে

২। সমাজতাত্ত্বিক Ogburn বিশেষ করে এ মত প্রতিষ্ঠা করেছেন—Handbook of Sociology—Ogbarn and Nimkoff.

কেবল জড়বাদ-তত্ত্বমূলক এ তাঁদের আবিষ্কার। পরস্পর বিরোধী উক্তির ও শেষ পর্যন্ত কল্পিত ঘটনার জটাজালে মার্কস্‌বাদী ইতিহাস আবদ্ধ। উপনিষদের যুগের যে সাহিত্য পাওয়া যায়—তা জড়বাদের প্রাধান্যের কোন সাক্ষ্য বহন করে না। একই উৎপাদন প্রণালী ও শ্রেণীপ্রাধান্য হ'তে কালে বহু বিভিন্ন দর্শনমতের আবির্ভাব দেখা যায়। এর ব্যাখ্যা মার্কস্‌বাদের নিকট হ'তে পাওয়া যায় নি। মার্কস্-বাদীরা বলেন যে শোষণের জন্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ অদ্বৈতবাদ আবিষ্কার করেছিল, তা হ'লে ক্ষত্রিয় রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধ, ব্রাহ্মণ শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ কেন সাম্য প্রয়াস করেছেন? আর তাঁদের সঙ্গে কবীর জোলা, চণ্ডাল রুহিদাস, যবন হরিদাসের প্রয়াসের ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায় কি করে? আর অধিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা সমগ্র মার্কস্‌বাদী দর্শনের যুক্তি-দৌর্বল্য ও অনৈতিহাসিকতা দেখলাম। এবার আমরা দেখব যে বিবেকানন্দ যে দর্শনতত্ত্ব আমাদের দিয়েছেন তা যুক্তিবত্তায় শ্রেষ্ঠ, ইতিহাস অবিরোধী, এবং সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক।

বিবেকানন্দ দর্শনের বৈজ্ঞানিকত্বের একটি নিদর্শন আমরা এ পর্যন্ত লক্ষ্য করেছি, দেখেছি যে তা ক্রমবিকাশবাদকে গ্রহণ করেছে। বিবেকানন্দের বেদান্ততত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি এই ক্রমবিকাশবাদ। এছাড়া এর আরও বৈজ্ঞানিকত্বের নিদর্শন আছে, তারই কিছু কিছু আমরা এখানে লক্ষ্য করব।

বিবেকানন্দ যে কয়টি প্রকল্প উপস্থাপিত করেছেন, তাঁর দর্শনমতে তা হ'ল ঃ

প্রথমতঃ, ক্রমবিকাশবাদ ( ও ক্রমসঙ্কোচবাদ ) ;

দ্বিতীয়তঃ, বৃত্তাকারে বিবর্তন ;

তৃতীয়তঃ, সর্বব্যাপী অপরিবর্তনীয় আত্মবস্তুর অস্তিত্ব ;

চতুর্থতঃ, মানুষের চৈতন্য স্বরূপতা, অনন্ত শক্তিবত্তা—বিকাশের পার্থক্য ;

পঞ্চমতঃ, অনির্বচনীয়া মায়ার অস্তিত্ব ইত্যাদি।

অবশ্য, এ সকল প্রকল্পের সবকয়টি বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত নয়, কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞান এই দৃশ্য-জগতকে ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত যে সত্য তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এ বিষয়ে বিজ্ঞানের যে সীমাবদ্ধতা আছে তা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উভয়েই স্বীকার করেন। বিজ্ঞান যে-সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম এরূপ কয়েকটি বিষয়ের একটি তালিকা দিয়েছেন Joad তাঁর "Philosophical Aspects of Modern Science" গ্রন্থে। সেগুলি—(a) That science cannot give an account of wholes ;

(b) That it cannot give an account of individuality ;

(c) That it cannot give an account of significance ;

(d) That it cannot give an account of the conscious process and in particular of the conscious process of human mind ইত্যাদি।

বর্তমান যুগের পদার্থবিদ্যাবিদ্‌গণ প্রকারান্তরে পদার্থবিদ্যা দ্বারা ঈশ্বরবস্তু ও আত্মবস্তু প্রতিপাদন করেছেন। এ বিষয়ে Eddington[১] ও Sir James Jeans[২]-এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।[৩] Eddington একজায়গায় বলেছেন—"There is no doubt that the scheme of physics as it has stood for the last three quarters of a century postulates a date at which either the entities of the universe, were created in a state of high organisation or pre-existing were endowed with that organisation which they have been squandering ever since. Moreover this organisation is admittedly the anti-thesis of chance. It is something which could

১। Eddington—The Nature of the Physical World.

২। James Jeans—(a) The Mysterious Universe
(b) Physics and Philosophy.

৩। হাইজেনবার্গ ও আইনস্টাইনেরও অবদান রয়েছে।

not occur fortuitously···It has been quoted as scientific proof of the intervention of the creator at a time not infinitely remote from to-day. But I am not advocating that we draw any hasty conclusions from it. Scientists and theologians alike must regard as somewhat crude the naive theological doctrine which (suitably disguised) is at present to be found in every text book of thermo dynamics, namely that some billions of years ago God worked up the material universe and has left it to chance ever since···It is one of those conclusions from which we can see no logical escape—only it suffers from the drawback that it is incredible"—Eddington-এর উক্ত উধৃতিটি উল্লেখ ক'রে "জড়বিজ্ঞানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব" শীর্ষক এক প্রবন্ধের লেখক[১] যে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন তা হচ্ছে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত—"জড়বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে ব'লে কোন সিদ্ধান্ত সত্যই করা যায় না, তবে প্রচ্ছন্নভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিজ্ঞানকে মেনে নিতে হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আরও উন্নত অবস্থায় হয়তো আমরা এবিষয়ে স্পষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবো"। Eddington-এর বিশ্বসত্যের ধারণা, গ্রহণ না ক'রেও, Joad পূর্বোক্ত গ্রন্থে সুন্দররূপে অঙ্কিত করেছেন—"Prof. Eddington does not think that reality consists of atoms and electrons and he does think that it is mental or spiritual in character."।[২] প্রকৃতপক্ষে Eddington এর চেয়েও এগিয়ে গিয়ে ধর্মবিশ্বাসের যুক্তিবত্তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর মত এই যে ধর্মবিশ্বাস অন্তর্জগতের অনুভূত সত্য-ভিত্তিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রের

১। সুধীর বিজয় সেনগুপ্ত—জড়বিজ্ঞানে ঈশ্বরতত্ত্ব—উদ্বোধন. ভাদ্র, ১৩৬০।

২। C. E. M. Joad—Philosophical Aspects of Modern Science—"Conception of Reality."

ভিত্তিও ঠিক অনুরূপ—"The attribution of the religious colour to the domain (i.e. that of the underlying reality) must rest on inner convictions which seem parallel with the unreasoning trust in reason which is at the basis of mathematics, with an innate sense of fitness of things which is at the basis of Science।"[১] এ সম্পর্কে বিবেকানন্দও দেখিয়েছেন যদি যুক্তিগত প্রমাণই প্রমাণ বলতে হয়, তাহলে দেখা যায় পদার্থবিদ্যা ও গণিত-বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের ভিত্তিও অযৌক্তিক। তা কতকগুলি অনুভূত বা প্রত্যক্ষ সত্য ব্যতীত কিছুই নয়, তারপরে আসে যুক্তির ক্ষেত্র বা logical state। অতএব, যাকে আমরা বিশ্বসত্য বলি তারও ভিত্তি কতকগুলি অনুভূত সত্য। তার ভিত্তিতে আমরা যুক্তি-প্রমাণ গড়ে তুলেছি -"সকল তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিদ্ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন—তাহা হইতে আরও কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল। ইহা একটি ঘটনা। আমরা উহা স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি—এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া রসায়নের সকল বিচার করিয়া থাকি। পদার্থবিদ্‌রাও তাহাই করিয়া থাকেন —সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেই এইরূপ। সর্বপ্রকার জ্ঞানই কতগুলি বিষয়ের অনুভূতির উপর স্থাপিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা যুক্তি বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অধিকাংশ লোক এখন ভাবেন ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু নাই। যদি ধর্মলাভ করিতে হয় তবে তাহা বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারা লাভ করিতে হইবে।"[২] Eddington আরও বলেছেন ধর্মের অনুভূতি যাদের লাভ হয়েছে, শতধারায় যাদের মধ্যে সে জ্ঞান বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাদের কাছে সে অনুভূতি প্রত্যক্ষ—"There are some to whom the sense of a divine presence irradiating the soul is one of the most obvious

১। Eddington—The Nature of the Physical world.

২। বিবেকানন্দ—জগৎ-বহির্জগৎ

things of experience……" "If we have no such sense then it would seem that not only religion, but the physical world and all faith in reasoning totter in insecurity"[১]। Eddington এ সম্পর্কে আরও একটি সুন্দর যুক্তি উত্থাপন করেছেন। অনেকে বলেন যে বিজ্ঞান অনুমান প্রমাসিদ্ধ, ধর্মতত্ত্ব নয়। এ বিষয়ে Eddington-এর মত—অন্তর্জগতের বিষয়, তার প্রমাণের রীতি ও বর্হিজগতের প্রমাণের রীতি এক নয় এবং প্রাতিভাসিক জগতের জাগতিক জ্ঞানের যা পরিভাষা সত্যজ্ঞানের সে পরিভাষা হ'তে পারে না—'If there is knowledge of what I shall non-committally call the 'real world', it is not to be communicated in language appropriate to the uses of the phenomenal one; or not without grave risk of misapprehension."[২]

Eddington-এর দর্শনমতকে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা সমালোচনা ক'রে বলেছেন—"It is less an account than a series of hints—of these hints some are inconsistent with others।"[৩] Eddington ইঙ্গিতমাত্র দিয়েছেন, একটি পূর্ণায়ত দর্শনমত পদার্থবিদ্যা হ'তে উপস্থাপিত করেন নি। কিন্তু একজন পদার্থবিজ্ঞানীর তা কাজ ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে কি? পদার্থবিদ্যার জ্ঞান তাঁকে আত্মবস্তু ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, তাই তিনি উপস্থাপিত করেছেন। Eddington-এ অসঙ্গতি আছে, তার প্রধান কারণ Eddington প্রাতিভাসিক জগৎ ও ঈশ্বর—এ উভয়কে সত্য ব'লে মনে করেছেন। ভারতেও একদল 'পরমাণুকারণবাদী' দার্শনিক আছেন যাঁরা বলেন জগৎ অসংখ্য পরমাণুর সমাহার মাত্র, এবং ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ সকল পরমাণু হ'তে সৃষ্টি হয়। ঐ মতের ত্রুটি বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন—যে পরমাণু তার সংজ্ঞানুযায়ী এমন বস্তু যার অংশ নাই, আয়তন নাই, অতএব পরমাণুর মধ্যে অংশ ও আয়তন

১। Ibid
২। Ibid
৩। Joad—Phelosophical Aspect of Modern Science.

উদ্ভূত হ'তে পারে না, কারণ অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব আসতে পারে না। কিন্তু দার্শনিকতায় Eddington শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন না, করেন পদার্থবিদ্যাবিদ্ ব'লে। তিনি দেখিয়েছেন, পদার্থবিদ্যা আজ যেখানে এসেছে তাতে জগতকে এখন 'mind-stuff' বলতে হয়। স্যার জেম্‌স্ জীন্‌সও বলেছেন জগৎকে 'mathematical mind stuff' বললে আরও ভাল হয়।[১] এ উভয় মতই আমাদের আত্মবস্তুর ধারণায় উপনীত করছে।[২] এই আত্মবস্তুই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং তার প্রত্যেকটি সূত্র আজ বিজ্ঞান কর্তৃক সমর্থিত না হ'লেও তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে বিজ্ঞান সমর্থন করে—তা হ'ল এই যে এক অদ্বৈতবস্তু আছে যা হ'তে জগৎ-সৃষ্টি। এঁরা নিঃসন্দেহে বলেছেন যে এক পদার্থ আছে যা অণু-পরমাণু ও মূলীভূত তেজকণা-দ্বারা সংগঠিত, এবং এঁরা ইঙ্গিত পেয়েছেন যে তেজকণা চিন্তা-বস্তুর দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যবস্তুর দ্বারা গঠিত, যদিও এ ইঙ্গিত এখনও প্রমাণিত নয়। বিবেকানন্দের সময় পদার্থবিদ্যা এতদূর অগ্রসর হয় নি, যতটা হয়েছিল তা হ'তেও বিজ্ঞান ও অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য-সূত্র তিনি ধরতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর মত যে বিজ্ঞান 'পদার্থে' বিশ্বের একত্ব প্রতিপাদন করে আর অদ্বৈতব্রহ্মবাদ চৈতন্যে—"আমি একটিমাত্র সত্তায় বিশ্বাস করি। আধুনিক জড়বাদীও এইরূপ বিশ্বাস করিতে বলেন। তবে তিনি শুধু উহাকে 'জড়' আখ্যা দেন, আর আমি উহাকে 'ব্রহ্ম'-বলি। জড়বাদী বলেন —এই জড় হইতেই মানুষের আশা ভরসা ধর্ম্ম সবই আসিয়াছে। আর আমি বলি ব্রহ্ম হইতে সমুদয় হইয়াছে।"[৩] অর্থাৎ বিজ্ঞান ও বেদান্তের লক্ষ্য এক—বহুর মধ্যে একত্বের প্রতিপাদন। প্রতীয়মান জগৎ ব্যাখ্যার দিক হ'তে সকল বিজ্ঞানই বেদান্ত-গ্রাহ্য। অতএব বেদান্তদর্শন বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে না। এ-বিষয়ে একজন আধুনিক জার্মান দার্শনিকের অভিমত যে বিবেকানন্দের ক্রমবিকাশ

---

১। Mysterious Universe—Sir James Jeans.
২। "The cosmic intelligence is what the theologians call God"
৩। "ব্রহ্ম ও জগৎ"।

তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মত।[১] তা ছাড়া বিবেকানন্দ নিজেও বলছেন, "ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধির ব্যাপারে সাংখ্যমতের সহিত আধুনিক শারীর বিজ্ঞানের পার্থক্য অতি অল্প"।[২] ("প্রশ্নোত্তরে আলোচনা"—বিবেকানন্দ)

বিজ্ঞানের দ্বারা অপর যে একটি বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত সিদ্ধ তা হ'ল এই যে জগতে কোনও গতি সরলরেখায় সম্ভব নয়। গণিতশাস্ত্র ব'লে যদি একটি সরলরেখাকে ক্রমাগত বর্ধিত করা যায় তা অবশেষে একটি বৃত্তে পরিণত হবে। আর আমরা দেখেছি বেদান্ত মতে শূন্য হ'তে কিছুই সৃষ্টি হয় না। সকল জিনিসই অনন্তকাল ধ'রে উঠছে, পড়ছে। উত্থান-পতনের আদিঅন্তহীন ধারায় সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে একবার লয়, আবার স্থূল, ব্যক্তভাবে প্রকাশ—সারা পৃথিবীতে এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া একটি বৃত্ত রচনা ক'রে চলেছে।

তৃতীয়তঃ, আমরা দেখি অপরিবর্তনীয় ও পরিবর্তনীয় এ উভয়ের একত্র অস্তিত্বের ধারণায় বিবেকানন্দের সঙ্গে অপরাপর আধুনিক বিজ্ঞান-বাদীদের মতের ঐক্য আছে। এ সম্পর্কে Joad বলছেন—"This conclusion, that living process is only a change, carries with it the corrollary that there is nothing which changes, or in other words that there is nothing to change, since in postulating such a something, we should be admitting the existence of something other than change."[৩]

এই সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত অদ্বৈত-বেদান্ত তত্ত্ব হ'তে বিবেকানন্দ আমাদের সমাজের উদ্ভব, তার উদ্দেশ্য, তার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অতি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

১। Gustav Menshing—"The Importance of Vivekananda in Religion and Science of Religion"—Swami Vivekananda Centenary Memorial Number—Bulletin of the R. K. Mission Institute of Culture.

২। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট ফিলসফিকাল সোসাইটিতে বেদান্ত দর্শনের আলোচনার পর প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

৩। C. E M. Joad—Philosophical Aspect of Modern Science.

প্রথমতঃ, স্বামীজী সমাজের উদ্ভব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলছেন—"স্বর্ণের স্বর্ণত্ব, রৌপ্যের রৌপ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, নারীর নারীত্ব—প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকেই আমরা অনাদিকাল হতে বহির্জগতে উপলব্ধি করবার প্রয়াস করছি ; আর সেই চেষ্টার ফলে আমাদের মন থেকে এই সকল অদ্ভুত সৃষ্টি বের হ'য়ে আসছে, যথা পুরুষ, নারী, শিশু, দেহ, মন, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জগৎ, ভালবাসা, ঘৃণা, ধন-সম্পত্তি, আর ভূত-প্রেত, দেবতা-ঈশ্বর প্রভৃতি।"

"আসল কথা—এই ব্রহ্ম আমাদের ভেতরেই রয়েছেন, এবং আমরাই তিনি ( সোঽহং ), সেই শাশ্বত দ্রষ্টা, সেই যথার্থ 'অহম্', যিনি কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন এবং যাঁকে অন্যান্য জিনিসের মত ইন্দ্রিয়গোচর করার চেষ্টা সময় ও ধীশক্তির অপব্যবহার মাত্র।"

"যথার্থ জীবাত্মা এ কথা বুঝতে পারে। তখনই সে এই জীব-জগত কল্পনা থেকে নিবৃত্ত হয়,—এবং ক্রমশই বেশী ক'রে অন্তরাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এরই নাম ক্রমবিকাশ—এতে যেমন শরীর বিবর্ত্তন ক্রমে আসতে থাকে, তেমনি অপরদিকে মন উচ্চ হ'তে উচ্চতর সোপানে উঠতে থাকে ; মানুষই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিকাশ। 'মনুষ্য' কথাটি সংস্কৃত 'মন' ধাতু থেকে সিদ্ধ - সুতরাং ওর অর্থ মননশীল অর্থাৎ চিন্তাশীল প্রাণী—কেবল ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণশীল প্রাণী নয়। ধর্ম্মতত্ত্বে এই ক্রমবিকাশকেই 'ত্যাগ' বলা হয়েছে। সমাজ গঠন, বিবাহ প্রথার প্রবর্ত্তন, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সৎকার্য, সংযম এবং নীতি—এগুলি ত্যাগেরই বিভিন্ন রূপ। প্রত্যেক সমাজ-জীবন বলতে বোঝায় ইচ্ছা, তৃষ্ণা বা বাসনাসমূহের সংযম। জগতে যত সমাজ ও সামাজিক প্রথা দেখা যায়, সে সব একটি ব্যাপারের বিভিন্ন ধারা ও স্তর মাত্র। সেটি এই ইচ্ছার বা কল্পিত 'আমির' বিসর্জ্জন। এই যে নিজের ভিতর থেকে যেন বাইরে লাফিয়ে যাবার ভাব রয়েছে, জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়রূপে পরিণত করার প্রচেষ্টা রয়েছে, সেটির বিসর্জ্জন।"[১] অর্থাৎ মানবজীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য

১। পত্রাবলী।
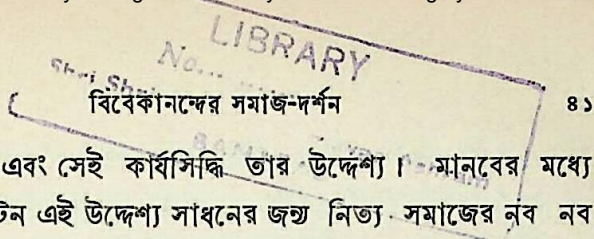
সমাজের উদ্ভব এবং সেই কার্যসিদ্ধি তার উদ্দেশ্য। মানবের মধ্যে দেবত্বের উদ্‌ঘাটন এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিত্য সমাজের নব নব রূপায়ণ চলছে।

অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তনশীল, কিন্তু তা হলেও যে সত্যকে বিধৃত করে তার এই বিবর্তন তা নিত্য, অপরিবর্তনীয়। সমাজ-জীবনেও আমরা তাই পরিবর্তনীয়ের মধ্যে অপরিবর্তনীয়কে দেখতে পাই—

"We know that in our books, a clear distinction is made between two sets of truth—the one set is that which abides for ever, being built upon the nature of man, on nature of the soul, the soul's relation to God, perfection and so on ; there are principles of cosmology of the infinite creation, or more correctly speaking—projection, the wonderful law of cyclical procession and so on ; these are principles founded upon universal laws in nature. The other set comprises the minor laws, which guides the working of our every day life. Even in our nation the minor laws have been changing all the time।"[১] অর্থাৎ জীবের প্রকৃতি, আত্মার স্বরূপ, জীবাত্মা ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ, পূর্ণতা ইত্যাদি, এই অনন্ত সৃষ্টি-রহস্য—এই বিশ্বপ্রকৃতি যার প্রয়োগমাত্র, এগুলি প্রকৃতির সর্বজনীন বিধির উপর দাঁড়িয়ে আছে—এ হ'ল বিশ্ব সত্যে বিধৃত অপরিবর্তনীয় শাশ্বত। এ সংসারে যে অপর সত্যকে আমরা দেখছি যা চক্রাকারে পরিবর্তনশীলতার অপূর্ব নিয়মের অধীন, তা গৌণ নিয়মের সমষ্টি, তা আমাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালিত করে। এই অপরিবর্তনীয় শাশ্বত সত্য আমাদের মূল্যমান। নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজের উৎপাদন-বিধি, নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি, শৃঙ্খলা-বিধি, জীবনযাত্রা প্রণালী, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞান প্রতি মুহূর্তে পরি-বর্তিত হচ্ছে। কিন্তু অপরিবর্তনীয় শাশ্বত মূল্যগুলি সমাজ-জীবনের মূলে যা প্রতিষ্ঠিত আছে, তার কোনও পরিবর্তন নাই। সমাজের

১। Complete works—Vol, III P. 112

উদ্দেশ্য তার লক্ষ্যপথে স্থির রাখবার জন্য বারবার তাই সাধু-মহাপুরুষ আবির্ভূত হ'ন যাঁরা এই শাশ্বত সত্যের পুনঃপুনঃ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য চক্রাকারে পরিবর্তনের বিশ্ববিধান অনুযায়ী বারম্বার মানুষের শাশ্বত সত্যবোধ আবরিত হয়, পুনর্বার নগ্নরূপে তা প্রকটিত হয়—অর্থাৎ একবার সমাজ-জীবনে তার ক্রমবিকাশ দেখা যায়, পুনরায় দেখা যায় ক্রমসঙ্কোচন। সমাজ-জীবনের গতিপথের ধারা এইভাবেই নিয়ন্ত্রিত—জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের ক্রমিক প্রসারের কক্ষপথই তার চলার পথ! অতএব আমরা মানবজীবনের সমস্যা পরিপূরণের দু'টি বিপরীত প্রয়াস সমাজে লক্ষ্য করি—তার একটি ঐহিক উন্নতির প্রয়াস, অপরটি আধ্যাত্মিক উন্নতির। একবার জড়বাদী প্রয়াস প্রাধান্য অর্জন করে, আবার অধ্যাত্মবাদী। এই তরঙ্গাকারে ক্রমবিকাশ, ক্রমসঙ্কোচন—বা উত্থান-পতনের পদ্ধতিই বিবেকানন্দের মতে সমাজ-জীবনের বিবর্তনের লজিকাল (তর্কশাস্ত্র-সম্মত) বিধি। মার্কস্-এর জড়বাদেও আমরা দেখেছি বিশ্ববিধানের ত্রিভঙ্গী নয় প্রণালীতে ইতিহাস বিকশিত হয়। বিবেকানন্দের বেদান্তদর্শন মতেও আমরা দেখছি যে বিশ্ববিধানের এই উত্থান-পতনের ধারায় ইতিহাস বিবর্তিত হয়।

এ মতের প্রধান তাৎপর্য এই যে পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় উভয় সত্যের স্বীকৃতিতে আর্থিক শক্তিই সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের একমাত্র মৌল উপাদান এ ভ্রান্ত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর্থিক শক্তির হাতে মানুষ অন্ধ ক্রীড়নক এ ধারণা অনুপ্রবেশের কারণ সমাজ-গঠনের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণার অস্পষ্টতা। বিবেকানন্দের দর্শন মতে সমাজ-জীবনের মূল সক্রিয় উপাদানগুলি আমাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে—মানুষের ধর্মচিন্তা ও উপলব্ধি, শিল্প-প্রয়াস, জীবন-বোধ, উৎপাদন-কুশলতা, সব কিছুই সমাজজীবনের নূতন ডৌল এনে দিতে পারে। এবং আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে এই মৌল উপাদানগুলির প্রত্যেকটির যে সর্বত্র একইরূপ প্রাধান্য ঘটবে তা নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানসিক

গঠন ইত্যাদি নানা কারণে দেখা যায় কোন ক্ষেত্রে একটির প্রভাব বেশী, অন্য জায়গায় অন্য একটির। কিম্বা কয়েক জায়গায় কয়েকটির বিশেষ প্রাধান্য অন্য জায়গায় অন্য কয়েকটির। এই কারণেই দেখা যায় ভারতবর্ষে ধর্মের প্রাধান্য, যদিও অন্যান্য শক্তিও সেখানে ক্রিয়া করেছে।

# তৃতীয় অধ্যায়

## ফলিত বেদান্ত দর্শন ও সমাজ

"The work of Advaita Philosophy is to breakdown all privileges"—Swami Vivekananda.

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি মানব-প্রকৃতি ও মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নিরূপণের উপর সমাজ-জীবন নির্ভরশীল। এই মানব-জীবন সম্বন্ধে বিবেকানন্দের যে অভিমত তা আমরা পূর্ব-অধ্যায়ে তার যুক্তি-বত্তাসহ দেখেছি—"আমরা সেই অনন্ত পুরুষ, সেই আত্মা। আমরা জলস্বরূপ, আর এই জল সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, উহার সত্তা সমুদ্রের উপর নির্ভর 'করিতেছে, বাস্তবিকই উহা সমুদ্র—সমুদ্রের অংশ নহে, সমুদয় সমুদ্র-স্বরূপ।" অতএব স্বরূপতঃ "অনন্ত শক্তি, অনন্ত সত্তা, অনন্ত আনন্দ আমাদের আছে।" কিন্তু জল যেমন সমুদ্রের বাইরে এসে ভুলে যায় যে সে সমুদ্র, তেমনই আমরা মায়াদ্বারা আবরিত হ'য়ে ভুলে গিয়েছি আপন স্বরূপ। অতএব অদ্বৈতবেদান্তবাদ আমাদের এই বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান জগৎকে ত্যাগ করতে শিক্ষা দেয় না, জগৎ কি তাই বুঝতে বলে। অদ্বৈতবেদান্তের শিক্ষা এই অনন্তজ্ঞান-শক্তি-আনন্দ আমাদের ভিতরেই আছে, বাইরে থেকে তা উপার্জন করতে হবে না: অতএব এগুলি প্রকাশ করতে হবে মাত্র। এবং এই স্বরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে নিত্য প্রকাশশীল—আমরা প্রত্যেকে যেন কতগুলি প্রণালী যার মধ্য দিয়ে সেই অনন্ত সত্তা আপনাকে অভিব্যক্ত করছে, আর এই যে পরিবর্তন সমষ্টিকে আমরা ক্রমবিকাশ নাম দিই, সেগুলি বাস্তবিক পক্ষে আত্মার নানারূপ শক্তিবিকাশ মাত্র।

এই তত্ত্ব বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য। তাঁর জীবনী-কারেরা বলেন যে তাঁর পরিব্রাজক জীবনের প্রথমদিকে একদিন হৃষীকেশে এক বৃক্ষতলে বসে তিনি অনুভব করেছিলেন যে এই বিশ্বের প্রতি অতে অণুতে, প্রতি কোষে কোষে সেই বিরাট ব্রহ্ম বিরাজ-

মান। পরবর্তীকালে এই অনুভূতিকেই তিনি অনুপম যুক্তিতর্ক সহায়ে উপস্থাপিত করেছিলেন তাঁর 'জগৎ' সম্বন্ধীয় দু'টি অনুপম বক্তৃতায়[১] যার কিছু কিছু আমরা পূর্ব অধ্যায়ে প্রসঙ্গত আলোচনা করেছি। আরও অনুপম সুন্দর ভাষায় এই অনুভূতিকে তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'সখার প্রতি' কবিতায়—"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়"। আর একটি কথা তাঁর পরিব্রাজক জীবনে রাজা, পণ্ডিত, চণ্ডাল, চোর-সাধু সকলের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত হ'তে হয়েছিল। তাঁর জীবনীকারেরা বলেন,[২] মধ্যভারতে একবার একদল চোরের মধ্যে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গণ-মানসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এই পরিচয় তাঁকে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছিল—"কি শক্তিমান, কি দুর্বল, কি উচ্চ, কি নীচ, প্রত্যেকের মধ্যেই সেই অসীম আত্মা রহিয়াছেন। সুতরাং মহান ও মহৎ হইবার অসীম সম্ভাবনা ও অসীম শক্তি সকলেরই আছে।"

এ হ'তে তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের বাস্তব জীবনের রূপায়ণ এই সত্যের ভিত্তিক হবে। প্রথমতঃ, এর ফলে প্রত্যেকের মধ্যে সকল দুর্বলতা দূর হবে, কারণ যখন প্রত্যয় হবে যে আমরা প্রত্যেকে সেই নিত্যশুদ্ধ, সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ-স্বরূপ তখনই সব ভয় দূর হয়, সব দুর্বলতা দূর হয়। মানুষ তার খর্বতা, অসম্পূর্ণতার উর্ধ্বে গৌরব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্বৈত বেদান্তের কর্মায়ত বা ফলিত দিক মানুষের মধ্যে বন্দী সুপ্ত শক্তির জাগরণ, তার সত্তার জাগরণ ও পুনর্গঠন। এরূপ মানুষ প্রকৃতির দাস নয়, প্রকৃতি তার দাস। সেই শক্তিমান মানুষই নিত্য নূতন সৃষ্টি করতে পারে, সভ্যতাকে অর্থে, সম্পদে, শিল্পকলায় সর্বতোভাবে উন্নত করতে পারে, নিজে সুখ-সম্পদ লাভ করতে পারে।

এই ফলিত বেদান্ত দর্শনের আর একটি দিক আছে—তা সমাজ-

---

১। The Cosmos : The Microcosm Complete works P. 203 and 212
The Macrocosm.

২। রোঁমা রোঁলা—বিবেকানন্দ জীবনী

জীবনের দিক। মানুষের মধ্যেই যদি সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্য থেকে থাকে, তা হ'লে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সেই একত্বের অবস্থান স্বীকার করতে হয় আমাদের ধর্মে, সমাজ গঠন, নিয়ম-শৃঙ্খলা আইন রচনায়। উপাসনার ক্ষেত্রে মানুষের দেহকেই ভগবানের মন্দির মনে ক'রে, মানব-সেবার দ্বারাই তখন ভগবানের পূজা করতে হয়। তাই-ই তখন শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ তাই যদি সত্য হয়, তা হ'লে পৃথিবীর শোষিত, বঞ্চিত, নীপিড়িত মানুষ ও অত্যাচারিত শোষিত অনুন্নত জাতি—এদের মুক্তি ও উন্নতি সাধনই হ'য়ে দাঁড়ায় বেদান্তবাদীর অবশ্য কর্তব্য। তাই বিবেকানন্দের মতে এই মহান ভাবধারা "উচ্চশ্রেণীর অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা, শিক্ষিতদের অপেক্ষা অশিক্ষিতরা, শক্তিশালীর অপেক্ষা দুর্বলেরা অধিকতর পরিমাণে চাহিতেছে—", "আমাদের এই পদদলিত নিপীড়িত জাতি ...চাহিতেছে"। যেসকল কোটি কোটি মানুষ আজ অনাহারে আছে, যুগ যুগ ধরে অনাহারে আছে, যাদের ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত অন্ধকার আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, যাদের যুগ যুগ ধরে শোনানো হয়েছে—তোমরা কেউ নও, কিছু নও, মানুষ নও, যাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী এমন আতঙ্কের মধ্যে রাখা হয়েছে যে তারা পশুতে পরিণত হয়েছে, এমনকি যারা অত্যাচারীদের চিনতে পর্যন্ত পারছে না—তাদের অধিকার ফিরে পাবার ও উন্নত হবার উপায় এই অদ্বৈতবেদান্ত। "তাদের শুনতে দাও যে তাদের মধ্যেও সেই আত্মা আছেন—অজ্ঞ, অশক্ত নরনারী সকলেই শিখুক...কেউ দুর্বল নয়; আত্মা,—অসীম, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, ওঠ, দাঁড়াও, নিজেকে জোরের সঙ্গে প্রচার করো, তোমাদের মধ্যে যে ভগবান আছেন, তাঁকে ঘোষণা করো, তাঁকে অস্বীকার করো না"—এই হ'ল অদ্বৈতবেদান্তের আহ্বান।

অতএব অদ্বৈত বেদান্তের কর্মায়ত রূপ শুধু ব্যক্তি মানুষকে পুনর্গঠন করছে না, সমাজ পুনর্গঠনের জন্যও তার একটি নিদারুণ প্রেরণা রয়েছে। ভারতবর্ষের মানসগঙ্গা হ'তে নিঃসৃত এই বিপুল জলধারা সারা পৃথিবীকে প্লাবিত ক'রে এক "আমূল রূপান্তর" আনতে প্রয়াসী।

ফলিত বেদান্ত দর্শন বস্তুত তাই এক বিপ্লব-দর্শন। বিবেকানন্দ তার এই ফলিত দিক ও বৈপ্লবিক দিককে পূর্ণ রূপায়িত করেছেন—এই তাঁর মহত্তম অবদান।

আমরা উপরে বর্ণিত ফলিত বেদান্ত দর্শনের আলোচনায় দেখি যে সমগ্র বেদান্ত দর্শনকে বিবেকানন্দ দু'টি মূল সূত্রে পরিণত করেছেন—

এক, মানবের স্বরূপতঃ দেবত্ব (Divinity of Man);

দুই, মানব জীবনের অপরিহার্য আধ্যাত্মিক প্রবণতা (Essential spirituality of Man).

এই দু'টি মূল সত্য হ'তে সমাজ-গঠনের দু'টি মূল সূত্র তিনি পেয়েছিলেন—

এক, "That every society, every state, every religion, ought to be based on the recognition of this all powerful presence latent in man..."

দুই, "That in order to be fruitful all human interest ought to be guided and controlled according to the ultimate idea of the spirituality of life."[১]

অর্থাৎ প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক রাষ্ট্র, প্রত্যেক ধর্মকে সেই সর্ব-শক্তিমান অস্তিত্ব (অর্থাৎ দেবত্ব যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে)—, তার স্বীকৃতির ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে,

এবং মানব-জীবনের যে আধ্যাত্মিক প্রবণতা স্বাভাবিক তাকে স্বীকৃতি দিয়ে মানুষের সব স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

তবেই সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য সফল হবে।

এই সকল কথার সুগভীর তাৎপর্য আজও পর্যন্ত ভেবে দেখি নি আমরা। বেদান্তের এই ফলিত দিক বা বাস্তব প্রয়োগের প্রকৃত তাৎপর্য সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর সাধন। বিবেকানন্দ নানা জায়গায় বলেছেন—"I want root and branch reform"—"আমূল রূপান্তর সাধনই আমি চাই।" বস্তুতঃ আমরা সুস্পষ্ট দেখছি

১। ভাষা রোঁমা রোঁলার (Life of Swami Vivekananda)

যে, বেদান্তকে কার্যে পরিণত করলে আমরা এক অপূর্ব সাম্য-সমাজ ও রাষ্ট্র পাই যেখানে সকলে একই অধিকার ভোগ করবে। এ এক অভিনব সাম্যবাদ। আমরা এতকাল ধরে কেবল শুনে এসেছি বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের চণ্ডাল মূর্খ পতিত সকলকে দরিদ্র নারায়ণ আখ্যা দিয়ে বন্যা দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন দিতে বলেছেন।[১] এ মত হ'তে কেউ বা 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'কে একটি মহৎ ব্রত বলে মনে করেছেন, কেউ বা বলেছেন যে দরিদ্র তাকে নারায়ণ বলার অর্থ তাকে অপমান করা। কেউই বিবেকানন্দের এই সাম্যবাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারেন নি, মার্কস্‌বাদিগণ এর মধ্যে যতটুকু তাঁদের মতের অনুগ শুধু ততটুকু গ্রহণ করেছেন। বিবেকানন্দের সাম্যের ধারণা সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমরা আংশিক ধারণা মাত্র পেয়ে এসেছি, তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করা হয় নি।

বিবেকানন্দ সব মানুষের সমান অধিকার নয়, একই অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। বেদান্ত একত্ব প্রতিপন্ন করে, সমানত্ব নয়, যেখানে বৈচিত্র্য রয়েছে, সেখানে সমানত্ব অসম্ভব।

এই এক-ই অধিকার তিনি কেবলমাত্র স্থূল রাজনৈতিক বা আর্থিক অধিকারের অর্থে প্রয়োগ করেন নি। এইজন্য তাঁকে পৃথিবীর অন্যান্য সাম্যদর্শনবাদীদের সমগোত্র বলে ঘোষণা করলে নিতান্ত ভুল করা হবে। আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকারের কথাই মাত্র তিনি বলেন নি, তা হ'লে তাঁর মৌলিকতার কোনও দাবিই থাকে না। মনে রাখতে হবে তিনি রাজনৈতিক ও আর্থিক সমান অধিকারের অতিরিক্ত সাম্যের আর একটি সর্তের কথাও বলেছন। তা হ'ল এই যে মানুষের সব স্বার্থ গড়ে তুলতে হবে, নিয়ন্ত্রিত করতে হবে তার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রবণতার দিকে দৃষ্টি রেখে। এখানেই বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন অন্যান্য যাবতীয় সমাজ-তত্ত্ব-বিদ্‌দের চিন্তাধারা থেকে ভিন্নরূপ নিয়েছে,এবং এক নতুন অর্থবহ হয়ে

১। সর্বসাধারণের মধ্যে এই মতের বিপুল প্রচার রয়েছে যদিও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যক্রমের মধ্যে আছে—(১) অন্নদান, (২) বিদ্যাদান ও (৩) জ্ঞানদান এই তিনটিই।

উঠেছে। বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেই সে সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হ'বে না। সে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যপদ্ধতি, সে সমাজের সমগ্র জীবন মানব-জীবনের দেবত্ব ও আধ্যাত্মিকতা উন্মেষের সহায় হওয়া চাই। ফলে শুধু রাষ্ট্রবিপ্লব নয়, আর্থিক বিপ্লব নয়, মানুষের সমগ্র জীবনজোড়া এক আমূল পরিবর্তনের তিনি রূপ দিয়েছেন। বেদান্তের বাস্তব রূপায়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই অভিনব বিপ্লব, এই আমূল রূপান্তর। এইরূপ বৈদান্তিক সমাজে কোনও প্রকার বিশেষ সুবিধার স্থান নেই। তিনি বলেছেন, মানব-সমাজে আবহমানকাল ধরে আমরা নানাপ্রকার বিশেষ সুবিধা দেখতে পাই, যার ফলে সর্বসাধারণ শোষিত ও অত্যাচারিত হয়। এ সকলের অবসানের এক মাত্র উপায় বেদান্তের মধ্যে নিহিত। "Vedanta and Privileges" শীর্ষক এক মৌলিক আলোচনায় অপূর্ব বিশ্লেষণী কৌশল প্রয়োগ করে এ সম্পর্কে তিনি বলছেন—"But the idea of privilege is the bane of human life...... There is first the brutal idea of privilege, that of strong over the weak. Then there is the privilege of wealth. If a man has more money than another he wants a little privilege over those who have less. There is still the subtler and more powerful privilege of intellect; because one man knows more than others, he claims privilege. And the last of all and the worst, because the most tyrannical is the privilege of spirituality. If some persons think that they know more of spirituality, of God, they claim superior privilege over everyone else............"। সামাজিক ভেদবৈষম্য আর্থিক কারণে হয়, জ্ঞানের তারতম্যের জন্য হয়, আবার আধ্যাত্মিকতার কারণেও ভেদবৈষম্য আছে। যার বেশী অর্থ আছে সে একটু বিশেষ সুবিধা চায়, যে বেশী জানে সে অজ্ঞজনদের উপরে বিশেষ সুবিধার দাবী করে, এমন কি যে আধ্যাত্মিকতায় কিছু অগ্রসর সেও যারা পিছিয়ে আছে তাদের কাছে

এই বিশেষ সুবিধার দাবী করে থাকে—এ আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিনিয়তই তো দেখতে পাচ্ছি। এই বিশেষ সুবিধাই যত অত্যাচার যত শোষণ যত অবিচারের মূলে বিরাজ করছে। কি করে এর অবসান হয়, এ মানুষের একটি মৌলিক প্রশ্ন। সব সংশয়ের অবসান করেছেন স্বামীজী বেদান্তের একটা যুক্তি দ্বারা "The same power is in every man, the one manifesting more, the other less, the same potentiality is in every one. Where is the claim to privilege ? All knowledge is in every soul, even in the most ignorant ; only he has not manifested it, but perhaps he has not the opportunity.......... The work of Advaita philosophy is, therefore, to breakdown all these privilegs।" অতএব অনন্তশক্তির আধার দীনদরিদ্র, অজ্ঞ, অশক্ত, নাস্তিক, আস্তিক, ধার্মিক, অধার্মিক সকলেরই সমান অধিকার সর্বত্র—কি সামাজিক ধনবণ্টনে, কি শিক্ষার ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে, কি অধ্যাত্ম সত্য অর্জনের ক্ষেত্রে। সকলেই যখন সমান সুযোগ পেলে উন্নতির একই পর্যায়ে কালে উন্নীত হতে পারবে, তখন এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করবার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি অদ্বৈতবেদান্ত শোষণ অবিচার ও বিশেষ সুবিধার অবসান কল্পে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

এইজন্য স্বামীজী রাজনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, "আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকীর সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখতে চাই না। আমি কোনো প্রকার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই। ঈশ্বর ও সত্য একমাত্র রাজনীতি আর সব বাজে।" যাঁরা বলেন বিবেকানন্দ রাজনৈতিক বিপ্লব চেয়েছিলেন তাঁরা তার একথা গুলি লক্ষ্য করেন নি। স্বামীজীর কথা হল—"My ideal, indeed, can be put into a few words and that is : to preach unto mankind their divinity, and how to make it manifest in every moment of life," মানুষের সুপ্তাবস্থায় নিহিত দেবত্বের প্রকাশ সংঘটন এবং কিরূপে

জীবনের প্রতিমুহূর্তে সেই দেবত্বের স্ফুরণ ঘটানো যায় তারই উপায় নির্ধারণ—এই দুইটিই তিনি তাঁর প্রধান কর্ম বলে গ্রহণ করেছেন। বেদান্তের বাস্তব প্রয়োগ দ্বারা ভেদ বৈষম্যের সমস্যার অবসানের উপায় নির্দেশ করেছেন বিবেকানন্দ। তাই তিনি বলছেন, "The first that demands our attention is, that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our scriptures, in our Purans—must be brought out from the books, brought out from the monastries, brougt out from the forests, brought out from the possession of selected bodies of the people, scattered, and broadcast all over the land, so that these truths may run like fire all over the country from the north to south, east and west, from the Himalayas to the Cape Comorin, from Sindhu to Brahmaputtra।" বনের বেদান্তকে গৃহে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা এই তাঁর জীবনের মূল ব্রত হয়েছিল। এই ফলিত বেদান্তই তাঁর সমাজ-দর্শনের উৎস ও ভিত্তি। এরই উপর ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর সমগ্র সমাজ-দর্শনের সৌধচূড়া—তাঁর অভিনব সমাজতন্ত্রবাদ নির্মাণ করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা এই বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধান করবার প্রয়াস পাবো।

———

# চতুর্থ অধ্যায়

## সাম্প্রতিক দৃষ্টিতে

### বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ

### "I am a Socialist"—Swami Vivekananda

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ফলিত বেদান্ত দর্শনের মধ্যে এক অভিনব সাম্যবাদের সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন এ আমরা দেখেছি। স্বামী বিবেকানন্দের এই সাম্যবাদ কিন্তু আজ পর্যন্ত খুব বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। তাঁর উক্তির মধ্যে শূদ্র-বিপ্লব সংক্রান্ত কয়েকটি উক্তি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তা ছাড়া তাঁর পত্রাবলীতে পাওয়া যাচ্ছে তিনি তাঁর কোন একজন অনুরাগী ভক্তকে লিখছেন, "I am a Socialist"। এ কথা কয়টিতে অনেকে চমকিত হয়েছিলেন। কারণ, সর্বসাধারণের চোখে বিবেকানন্দ মায়াবাদী সন্ন্যাসী। মায়াবাদ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে এ তত্ত্ব বলে—"জগৎ তিনকালে নেই।" তার উপর বিবেকানন্দ ছিলেন সেই রামকৃষ্ণ-দেবের একান্ত অনুগত শিষ্য যিনি তাঁর সারাজীবন ধরে কেবল একের পর এক ধর্ম সাধনা করে গিয়েছেন। অথচ সমাজতন্ত্রবাদের ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে, সেণ্ট সাইমন (Saint Simon) প্রভৃতি কয়েকজন মুষ্টিমেয় খৃষ্টধর্মাবলম্বী ধর্মযাজক ব্যতীত যাঁরাই সমাজ-তন্ত্রবাদে আস্থা প্রকাশ করেছেন, তাঁরা সকলেই নীরীশ্বরবাদী ও ধর্মদ্রোহী। বর্তমানে এই সকল Christian Socialist-গণ সমাজ-তন্ত্রীদের মধ্যে 'অবৈজ্ঞানিক ও 'রোমান্টিক' এই অপবাদে ভূষিত হয়ে অপাংক্তেয় হয়ে আছেন, সমাজতন্ত্রী বলে কেউ তাঁদের বিশেষ গণ্য করেন না। এ অবস্থায় বিবেকানন্দের 'I am a Socialist'—এই উক্তি অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। তিনি 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থের এক জায়গায় আবার এও বলেছেন, "আমি একজন জড়বাদী"[১] যদিও এ

১। "ব্রহ্ম ও জগৎ"।

উক্তিটি অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। এই দু'টি উক্তি একসঙ্গে গ্রহণ করলে সত্যই নানা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, এই কারণে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তাঁকে Chiristian Socialist-দের গোত্রভুক্ত করে 'romantic Socialist' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। তাঁর মতে বিবেকানন্দের মত একজন হৃদয়বান সন্ন্যাসীর পক্ষে আর্ত পীড়িতের বেদনায় উদ্বেলিত হওয়া স্বাভাবিক এবং এজন্য এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি দেশবাসীকে ঐহিক উন্নতির জন্য প্রয়াস করতেই বলে গেছেন। তবে বিবেকানন্দের অগ্নিময় সহানুভূতি তাঁর বিচ্ছিন্ন উক্তির মধ্যে দিয়ে পরবর্তীকালের সমাজতন্ত্রবাদকে উদ্বুদ্ধ করেছে—এ বিষয়ে অধ্যাপক সরকার স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। তিনি বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রের পিছনে এই সহানুভূতি ছাড়া কোন যুক্তি, কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বা ইতিহাসের সমর্থন ইত্যাদি দেখতে পান নি। ডাঃ সরকার এও মনে করতেন যে, তাঁর সমাজ-সেবার আদর্শের জন্য বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কোঁতের নিকট ঋণী।[১]

আমরা দেখেছি—অপর একজন ভারতীয় সমাজশাস্ত্রবিদ্ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত[২] তাঁর "Vivekananda the Socialist" এবং "Swami Vivekananda : the Patriot-prophet শীর্ষক বহুল প্রচারিত গ্রন্থদ্বয়ে এক ভিন্ন মত উপস্থাপিত করেছেন। ডাঃ দত্ত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থখানির মুখবন্ধে বলেছেন ঃ "One cannot but admit that Swamiji was saturated with the ideas of the social revolutionaries of the West.....one will be surprised in reading that Swamiji has not only used Marx's phrase, that 'the poor are getting poorer and the rich are getting richer', but he has also spoken about the proletarian culture...।"

১। ডাঃ সরকারের এ মত তাঁর নানাগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে এবং আমি নিজে পাঠ কক্ষে তাঁকে একথা বলতে শুনেছি যেমন শুনেছেন আরও বহু ছাত্র-ছাত্রী।

২। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ।

অর্থাৎ ডাঃ দত্ত বিবেকানন্দের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সমাজ-বিপ্লবীগণের ভাবধারার বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করে তাঁকে তাঁদের সমগোষ্ঠীতে স্থান নির্দেশ করতে ইচ্ছুক। তাঁর মতে বিবেকানন্দ মার্কসের ভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন এবং শ্রমিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। মোটের উপর ডাঃ দত্তের মতে বিবেকানন্দের স্থান Christian Socialistদের মধ্যে মোটেই নয়, তাঁর স্থান মার্কসপন্থী সমাজতন্ত্রীদের গোষ্ঠীতে। অবশ্য ডাঃ দত্তের মতে স্বামীজী পাশ্চাত্ত্য খণ্ডে গিয়ে এই সকল সমাজতন্ত্রীদের ভাবধারায় ওতপ্রোতভাবে অবগাহন করেই তাঁদের সঙ্গে একই ভাষা ব্যবহার ক'রে সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার করেছেন। তৎসত্ত্বেও, ডাঃ দত্ত স্বামীজীকে আরও একটু গৌরবের অধিকারী বলে মনে করেছেন। কারণ, যখন রাশিয়াতেও বলশেভিক দলের সৃষ্টি হয়নি, তখনই স্বামীজী স্থির জেনেছিলেন যে, পরবর্তী সমাজ-বিপ্লব ঘটবে রাশিয়া কিংবা চীনদেশে।

সুদূর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী তাঁর মার্কিন শিষ্যা সিস্টার ক্রিস্টীনকে বলেছিলেন ঃ "The next upheaval that is to usher in another era, will come from Russia or China. I cannot see clearly which, but it will be either the one or the other. Again, the world is in the third epoch under the domination of Vaisya (the merchant). The fourth epoch will be under that of the Sudra ( the proletariat )"[১]—এই উক্তি হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, রাশিয়া ও চীনে মহাবিপ্লবের সম্ভাবনা তিনি অভ্রান্তরূপে জানতে পেরেছিলেন। ডাঃ দত্ত স্বামীজীর এই উক্তি উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে, একথা স্বামীজী বলেছেন যখন লেনিন শ্রমিক একনায়কত্বের স্বপ্ন দেখতেও সুরু করেননি। ডাঃ দত্তের কাছে অতীব বিস্ময়কর বলে বোধ হয়েছে তাঁর অগ্রজের এই সুদূর প্রসারিত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। তিনি বলছেন, "And this prophesy was made long before Lenin perhaps had the idea of

১। Memoirs—Sister Christine (quoted by R. Rollnd in 'Life of Swami Vivekananda').

establishing a proletarian classless state in Russia or before Mao Tse Tung was born"—স্বামীজী যখন এ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তখন বর্তমান চীনের বিপ্লব-সংগঠয়িতা মাও-সে-তুঙ সম্ভবত জন্মানই নি।

ডাঃ দত্তের মতে স্বামীজী ভারতেও এই প্রকার সমাজ-বিপ্লব কামনা করেছিলেন—"Swami Vivekananda wanted the reformation of the Indian Society root and branch" (P. II)। ডাঃ দত্তের মতে এই আমূল পরিবর্তন বিপ্লব ছাড়া আর কি বোঝায়? স্বামীজী স্পষ্ট করেই তো বলেছেন: "Yet a time will come, when there will be the rising of the Sudra-class with their Sudra-hood; it will gain absolute supremacy in society।"[১] এ সকল উধৃতি উদ্ধার করে ডাঃ দত্ত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, স্বামীজী পাশ্চাত্ত্যের সমাজতন্ত্র-বাদীদের অনুরূপ সমাজ-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন। ডাঃ দত্ত অবশ্য বিবেকানন্দ সম্পর্কে ঠিক 'মার্কস্‌বাদী' বিশেষণটি ব্যবহার করেন নি, বলেছেন বিবেকানন্দ যাঁদের সমগোত্র তাঁরা হলেন, "Social revolutionaries of the West", কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের এই "Social revolutionaries" বলতে বোঝায় Anarchist, Socialist এবং Communistদের এবং এঁরা সকলেই কমবেশী মার্কস্‌পন্থী। অতএব, ডাঃ দত্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে স্বামীজী এঁদের সমগোত্র মার্কস্‌পন্থী। এজন্য যে সকল মার্কস্‌পন্থী স্বামী বিবেকানন্দকে 'প্রতিক্রিয়াপন্থী' ব'লে অভিহিত করেছেন, ডাঃ দত্ত তাঁদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই সকল সমাজতন্ত্রবাদীগণ অতিমাত্রায় বামপন্থী বিপ্লববাদী। 'মার্কস্‌বাদী' সাময়িকপত্রে[২] কয়েক বৎসর পূর্বে 'স্বামী বিবেকানন্দের মত ও পথ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে এঁদের মত সুন্দরভাবে ব্যক্ত

---

১। 'Modern India'—Swami Vivekananda

২। 'মার্কস্‌বাদী'—সম্ভবতঃ ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত কোন সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি আমি নিজে পড়েছি—লেখিকা।

করা হয়েছিল। এঁদের মতে : ধর্ম একটি মধ্যযুগীয় কুসংস্কারমাত্র, যা অত্যাচার ও শোষণের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতে ইংরাজী শিক্ষার আদিযুগে নাস্তিকতা খুব প্রসার লাভ করেছিল ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, তখনই মধ্যযুগীয় কুসংস্কার হ'তে মুক্ত হ'য়ে ভারত অগ্রগতির পথে পদক্ষেপ করেছিল। এই নাস্তিকতা দূরীকরণের প্রয়াস প্রতিক্রিয়া আন্দোলন ছাড়া আর কি হ'তে পারে (এঁদের পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী)? এই প্রতিক্রিয়া আন্দোলনের তিনজন পুরোহিত : বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। এই তিনজনের প্রভাবে ভারত পশ্চাদপসরণ (অর্থাৎ ধর্মের আদর্শের দিকে) করেছে। অতএব এই তিনজন ব্যক্তি 'Counter-revolutionaries'—প্রগতির শত্রু।

ডাঃ দত্ত এঁদের মতকে খণ্ডন করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত বিবেকানন্দ ধর্মবিশ্বাসের দিক হ'তে যাই হোন না কেন, সমাজ-ক্ষেত্রে বিবেকানন্দও একজন প্রকৃত:বিপ্লবপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী। এবং তিনি প্রগতিশীল, কোন মতেই প্রতিক্রিয়াশীল বা 'Counter-revolutionary' নন। কারণ মার্কসীয় পন্থা বা কার্যক্রমের তিনিই বিপ্লবী-গোষ্ঠীর মধ্যে পুরোগামী প্রবক্তা।

এখানে স্বামীজীর ধর্মবিশ্বাস আর তাঁর সমাজচিন্তা নিয়ে ডাঃ দত্ত নিদারুণ সমস্যার মধ্যে পতিত হয়েছেন। এমন একজন বিপ্লবী, তিনিই আবার একজন একান্তভাবে ধর্মবিশ্বাসী! ডাঃ দত্তের মতে এ এক সামঞ্জস্যহীন বিপরীতের অবস্থানকে প্রকট করছে। এ বৈপরীত্যের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য-সূত্র তিনি দেখতে পাননি। সেইজন্য তাঁর মতে বিবেকানন্দ হ'লেন এক জটীল-চরিত্র—"he was a complex character"।

ডাঃ দত্তের এই বিভ্রান্তির কারণ তাঁর পূর্বপোষিত ধর্ম সম্বন্ধে অভিমত। তিনি "Historical Materialism"এ আস্থাবান ; তিনি বলেছেন, "Truly, the German philosopher Feuerbach while discussing about Chrisr has come to the

notable conclusion that religion represents the inverted picture and imaginary satisfaction of the real interests of man।" এই মত যিনি পোষণ করেন তিনি মার্কস্‌গোষ্ঠীর জড়বাদী। ফয়ারবাক্ মার্কসের গুরু। এঁদের মতে ধর্ম কাল্পনিক ও অসত্য বস্তু, মানুষের অপূর্ণ বাসনার কাল্পনিক পরিপূরণ মাত্র। এই জন্য ডাঃ দত্ত ভারতীয় সভ্যতাকে যাঁরা আধ্যাত্মিক সভ্যতা বলে মনে করেন, তাঁদের "nothing but religious maniacs" ব'লে অভিহিত করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডাঃ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজ-চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে চেয়েছেন। ফলে আমরা যে অভিমত পেলাম তাতে চমৎকৃত হ'তে হয়। ডাঃ দত্তের মতে স্বামীজী যখন অল্পবয়স্ক অপরিণত-বুদ্ধি কিশোর মাত্র, তখন তিনি মধ্যযুগীয় ভাবধারার প্রতিনিধি রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে তাঁর মত গ্রহণ করেছিলেন [১] কারণ সেই বিদেশী শাসনের যুগে অতীত গৌরবের দিকে ফিরে চাওয়া একজন স্বদেশ-প্রেমিকের পক্ষে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। ডাঃ দত্তের মত শ্রীঅরবিন্দও এই কারণে বিপ্লবী থেকে যোগীতে পরিণত হয়েছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধীর মধ্যেও এই প্রভাব দৃষ্ট হয়। তখন কৃষি-নির্ভর সমাজ ভেঙে পড়ছে, শিল্প-নির্ভর সমাজ আসছে। এ অবস্থায় এইরূপ বিপরীত ভাব আবির্ভূত হ'তে বাধ্য—'interpenetration of dialectical opposites is sure to take place"। এই সময়ে যাঁরা জন্মেছিলেন তাঁদের প্রত্যেক্যের মধ্যেই এই বৈপরীত্য মূর্ত হয়েছে এবং "They have complexes as they were born and brought up in the midst of transition (P 261)". অতএব ডাঃ দত্তের মতে স্বামীজীর মধ্যেও তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও সন্ন্যাস-গ্রহণ ইত্যাদি আচরণের সঙ্গে তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের বৈপরীত্য ছিল। এবং ডাঃ দত্ত দুঃখ প্রকাশ করেছেন এজন্য যে, "strange it is,

১। "Now the question is ; did he accept the medieval ideology and its institutions ? In our perusal of his works we find that he did." (Patriot-Prophet of India—P. 260-61)

that the fact of Historical Materialism is persistently ignored by our scholars (P. 259 ".

বিবেকানন্দের সন্ন্যাসের আদর্শের সম্পর্কে ডাঃ দত্তের অভিমত এই যে, "it is nauseating to hear extolling monasticism and denouncing household life in modern time।" তবে এই সকল মধ্যযুগীয় ধারণা সত্ত্বেও স্বামীজী যে প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করেছিলেন, তার কারণ তাঁর উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। ডাঃ দত্তের এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা "the two trips in the West made him shed his notions of Indian mediaevallism and mysticism ( P. 273-274) !"

অবশ্য দেখা যাচ্ছে ডাঃ দত্তের মতে বিবেকানন্দ মিস্টিসিজম ও মধ্যযুগীয় ভাবধারা ধর্ম—পরিত্যাগ করলেও ( ? ), দিব্যদৃষ্টির ক্ষমতা তাঁকে পরিত্যাগ করেনি। ডাঃ দত্তের মতে খানিকটা দিব্যদৃষ্টি সহায়ে ( 'prophetic vision' ) ১৯০৫ খৃঃ-এর পূর্বে লেনিন যে ধারণা পাননি, উলিয়ানভ প্লেখানভ কল্পনাও করতে পারেন নি, সেই শূদ্রশাসিত সমাজের ধারণা স্বামীজী সুদূর ১৮৯৬ খৃঃ দিয়েছেন—"Swami Vivekananda was neither a Marxist nor an economist. But with his prophetic instinct he adumbrated the stage which will bring the resurrection of the Indian people—a casteless and classless society based on the new culture of the Indian masses।"

অর্থাৎ স্বামীজীর মতের পেছনে যে কোনও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও যুক্তি আছে, তা ঠিক ডাঃ দত্তও মনে করেন না। স্বামীজী মার্কস্‌বাদী নন, অর্থনীতিবিদ্‌ও নন, কি ক'রে আর তিনি বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করবেন! তার উপর আবার ধর্মবিশ্বাসের কুসংস্কার তাঁর মধ্যে রয়েছে? ডাঃ দত্তের মতে তবুও তাঁর মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্রষ্টার সহজাত জ্ঞান ছিল ( 'prophetic instinct' ) ছিল, যার সাহায্যে তিনি প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দেখা যাচ্ছে ডাঃ দত্ত জড়বাদে বিশ্বাসী হয়ে 'ভবিষ্যৎ দৃষ্টি'র মত অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন।

সুতরাং, সুস্পষ্ট রূপেই বোঝা যাচ্ছে যে, পূর্বপোষিত ধারণা সহায়ে অগ্রসর হওয়ার ফলে ডাঃ দত্ত তাঁর আলোচ্য বিষয়ে সত্য নির্ণয় করতে পারেন নি। তা' শুধু নয় সমস্যাটি তাঁর সম্মুখে এমন জটিল আকার ধারণ করেছে যে, স্থানে স্থানে সত্যের অপলাপও তাঁর দ্বারা ঘটেছে। দুইবার পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের শেষে ১৯০০ খৃঃ স্বামীজী তাঁর একজন পাশ্চাত্য সুহৃদ্‌কে লিখছেন, "My boat is nearing the calm harbour from which it is never more to be driven out. Glory, glory unto Mother! I have no wish, no ambition now. Blessed be Mother! I am the servant of Ramakrishna. I am merely a machine. I know nothing else. Nor do I want to know. Glory, glory unto Sri Guru।" সত্য কথা এই যে দুইবার পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ শেষেও স্বামীজী বলেছেন, "জগদম্বার জয় হোক, আমি শ্রীরামকৃষ্ণের দাস ভিন্ন কিছুই নই"। অথচ ডাঃ দত্ত বলছেন, "the two trips in the West made him shed his notions of Indian mediaealism and mysticism"! সত্যের অপলাপ আর কাকে বলে? এ প্রসঙ্গে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

দেখা যাচ্ছে—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত উভয়েই একমত যে বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এবং তাঁদের উভয়ের অভিমত যে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসেই তিনি এই মতবাদ লাভ করেন। তৃতীয়তঃ, তাঁর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর সমাজ-দর্শনের যে কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে তা তাঁরা স্বীকার করেন না। তবে ডাঃ দত্তের মতে বিবেকানন্দ মার্কস্‌গোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রী, আর অধ্যাপক সরকারের মতে বিবেকানন্দ 'Christian Socialist'দের গোষ্ঠীভুক্ত। কিন্তু, এঁরা এক বিষয়ে একেবারে একমত যে বিবেকানন্দ যে গোষ্ঠীভুক্তই হোন না কেন,

প্রথম ভারতীয় সমাজতন্ত্রী। ডাঃ দত্তের মতে বিবেকানন্দ কোন কোন বিষয়ে এমন কি লেনিন-প্লেখানভ প্রভৃতিরও পুরোগামী; এবং তিনি প্রতিক্রিয়াশীল মোটেই নন, সম্পূর্ণ প্রগতিশীল। তা ছাড়া, ডাঃ দত্ত ও অধ্যাপক সরকার, এ দু'জনেই সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দকে আগামী যুগের অধিনায়ক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বর্তমান যুগ সমাজতন্ত্রবাদের যুগ, এই মতবাদের প্রাধান্য আজ পৃথিবীর সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ একজন সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন—এ এক চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার। এবং নিশ্চিতই একদিন যেমন তাঁর প্রচারিত জাতীয়তাবাদ দেশবাসীকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আজও তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের অগ্নিময়ী বাণী সমাজ-সংগঠনে সকলকে প্রেরণা দেবে। সেইজন্য আজ তাঁর সমাজ-তন্ত্রবাদের যথার্থ পরিচয় গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। ডাঃ দত্ত ও অধ্যাপক সরকারের আলোচনা যথেষ্ট ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে, বিশেষ ক'রে যুব সম্প্রদায়ের মনে, তা তাদের সংস্পর্শে এলেই আমরা বুঝতে পারি। তাদের সর্বাপেক্ষা বিচলিত করেছে স্বামীজীর নিজেকে 'সমাজতন্ত্রী' ব'লে ঘোষণা। এইজন্য বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে আলোচনা আজ অত্যন্ত গুরুত্ব অর্জন করেছে।

কিন্তু, দুঃখের বিষয় পূর্বোক্ত দু'জন মনীষীর বিশ্লেষণে অনেক ফাঁক আছে, এবং তাঁরা বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের যথার্থ রূপটি ধারণা করতে পারেন নি। তাঁরা যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি আমরা বিচারে গ্রহণীয় বলে মনে করি না। প্রথমতঃ, বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই—এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বিবেকানন্দ একটি সুসম্বদ্ধ সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম দিয়েছেন যার ভিত্তি উপলব্ধ প্রত্যক্ষ সত্য ও ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ পদ্ধতি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর ধর্মদর্শনের সঙ্গে তাঁর এই সমাজতন্ত্রবাদের কোন বৈপরীত্য নেই, যদিও এঁরা তা প্রদর্শন করতে বিশেষ প্রযত্ন

করেছেন। তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি ধর্ম ও অধ্যাত্মদর্শন, কার্ল মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি যেমন বস্তুবাদ। মার্কস্ ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন ("Materialistic Interpretation of History"), বিবেকানন্দ তেমন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ("Spiritualistic Interpretation of History") দিয়েছেন। তৃতীয়তঃ, বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ খ্রীষ্টিয় সমাজতন্ত্রবাদের গোষ্ঠীভুক্তও নয়, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের সমগোত্রও নয়। এ একটি সম্পূর্ণ মৌলিক সমাজতন্ত্রবাদ, যার গোত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শন-চিন্তা থেকেই তার জন্ম, যদিও তার বিস্তার ঘটেছে ইতিহাস এবং বিজ্ঞানসমূহের সহায়ে।

# পঞ্চম অধ্যায়

## ফয়ারবাক-মার্ক্স্ এর দৃষ্টিতে ধর্ম ও বিবেকানন্দের ধর্মবিজ্ঞান

"Religion is the manifestation of divinity in man"
—Swami Vivekananda

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দের ধর্মাচরণ আধুনিক সমাজ-শাস্ত্রবিদের চক্ষে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ব'লে মনে হয়েছে। সেইজন্য, বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের আলোচনায় আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমাদের অনুসন্ধান ক'রে দেখা প্রয়োজন যে, তাঁর এই আচরিত ধর্মটি কি এবং তার সঙ্গে তাঁর সমাজদর্শনের প্রকৃত সম্বন্ধ কিরূপ। বিবেকানন্দ-চরিত্রকে এঁরা যেরূপ প্রহেলিকাময় ও জটিল ক'রে তুলেছেন, তাতে জনমনে অনেক মিথ্যা ধারণা অনুপ্রবেশ করেছে। এই কারণে অন্যত্র এ বিষয়ে প্রসঙ্গত আলোচনা থাকলেও আরও বিশদ আলোচনার এখানে একান্ত প্রয়োজন আছে।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মার্কসের গুরু ফয়ারবাকের ধর্ম সম্বন্ধে যে অভিমত পেয়েছি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকে তা হ'ল—"religious ideas are the inverted reflections of the mundane world of the time"। এ মত ইতিহাস অসিদ্ধ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যুগে যুগে 'mundane world'এ কত পরিবর্তন, তবুও অধ্যাত্ম ধারণাসকল (অদ্বৈতবাদ) সেই সুদূর স্মরণাতীতকাল হ'তে[১] যেখানে ইতিহাসও প্রবেশ করতে সাহস পায় না, আজপর্যন্ত একই প্রকার আছে। কৃষি-সমাজের পত্তনকালে ঋগ্বেদে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এ তত্ত্বই পরবর্তী সামন্ততান্ত্রিক ও সওদাগরী সমাজেও সত্য ব'লে বিবেচিত হয়েছিল,

১। অর্থাৎ প্রাগবিভক্ত সমাজেও

আবার আজকের এই শিল্প-নির্ভর, উন্নত নগর সভ্যতার সমাজেও আমরা একই কথা শুনছি—"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।" অবশ্যই, এ সকল ধারণা ভারতের একচেটিয়া নয়। সারা পৃথিবীতে নানাযুগে আমরা এই সকল ধারণা সমভাবে দেখি। এবং আধুনিক যুগেও আমরা সকল দেশে এই ধারণার আধিপত্য দেখছি। আমেরিকাতে কবি Walt Whitman[১] এবং দার্শনিক-লেখক Aldous Huxley, Christopher Isherwood এর মধ্যে দেখছি; ভারতে সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দার্শনিক চিন্তায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখি, এমন কি সোভিয়েট রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত লেখক Boris Pasternak-এ দেখি।[২] অতএব এ হ'ল মানুষের শাশ্বত ভাবনা। এ ধারণা যেমন আদিম পশুচারক সমাজে দৃষ্ট হয়,

১। Romain Rolland—Life of Vivekananda

২। Pasternack-এর একটি কবিতায় অদ্বৈতভাবনার সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে। কবিতাটির নাম 'Daybreak'। কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উধৃত করছি—

"All round are lights. homeliness, people getting up,
Drinking tea, hurrying to the trains,
In the space of several minutes
The town is unrecognisable."

"The blizard weaves a net
Of thickly falling snow across the gate,
They all hurry out to be in time,
Leaving their food half eaten, their tea unfinished."

"I feel for each of them
As I were in their skin,
I melt with the melting snow,
I frown with the morning."

"In me are peoples without names,
Children, stay-at-homes. trees
I am conquered by them all
And this is my only victory."



উধৃত অংশটির তৃতীয় চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে সুস্পষ্ট লেখকের বিশ্বচেতনার সঙ্গে সংযোগ ও তার বিশ্বানুভূতি যার ফলে চেতন অচেতন সকল পদার্থ—গাছপালা, তুষার, কীটপতঙ্গ, ক্রীড়ার, শিশু ও গৃহে আবদ্ধ বৃদ্ধ অশক্ত, কর্মবদ্ধ—সারা বিশ্বের নাম না জানা সকল মানুষকে—নিজের মধ্যে দেখছেন।

এই কবিতাটি Poems of Dr. Zivago নামে Dr. Zivago গ্রন্থের অন্তে সন্নিবেশিত কবিতাবলীতে আছে।

# পঞ্চম অধ্যায়

## ফয়ারবাক-মার্কস্ এর
## দৃষ্টিতে ধর্ম
## ও
## বিবেকানন্দের ধর্মবিজ্ঞান

"Religion is the manifestation of divinity in man"
—Swami Vivekananda

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি যে, সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দের ধর্মাচরণ আধুনিক সমাজ-শাস্ত্রবিদের চক্ষে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ব'লে মনে হয়েছে। সেইজন্য, বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের আলোচনায় আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমাদের অনুসন্ধান ক'রে দেখা প্রয়োজন যে, তাঁর এই আচরিত ধর্মটি কি এবং তার সঙ্গে তাঁর সমাজদর্শনের প্রকৃত সম্বন্ধ কিরূপ। বিবেকানন্দ-চরিত্রকে এঁরা যেরূপ প্রহেলিকাময় ও জটিল ক'রে তুলেছেন, তাতে জনমনে অনেক মিথ্যা ধারণা অনুপ্রবেশ করেছে। এই কারণে অন্যত্র এ বিষয়ে প্রসঙ্গত আলোচনা থাকলেও আরও বিশদ আলোচনার এখানে একান্ত প্রয়োজন আছে।

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে মার্কসের গুরু ফয়ারবাকের ধর্ম সম্বন্ধে যে অভিমত পেয়েছি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকে তা হ'ল—"religious ideas are the inverted reflections of the mundane world of the time"। এ মত ইতিহাস অসিদ্ধ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যুগে যুগে 'mundane world'এ কত পরিবর্তন, তবুও অধ্যাত্ম ধারণাসকল (অদ্বৈতবাদ) সেই সুদূর স্মরণাতীতকাল হ'তে[১] যেখানে ইতিহাসও প্রবেশ করতে সাহস পায় না, আজপর্যন্ত একই প্রকার আছে। কৃষি-সমাজের পত্তনকালে ঋগ্বেদে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এ তত্ত্বই পরবর্তী সামন্ততান্ত্রিক ও সওদাগরী সমাজেও সত্য ব'লে বিবেচিত হয়েছিল,

১। অর্থাৎ প্রাগবিভক্ত সমাজেও

আবার আজকের এই শিল্প-নির্ভর, উন্নত নগর সভ্যতার সমাজেও আমরা একই কথা শুনছি—"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়।" অবশ্যই, এ সকল ধারণা ভারতের একচেটিয়া নয়। সারা পৃথিবীতে নানাযুগে আমরা এই সকল ধারণা সমভাবে দেখি। এবং আধুনিক যুগেও আমরা সকল দেশে এই ধারণার আধিপত্য দেখছি। আমেরিকাতে কবি Walt Whitman[১] এবং দার্শনিক-লেখক Aldous Huxley, Christopher Isherwood এর মধ্যে দেখছি; ভারতে সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দার্শনিক চিন্তায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দেখি, এমন কি সোভিয়েট রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত লেখক Boris Pasternak-এ দেখি।[২] অতএব এ হ'ল মানুষের শাশ্বত ভাবনা। এ ধারণা যেমন আদিম পশুচারক সমাজে দৃষ্ট হয়,

১। Romain Rolland—Life of Vivekananda

২। Pasternack-এর একটি কবিতায় অদ্বৈতভাবনার সুস্পষ্ট আভাস রয়েছে। কবিতাটির নাম 'Daybreak'। কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উধৃত করছি—

"All round are lights. homeliness, people getting up,
Drinking tea, hurrying to the trains,
In the space of several minutes
The town is unrecognisable."

"The blizard weaves a net
Of thickly falling snow across the gate,
They all hurry out to be in time,
Leaving their food half eaten, their tea unfinished."

"I feel for each of them
As I were in their skin,
I melt with the melting snow,
I frown with the morning."

"In me are peoples without names,
Children, stay-at-homes. trees
I am conquered by them all
And this is my only victory."

উধৃত অংশটির তৃতীয় চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে সুস্পষ্ট লেখকের বিশ্বচেতনার সঙ্গে সংযোগ ও তার বিশ্বানুভূতি যার ফলে চেতন অচেতন সকল পদার্থ—গাছপালা, তুষার, কীটপতঙ্গ, ক্রীড়ার, শিশু ও গৃহে আবদ্ধ বৃদ্ধ অশক্ত, কর্মবদ্ধ—সারা বিশ্বের নাম না জানা সকল মানুষকে—নিজের মধ্যে দেখছেন।

এই কবিতাটি Poems of Dr. Zivago নামে Dr. Zivago গ্রন্থের অন্তে সন্নিবেশিত কবিতাবলীতে আছে।

তেমনি কৃষি-সমাজে ধনিক-সমাজে, প্রাক্‌বিভক্ত, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সকল স্তরে এবং শ্রেণীবিহীন শ্রমিক সমাজেও দেখা যায়। মানব জীবনের শাশ্বত সত্য এর মধ্য বিধৃত বলেই সর্বকালে এ ভাবনার অবস্থান আমরা দেখতে পাই। অতএব কিরূপে ধর্মকে—"reflections of the mundane world of the time" বলা যায়?

ডাঃ দত্ত এ মত মার্কস্‌বাদকে অনুসরণ করেই গঠন করেছেন এবং গঠনকালে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের 'ধর্মবিজ্ঞান' সম্বন্ধীয় যুক্তিগুলির কোনটিরই খণ্ডন না করেই করেছেন। স্বামীজী তাঁর 'ধর্মবিজ্ঞান' শীর্ষক বক্তৃতামালায় ধর্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তি এবং তার বিভিন্ন দিক ও বিচিত্র প্রকাশ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, ধর্ম কোন কুসংস্কার নয়, তা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, মানব মনে তার স্ফুরণ স্বভাববশতঃ হয়। আমরা প্রসঙ্গতঃ ইতিপূর্ব্বে দেখেছি[১] ধর্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃতি উপাসনা ও মৃতের উপাসনা ও স্বপ্ন-দর্শন—ধর্মের সূচনা সম্বন্ধে পুরাতাত্ত্বিকদের এই তিন প্রচলিত মত বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষের ধর্মচেতনার উৎপত্তি ভয় হ'তে নয়, তার উৎপত্তি বরঞ্চ মানুষের এক স্বাভাবিক বৃত্তি—দুর্নিবার প্রকৃতি-জয়ের বাসনা হ'তে। মানুষ প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা মেনে নেয় নি, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক কোনও প্রকার বিপর্যয়ের নিকট হার স্বীকার করে নি। প্রকৃতির সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতেই সে একদিন প্রকৃতির অন্তরালে অবস্থিত সত্যের সম্মুখীন হয়েছে, ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম ক'রে অপরোক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে। তারই প্রথম বিকাশ আমরা দেখি বৈদিক প্রকৃতি-উপাসকদের মধ্যে, দেখি প্রাচীন মিশরীয় মমী-রক্ষকদের মধ্যে। প্রকৃতির বিচিত্র শোভা, দিবারাত্রির অনিবার্য সন্নিধান, জন্মমৃত্যুর অমোঘ বিধান—এ সকল দেখে বিস্ময়াহত আদিম মানুষ প্রশ্ন করেছে এসব কি করে

১। প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হ'ল ? প্রথম বিস্ময়ের দ্যোতনা দেবতায় মূর্ত হয়ে উঠল—তার মুগ্ধতা রূপ নিল ঋক ছন্দে—বরুণ-ইন্দ্র-চন্দ্র-অগ্নি বায়ু-যম-সাবিত্রী-রুদ্র-বিষ্ণুরূপের কল্পনায় ও স্তুতিতে। ক্রমে বুদ্ধি-প্রগতি চেতনার সুপ্তি থেকে তার আত্মার জাগরণ ঘটালো, সে দেখল প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের অন্তরালে আছেন এক পরমদেবতা, জীবন ও বল যথায় বিচ্ছুরিত, অমরত্ব ও মৃত্যু যার ছায়া, সৃষ্টির পদ্ম যার নয়নকোরক সম্পাতে বিকশিত। অপরদিকে প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, চীন এবং আমেরিকায় মৃতের উপাসনার মধ্যে ধর্মের প্রাথমিক সূচনা দেখা যায়। বিবেকানন্দ বলছেন—"These two views, though they seem to be contradictory, can be reconciled on a third basis, which to my mind is the real germ of religion and that I propose to call the struggle to transcend the limitations of the senses।"[১] দু'টি বিপরীত পুরাতাত্ত্বিক মতের অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত সমার্থতা আবিষ্কার করেছেন বিবেকানন্দ। মানুষ মৃতেরই উপাসনা করুক আর প্রকৃতিরই উপাসনা করুক এ উভয়ের মধ্যে তার প্রকৃতি জয়ের উৎকট বাসনাই প্রকাশ লাভ করেছে। মৃত্যুকে জয় করবার একান্ত ইচ্ছা হতে প্রাচীন মিশরীয়দের মৃতদেহ সংরক্ষণের বহু আয়াস-সাধ্য বিচিত্র উপায় সকল আবিষ্কৃত হয়েছিল সন্দেহ নাই, আর তেমনি প্রকৃতির বিভিন্ন শাখার অধিপতিদের প্রসন্নতা লাভে মানুষ কেন আগ্রহ দেখিয়েছিল ? না, আকাশ-বায়ু-জল প্রভৃতি অনায়াত্ত শক্তির উপর সে চেয়েছে আপন আধিপত্য। ইন্দ্রের বরলাভ করে রাবণ-পুত্র মেঘনাদ আকাশজয়ী হয়েছিল। অতএব "Either man goes to seek for the spirits of his ancestors, the spirits of the dead, that is he wants to get a glimpse of what there is after the body is dissolved or he desires to understand the power working behind

১। The Necessity of Religion.—Complete Works of Swami Vivekananda. P. 59

the stupendous phenomenon of nature. Whichever of these is the case, one thing is certain, that he tries to transcend the limitations of the senses. He cannot remain satisfied with his senses ; he wants to go beyond them।"[১] জীবন ও মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনে মানুষের এই যে প্রয়াস, প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা, ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করবার জন্য এই যে অকুতোভয় আয়াস, তাই মানুষের ধর্ম। ধর্ম হ'ল ইন্দ্রিয়াতীত সত্যানুসন্ধান প্রয়াস। বৈজ্ঞানিক উপায়ে অগ্রসর হ'লেই সেখানে পৌঁছনো যায়। ধর্মবিজ্ঞান সেই বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলি নির্দেশ করেছে। তদনুযায়ী মন, বুদ্ধি চিত্তের উর্ধ্বে ধাপে ধাপে এগিয়ে 'বোধি'তে উপনীত হলে অতীন্দ্রিয় সত্যবস্তু প্রত্যক্ষগোচর হয়। গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক যেমন সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে অনুমিত ফল নিশ্চয় প্রাপ্ত হন, তেমনি এই সকল সূত্র অনুসরণ করে ধর্মপথিক লক্ষ্যে অর্থাৎ সত্যজ্ঞানে উপনীত হন। ধর্ম এই অর্থে একটি ফলিত-বিজ্ঞান (practical science) ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সম্পর্কে প্রভূত আলোকপাত করে বিবেকানন্দ বলছেন, "Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divine within, by controlling nature, external and internal. Do this either by work, or worship, or psychic control or philosophy, by one, or more or all of these।" ধর্মতত্ত্ব নির্দেশ দেয়—আত্মা মাত্রই অব্যক্ত ব্রহ্ম। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞানচর্চা, শমদমাদি অনুশীলন, শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন, ধ্যান-সমাধি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করে এই আত্মোপলব্ধিতে পৌঁছানো যায়। বিবেকানন্দ বলছেন, এই বাস্তব অনুশীলনই ধর্ম, "ধর্মের পূর্ণাঙ্গ"। তাঁর কথা হ'ল "Religion is not in doctrines and dogmas, nor in intellectual argumentation ; it is being and becoming ; it is realisation।"

১। 'The Necessity of Religion'—Swami Vivekananda.

তা শুধু নয় বিবেকানন্দের বস্তুনিষ্ঠা আরও অধিক বাস্তবতার পথে তাঁকে নিয়ে গিয়েছে। তিনি মনে করতেন—"If there is a God we must see Him, if there is a soul we must perceive it ; otherwise it is better not to believe. It is better to be an outspoken atheist than a hypocrite।" পৃথিবীর যাবতীয় অবিশ্বাসীদের চ্যালেঞ্জ করে বিবেকানন্দ বলছেন "Religion can be realised. Are you ready ? Do you want it ? You will get the realisation if you do, and then you will be truly religious. Until you have attained realisation there is no difference between you and the atheists" —ধর্ম অনুভব করা যায়, কে অনুভব করতে প্রস্তুত আছো ? অনুভূতিহীন ধর্ম হয় না।

ফয়ারবাক খ্রীষ্ট ধর্মকে সমালোচনা করেছিলেন তার অবৈজ্ঞানিকত্বের দরুন। তিনি তাঁর 'The Essence of Christianity' গ্রন্থের শেষে এই অভিমত দেন, "Christian god is only a fantastic reflexion, a mirror-image of man।" ফয়ারবাক্-এর এ সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিপূর্ণ যে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু, এ কথা ঠিক সে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ খ্রীষ্ট ধর্মকে বা অন্য কোন ধর্মমতকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন নি। এই অবৈজ্ঞানিকত্ব ফয়ারবাকের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মূল কারণ। আর ফয়ারবাক্ হলেন মার্কসের দার্শনিক গুরু। শূন্য হ'তে সৃষ্টি, সৃষ্ট আত্মা, স্বর্গ নামক স্থানে সিংহাসনে উপবিষ্ট অত্যাচারী ঈশ্বর, অনন্ত নরকাগ্নি, অকারণ পাপকুণ্ডে নিমগ্ন মানুষ—এই সকল খ্রীষ্ট ধর্মীয় অবৈজ্ঞানিক ধারণা সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরই সে সময় বিরক্তি উৎপাদন করেছিল। বস্তুতঃ আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মের উপর যেরূপ পুনঃ পুনঃ তীব্র আক্রমণ করেছে তার সঙ্গে সামসঞ্জস্য স্থাপন করতে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রবক্তাগণ কোন চেষ্টা করেন নি। এই কারণে ফয়ারবাক সিদ্ধান্ত করেছেন "that which is immediately self-

evident is true and divine."......"The new philosophy makes man including nature as his basis, the highest and sole subject of philosophy and consequently anthropology the universal science"। এবং যেহেতু "in bidding us believe in miracles dogma is a prohibition to think", সেই হেতু ফয়ারবাক যথার্থই মনে করেছেন, "Hence the philosopher is not to justify it (religion), but to uncover the illusion to which it owes its origin।"[১] সেইজন্য ফয়ারবাকের অভিমত হ'ল এই যে ধর্ম-দর্শনের একমাত্র কাজ হ'ল ধর্ম-চেতনার মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা প্রদর্শন করা—ধর্মতত্ত্বের যুক্তিগত ভিত্তি প্রদর্শন নয়। প্রচলিত ধর্মতত্ত্বের বিজ্ঞান-বিরোধিতার দরুণ হেগেলের ভাবশিষ্য ফয়ারবাক্,—যিনি ঈশ্বরতত্ব হ'তে তাঁর প্রথম আলোচনা সুরু করেছিলেন তিনি,—দর্শনের ক্ষেত্রে জড়বাদের একজন প্রধান প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ালেন। এবং শেষ পর্যন্ত এর কবলে পড়ে তিনি এমন অযৌক্তিক উক্তি সকল করেছিলেন যে Faulkenberg তাঁর সম্বন্ধে আলোচনার শেষে বলছেন—"As Feurbach, following out his naturalistic tendency, reached the extreme of materialism, the influence of his philosophy—whose different phases there is no occasion to trace out in detail—had already passed its culmination. From his later writings little more has found its way into public notice than the pun, that 'man is what he eats'।" অতএব স্বাভাবিক যে ফয়ারবাক্ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে আদিম যুগের মানুষের মৃত্যুভয়ভীত মনের প্রকাশ মাত্র বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিন্তু, আমরা দেখলাম স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর "Necessity of Religion" শীর্ষক বক্তৃতায় এই মতকে খণ্ডন করেছেন। বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত—ধর্ম জীবন-মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে

১। Faulkenberg—'History of Philosophy' গ্রন্থে ফয়ারবাক সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের প্রয়াস,—পুরাতাত্বিক মৃতের উপাসনা ও প্রকৃতি উপাসনা তত্ত্ব তাই ইঙ্গিত করছে। আজ পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক বস্তুবাদী (Historical Materialist) বিবেকানন্দের এ মত খণ্ডন করবার প্রয়াস করেন নি। তাঁদের যুক্তির ভিত্তি আজও ফয়ারবাক ও মর্গানের আলোচনা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখেছি বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে ধর্ম মানুষের এক স্বাভাবিক প্রবণতা। মানব-মনের নিজস্ব তাগিদ হ'ল তার দেবসত্তাকে জানা। এই তাগিদই হ'ল ধর্ম। ধর্ম আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি নয়, এগুলি ধর্মের আঙ্গিকমাত্র—"Doctrines or dogmas, or rituals or books, or temples or forms, are but secondary details।" তা শুধু নয়, স্বামীজী মনে করতেন—"A man may believe in all the churches in the world, he may carry in his head all the sacred books ever written, he may baptise himself in all the rivers of the earth, still if he has no perception of God, I would class him with the rankest atheist"—পৃথিবীর সব মন্দিরে দেবালয়ে ঘুরলেও, হুনিয়ার ধর্মশাস্ত্র গোগ্রাসে গিললেও, যাবতীয় পবিত্র নদীর জলধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দিলেও আত্মোপলব্ধি ব্যতীত মানুষ নাস্তিক ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং বিবেকানন্দের মূলকথা "Religion is the manifestation of the divinty already in man"—প্রকৃত ধর্ম হ'ল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ, আর কিছুই নয়। এ ধর্ম একটা বিশ্বাসমাত্র নয়, 'dogma' নয় যা চিন্তার স্বাধীনতাকে ব্যহত করে, 'theory' নয়। অসম্ভব অবাস্তব পুরাকাহিনীতে বিশ্বাস করতে এ ধর্ম বলছে না। এ ধর্মের মূলকথা হ'ল "being and becoming", "being divine" এবং "becoming divine"। অতএব, এ ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধিতা নেই, বরঞ্চ সামঞ্জস্য আছে। পরীক্ষা করে দেখতে আহ্বান করছে এ ধর্ম। বরঞ্চ ফয়ারবাক যা বলেছেন তা যুক্তির পরিপন্থী। ফয়ারবাকের মতে যা

দেখছি তাই প্রত্যক্ষ সত্য। 'Sensibility'ই হ'ল একমাত্র জ্ঞান সহায়। এ সকল কথা মানুষের যুক্তিকে কখনই সন্তুষ্ট করতে পারবে না। যা "immediately self-evident" তা-ই প্রত্যক্ষ সত্য কেমন করে হ'বে?—আমরা তো সৃষ্ট জগতের অন্তরালে অবস্থিত অণু পরমাণু দেখছি না, তাহ'লে সেইগুলির কি অস্তিত্ব নেই? এরূপ জ্ঞানের বহু ত্রুটি হিন্দু তর্কবিজ্ঞানীগণ প্রদর্শন করেছেন, যথা অতি দূরত্ব, অতি নৈকট্য হেতু বহু বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। অতএব 'Sensibility' একমাত্র জ্ঞানসহায় একথা অসিদ্ধ।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে ভারতীয় দর্শনে 'পরোক্ষ' জ্ঞান বলা হয়। কিন্তু পরম সত্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হ'তে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যজগতের অন্তর্ভূক্ত। তাদের দ্বারা বাহ্যজগত বহির্ভূত যে সত্তা তার জ্ঞান সম্ভব নয়। এইজন্য বেদান্ত বলে সত্য অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়।[১] অপরোক্ষ বলতে বুঝায় প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সত্যতা বিশ্বাস করি না। Eddington আমাদের দেখিয়েছেন যে এই 'direct knowledge' ব্যতীত বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রও দাঁড়াতে পারে না। সকল বিজ্ঞানের ভিত্তিই এই অপরোক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি। বিবেকানন্দ বিষয়টি সুপরিস্ফুট করেছেন একজায়গায় "আমরা স্বীকার করিয়া লই বহির্বিষয়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। সেখানে কেউ বিশ্বাস করিয়া লইতে বলে না, বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের নিয়মাবলী কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে না; প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিদগণ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন—তাহা হইতে আর কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল। ইহা একটি ঘটনা। আমরা উহা স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া রসায়নের সকল বিচার করিয়া থাকি। পদার্থবিদগণ তাহাই করিয়া থাকেন—সকল বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ। সর্বপ্রকার জ্ঞানই কতকগুলি বিষয়ের অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা যুক্তি-বিচার করিয়া থাকি। কিন্তু

১। ডাঃ রমা চৌধুরী—বেদান্ত-দর্শন।

আশ্চর্যের বিষয় অধিকাংশ লোক বর্তমান কালে ভাবিয়া থাকে ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু নাই ; যদি ধর্ম লাভ করিতে হয়, তবে বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই তাহা লাভ করিতে হইবে।…যেমন বহির্বিজ্ঞানে তেমন পরমার্থবিজ্ঞানে আমাদিগকে কতকগুলি সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, মতামত সেগুলির উপর স্থাপিত হইবে।"[১]

১। "অপরোক্ষানুভূতি"—স্বামী বিবেকানন্দ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও Super-sensory ও super-rational জ্ঞান সহায়কে স্বীকার করেন—P. A. Sorokin—"Three Basic Trends of our Time"—*Vedanta and the West*, No. 139.

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম ও প্রগতিশীলতা

"Ramakrishna has furnished the young with the tremendous psychology of breaking the fetters of society"—*Benoy Sarkar.*

বিবেকানন্দ এই 'being' and 'becoming'-এর মূর্ত প্রতীক দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে, যাঁর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ধর্ম তাঁর কাছে শুধু তত্ত্ব ছিল না, ছিল বাস্তব অনুশীলনের বস্তু, হাতে কলমে করে দেখাবার জিনিস। তরুণ বয়সে বিবেকানন্দ জীবনের মূলে নিহিত সত্যকে জানবার জন্য এক দুর্নিবার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। জন্ম ও মৃত্যুর দ্বারা খণ্ডিত কিছুক্ষণের এই জীবন, তার চারিপাশে দুর্ভেদ্য অজানার দেওয়াল তিনি কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছিলেন না। নিরন্তর একটি দুঃসহ তাড়নায় চালিত হয়ে তিনি সাগ্রহে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে দেখছিলেন এই অজানাকে জানবার উপায় কি। এ অজানা দুর্জ্ঞেয়—হার্বার্ট স্পেন্সারের এই মত তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি আদৌ, অগাস্ট কোঁতের বৈজ্ঞানিক জড়বাদ ও কাণ্টের যুক্তিবাদ তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি। এ সকল মতের মধ্যে তিনি স্পষ্টতঃ সমস্যা এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি উত্তরের জন্য তদানীন্তন ধর্মনেতাদের দ্বারস্থও হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরাও তাঁর সন্তোষ বিধান করতে পারেন নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন" এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন এড়িয়ে বলেছিলেন "তোমার চক্ষে যোগীর লক্ষণ দেখছি।" কেউই তাঁকে বলতে পারলেন না যে 'হ্যাঁ সত্যকে জেনেছি—তার স্বরূপ এই, জীবন-মৃত্যুর রহস্যের এই সমাধান।' একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি স্পষ্ট উত্তর

পেলেন 'হ্যাঁ—দেখেছি সত্য কি, তুমি যদি দেখতে চাও তোমাকেও দেখাতে পারি।' এই প্রথম বিবেকানন্দ শুনলেন যে দেখা যায়, সত্য আছেন। আগ্রহে, বিস্ময়ে, আনন্দে আর হাজার প্রশ্নের যুগপৎ অভ্যুত্থানে তাঁর চিত্তের সেদিন যে অবস্থা হয়েছিল তা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। রামকৃষ্ণ তাঁকে যেরূপ স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন, যে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভঙ্গীতে উত্তর দিয়েছিলেন, তা আজও আমাদের অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। বিবেকানন্দের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"দেখেছি কিরে, তোকে যেমন দেখছি, এর চেয়ে স্পষ্ট দেখেছি, তুই যদি দেখতে চাস তোকেও দেখাতে পারি।" এই দৃঢ় প্রত্যয় ও স্পষ্ট উত্তর 'হ্যাঁ দেখেছি', 'জানা যায়', 'প্রত্যক্ষ করিয়ে দিতে পারি'—তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলে। অল্পবয়স-জনিত অজ্ঞতাবশতঃই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করেন নি। বিবেকানন্দ তখন অল্পবয়স্ক হলেও অজ্ঞ বা অপরিণত বুদ্ধি ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসবার সময় তাঁর বয়স আঠার বৎসর। আমরা কি কল্পনা করতে পারি যে একজন আঠারো বছরের বি. এ, তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র—Herbert Spencer-এর 'First Principles', ও 'Principles of Sociology', Kant-এর 'Critique of Pure Reason', ম্যাসপেরোর মিশরীয় তত্ত্ব, Huxleyর প্রাণীতত্ত্ব, Mill-এর 'তর্কশাস্ত্র', Comteএর 'Positive Philosophy' ও Gibbonএর 'History of Rome'এর সুবিশাল জ্ঞান ও আলোচনা আয়ত্ত করেছে? পারি না বলেই আমরা এই ভ্রান্তি পোষণ করছি যে, অপরিণত বুদ্ধি বালক রামকৃষ্ণের হিপ্‌নটিক প্রভাবে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন, "আধ্যাত্মিকতার কুজ্ঝটিকায়" তিনি আবৃত হয়ে গেলেন। কিন্তু, তাঁর পরবর্তীকালের রচনা ও অপ্রস্তুত বক্তৃতা মালা সমগ্র মানব শাস্ত্রে তাঁর যে সুগভীর জ্ঞান প্রকটিত করে, তা বুঝিয়ে দেয় সমগ্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস তখন তাঁর নখদর্পণে।[১] অতএব তিনি আদৌ

---

১। 'উদ্বোধন' কর্তৃপক্ষ স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনাবলী'র প্রতি খণ্ডের অন্তে বিবেকানন্দের উল্লিখিত যে সুদীর্ঘ দর্শন ও দার্শনিক পরিচয় দিয়েছেন তা দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা সম্মোহিত হন নি। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ধর্মের বাস্তব, জীবন্ত, জ্বলন্ত রূপায়ণ দেখে তিনি তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন যে রামকৃষ্ণের ধর্ম কথা নয় 'dogma' নয়, 'faith' নয়, অনুশীলিত বস্তু, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে প্রতি-মুহূর্তে তা বাস্তব, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অঙ্গীভূত, সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ, দৈনন্দিন আচার আচরণে প্রতিভাত। তাই পরবর্তীকালে ধর্ম্ম আমাদের কি দেয় এ প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"It brings to man eternal life. It has made man what he is and will make of this human animal a god. This is what religion can do. Take religion from human society and what will remain ? Nothing but a forest of brutes।" তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই অবিনশ্বর অসীম জীবন, এই দেবত্বের জাগরণ, পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন এবং এক সীমাহীন অনন্ত আনন্দধাম্ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে সত্যবস্তুকে তিনি অনুসন্ধান করে ফিরছিলেন তার চাবিকাঠি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তবুও শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁকে দেখে মাত্র নয়, শ্রীরামকৃষ্ণকে চ্যালেঞ্জ করে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা বর্ণিত সত্যকে নিজে হাতেনাতে পরীক্ষা করে। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন "তোমাকেও দেখাতে পারি।" শ্রীরামকৃষ্ণের এ চ্যালেঞ্জ শুধু বিবেকানন্দকে নয়, তখন তাঁর মধ্যে মূর্ত এই সংশয়ের যুগকে। বিবেকানন্দও প্রকৃত সত্যানুসন্ধী ছিলেন, এ চ্যালেঞ্জে তিনি অগ্রসর হয়ে এলেন পরীক্ষা নীরিক্ষা করে দেখবার

---

এবং এ সকল দর্শন মত উপস্থাপিত করা হয়েছে প্রস্তুতিবিহীন বক্তৃতায়! এক ব্যক্তি মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে কি করে এইরূপ বিপুল অধ্যয়ন করেছিলেন? ফয়ারবাক্ ও মার্কসের উল্লেখ না করলেও, তাঁদের দর্শন মতেরও খণ্ডন তাঁর মধ্যে পাওয়া গেছে আমরা দেখেছি। একটি লোকের অস্থি মজ্জায় এ সকল তত্ত্ব প্রবেশ না করলে এমনভাবে উপস্থাপিত করে খণ্ডন করা যায় না। পত্রাবলীতে দেখছি আমেরিকা হতে তিনি ক্রমাগত ভারতীয় দর্শন গ্রন্থ চেয়ে পাঠাচ্ছেন মাদ্রাজী ভক্তদের কাছে। দেখা যায় তাঁর জীবনের প্রথম দিকে প্রধানতঃ তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, পরবর্তীকালে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন শাস্ত্র পড়েছিলেন। এই সুবিপুল জ্ঞান দেখলে মনে হয় আচার্য শঙ্করের মেধাও বোধ হয় হার মেনেছে।

জন্য। বর্তমান ইন্দ্রিয়ানুগ সভ্যতার জড়গ্রস্ত ভীরু বাক্যমাত্র অবশিষ্ট মানুষ তিনি নন। অকুতোভয় চিত্ত বিবেকানন্দ—যে হিরন্ময় আবরণে সত্যের মুখ আবৃত, ধর্ম বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করে তা অপসারিত করে দেখলেন সত্যস্বরূপকে।[১]

এমন যে বস্তুনিষ্ঠ মানুষ রামকৃষ্ণ যিনি একের পর এক ধর্মমতকে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, ধর্ম যাঁর কাছে প্রত্যক্ষ, উপলব্ধ সত্য এবং যিনি অপরকে সেই ধর্ম প্রত্যক্ষ করে দেখাতে প্রস্তুত অর্থাৎ যিনি নিজে প্রমাণ পেয়ে শুধু সন্তুষ্ট নন অপরের সম্মুখে তা প্রমাণিত করতে প্রস্তুত—তিনিই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিক বস্তুবাদীগণের নিকট মধ্যযুগীয় ভাবধারা ও কুসংস্কারের প্রতিনিধি! বিবেকানন্দ তাঁর কাছে কোনও পূর্বপোষিত ধারণা নিয়ে আসেন নি, এসেছিলেন প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসুর স্বাভাবিক সংশয় ও জিজ্ঞাসা নিয়ে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনের যুক্তিবাদ ও পরীক্ষা করে দেখবার ঔৎসুক্য নিয়ে। সেই কারণে পরীক্ষা নীরিক্ষা অন্তে তিনি জেনেছিলেন যে "তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) জীবন একটা অসাধারণ আলোক বর্তিকা, যার তীব্র রশ্মিসম্পাতে লোকে হিন্দুধর্মের সমগ্র দিক বা রূপ সত্য সত্যই বুঝতে সমর্থ হবে। শাস্ত্রে যে সব জ্ঞান মতবাদরূপে রয়েছে, তিনি তাঁর মূর্ত দৃষ্টান্ত।······এই ব্যক্তি তাঁর একান্ন বর্ষব্যাপী একটা জীবনে পাঁচ হাজার বছরের জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে গেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাপ্রদ আদর্শরূপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন।"—"What the whole Hindu race has thought in ages, he lived in one life. His life is the living commentary to the Vedas of all the Nations।" শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী যে প্রতিক্রিয়াশীল নয়, চিরন্তন অগ্রগতির বাণী, তা অনুপম সুন্দর ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন মনীষী বিনয় সরকার। বিনয় সরকার বলেছেন "Altogether as embodying the synthesis of the positive and the idealistic, Ramkrishna has fur-

১। রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে স্পর্শমাত্রে তিনি আত্মজ্ঞানে উন্নীত হয়েছিলেন।

nished the young and the new with the tremendous psychology of the world conquest, of supremacy over the bounds of nature, of emancipation from the fetters of society" ('Creative India'—P 690)। এ উক্তির যাথার্থ প্রমাণিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনীর দ্বারা। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ সমগ্র কথামৃতের সারমর্ম বলে দু'টি কথাকে উপস্থাপিত করতেন।[১] তাহ'ল 'এগিয়ে চলো' আর 'ডুব দাও'। বস্তুতঃ, কথামৃতে এছাড়া আর কিছুই বলা হয় নি। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ dogma, theory তত্ত্বালোচনার উপরে জোর দেন নি। জোর দেন নি পূজা-নিয়ম যাগযজ্ঞের উপর, বলেছেন তুমি যে অবস্থায় আছো সে অবস্থা হতে এগিয়ে গিয়ে মানস-তীর্থ নীরে ডুব দাও, অবগাহন কর। তাঁর কথা হচ্ছে "আম খেতে এসেছো, আম খাও, তা নয় বাগানে কত গাছ আছে, কত ডালপালা আছে, কত পাতা আছে তা গুনে কি হবে।" তাঁর ধর্মোপদেশ হ'ল "ব্যাকুলতা চাই, ব্যাকুল হ'লেই ঈশ্বর লাভ হয়।" এ কি তত্ত্বের কথা, না dogma-র কথা, কুসংস্কারের কথা না এক একান্ত বাস্তববাদীর কথা ?

'এগিয়ে চলা' আর 'ডুব দেওয়া'—এই দুটি সর্বজনীন নীতির বাস্তব ফল কি তা তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে দিয়েছেন। রসিক মেথর বা কালীবাড়ীর মালি কেউই অপাংক্তেয় নয়, তাঁর জীবনচরিতে দেখি এরাও এগিয়ে চলেছে সেই এক অমৃত সাগরের দিকে—ঈশ্বরবস্তুর দিকে। এবং তাঁর ধর্ম পদ্ধতিতে একদা হীনবৃত্তিসম্পন্ন লাটু (যিনি রাম দত্তের ভৃত্য হিসাবে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্রবে এসেছিলেন), পরবর্তীকালে কি মহান শক্তিধর মহাজ্ঞানী সর্ব-জনমান্য, সর্বজনপূজ্য মহাপুরুষরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। একদা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনও শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মের বাস্তবতা ও প্রগতিশীলতার পরিচয় দেন। তিনি নিজ মুখে বলে

১। সৎপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী

গিয়েছেন, সগর্বে বলেছেন "কি ছিলুম, দেখ কি ছিলুম, দেখ কি হয়ে গিয়েছি, আমাকে তিনি দেবতা করে দিয়েছেন।" জন্ম-জাতি, কুল-বৃত্তি, কৃতকর্ম—সবকিছুর হীনতা খর্বতা ও অসম্পূর্ণতা হতে গৌরবে মহিমায় শক্তিতে মানুষকে অধিষ্ঠিত করতে প্রত্যক্ষ সহায়তা করেছেন এই শ্রীরামকৃষ্ণ। নরকে নরোত্তম করতে চেয়েছেন নরের মধ্যে নারায়ণের উদ্বোধন করে। বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যে যে দেবত্বের উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন তার প্রয়োগশীলতা তো রামকৃষ্ণই বাস্তবে প্রমাণিত করে দিয়ে গিয়েছেন। এবং শ্রীরামকৃষ্ণের 'জীবজ্ঞানে শিব সেবা' এই যুগান্তকারী কথাটিই তো বিবেকানন্দের ফলিত বেদান্ত-দর্শনের উৎস এবং আমরা দেখেছি এই ফলিত বেদান্ত-দর্শনই বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি। তা শুধু নয় তাঁর অপর একটি বাণী বিবেকানন্দের হৃদয়ের সর্বহারাদের প্রতি অনন্ত বেদনার অনুভূতি উদ্বুদ্ধ করেছিল—"খালি পেটে ধর্ম হয় না।" তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের অপর ভিত্তি এইখানে। আমরা সর্বহারা নিরন্নদের প্রতি বিবেকানন্দের অগ্নিময় সহানুভূতির কথা জানি, কিন্তু রামকৃষ্ণের জীবনের সে অধ্যায় আমরা বিস্মৃত হয়ে যাই। জমিদার মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে তাঁদের জমিদারীর কোনও স্থানে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের দুর্গতি দেখে রামকৃষ্ণ অনুরোধ করেছিলেন মথুর-বাবুকে তাদের অন্নবস্ত্র দান করতে। তীর্থভ্রমণের খরচে অকুলান হবে ভেবে মথুরবাবু রাজী হন না সে প্রস্তাবে। তাতে উপবাসী প্রজাদের মধ্যে গিয়ে আসন গ্রহণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে কঠোরভাবে বলেন "আমার তীর্থে কাজ নেই আমি এদের মধ্যেই থাকব।" বিবেকানন্দ যাঁর জীবনের জীবন্ত সূত্রগুলির বাস্তব ভাষ্য দিয়েছিলেন তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে, তাঁকেই আমরা অভিহিত করছি "প্রতিক্রিয়া-শীল", "কুসংস্কারাচ্ছন্ন" বলে, হেয় করতে চাইছি ভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ, মধ্যযুগের প্রতিনিধি বলে! বস্তুতঃ ইনি প্রাচীন হতেও প্রাচীন, আধুনিক হতেও আধুনিক, ইনি সনাতন মানব-সত্যকে ধারণ করে আছেন। আমাদের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস পদ্ধতি আমাদের

সত্যের সন্ধানই দিয়েছে বটে! বিবেকানন্দ প্রকৃত সত্যানুসন্ধানী, রামকৃষ্ণকে তিনি তিনটি কথার মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে গিয়েছেন—"অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম"। রামকৃষ্ণ শুধু সত্যজ্ঞানস্বরূপ মহাসাগরের রত্নাকর তা শুধু নন, তাঁর হৃদয়ে সর্বতোবিসারী প্রেম সর্ব মানবকে স্পর্শ করে দিকে দিকে উৎসারিত হয়েছিল এবং অনন্ত কর্মে তা তিনি রূপ দিতে চেয়েছেন, চেয়েছেন নিরন্তর মানুষের খর্বতা, ক্লীবতা, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা দূর করতে। একাজ তিনি বাস্তবে করে গিয়েছেন; তাঁর দ্বাদশ বৎসরের সাধনান্তকালে জীবনের অন্তভাগে তিনি শুধু আর্তের পীড়িতের, জিজ্ঞাসুর, এবং মুক্তিকামীর একান্ত বন্ধুরূপে বিরাজ করেছেন। অর্থাৎ যে কেউ তার জীবনের সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে, মহিমার শিখরে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে, তারই প্রতি তিনি তাঁর সাহায্যের হস্তখানি প্রসারিত করেছেন। যখন তিনি কঠিন গলরোগে আক্রান্ত, বাক্যস্ফূর্তি নিদারুণ বেদনাদায়ক, তখনও এ কর্ম তিনি করে চলেছেন। কয়েকজন শোকার্ত ব্যক্তির সঙ্গে ডাক্তারের সমস্ত নিষেধ অগ্রাহ্য করে একদিন কথা বলবার পর যখন তাঁর শিষ্যবর্গ তাঁকে তিরস্কার করলেন, তখন তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলেছিলেন—"আমি জন্ম জন্ম এই কষ্ট ভোগ করব, এমনি করে শুধু সাবু খেয়ে দিন কাটাবো, তবুও যতক্ষণ একটি দুঃখীরও দুঃখ-বেদনা দূর করতে পারি, ততক্ষণ তাই করবো।"[১] পরবর্তী কালে বিবেকানন্দের মুখেও আমরা ঠিক অনুরূপ উক্তি শুনেছি[২]—"আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না। আমি লাখ নরকে যাব, বসন্তবল্লোক হিতং চরন্তঃ' (যে বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করে)—এই আমার ধর্ম।"[৩] এই উক্তি রামকৃষ্ণের উক্তির প্রতিধ্বনি নয়

---

১। স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে এ ঘটনাটি বর্ণিত আছে।

২। এই ভাবের বিবেকানন্দের আর একটি উক্তি—"সকল জাতির যারা দুর্বৃত্ত, দরিদ্র নিপীড়িত তারাই আমার ভগবান। এই ভগবানের জন্য আমি বারবার জন্মাতে চাই; জন্ম জন্ম দুঃখ পেলেও আমার দুঃখ নাই।"

৩। পত্রাবলী—৭১ পৃষ্ঠা

কি ? তাছাড়া, মানব কল্যাণ যজ্ঞে ব্রতী হবার জন্য বিবেকানন্দকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। একদা যখন অধ্যাত্ম অমৃত-পিয়াসী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন "আমি সর্বদা শুকদেবের মত নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই," শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন "কি হীন তোর বুদ্ধি রে, তোর লজ্জা করে না একথা বলতে ? কালে কোথায় বিশাল বটবৃক্ষের মত হবি—তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা নয়, তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস"। কেবল নিজ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে রামকৃষ্ণ স্বার্থপরতা বলে অভিহিত করে গিয়েছেন। রামকৃষ্ণ সূত্রাকারে যার সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন, তারই মহাভাষ্যরূপ পেলাম বিবেকানন্দতে। যেমন ঋগ্বেদে যে সত্যের মন্ত্ররূপে প্রকাশ পাই, তারই কর্মায়তরূপ পাই যজুর্বেদে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্য প্রতিফলিত করেছেন, যে কর্মের সূত্রপাত করেছেন ও নির্দেশ দিয়েছেন তারই বাস্তব রূপায়ণ পাই বিবেকানন্দে। অতএব রামকৃষ্ণের মধ্যযুগীয় প্রভাবে পড়ে বিবেকানন্দ এক জটিল চরিত্রে পরিণত হয়েছিলেন—এ সকল অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় কথা ও অসিদ্ধ যুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণই কর্মে পরিণত বেদান্তের জীবন্ত বিগ্রহ।

পরিশেষে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা যে বিপুল আধ্যাত্মিক গবেষণা দেখি, যে অবিশ্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখি, অসীম সত্য সাগরের যে মহা অভিযানকারীর দর্শন তাঁর মধ্যে আমরা পাই, তাঁর জীবনে যে বস্তুনিষ্ঠা, দুঃসাহসিকতা ব্যবহারিক প্রয়োগধর্মীতা দেখি তাতে কি করে যে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায় ভূষিত করা যায় তা আমরা বুঝতে সত্যই অপারগ। পৃথিবীর সব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানীকেই তা হলে 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলা যেতে পারে। আসল কথা, এই সকল কথা যাঁরা বলেন তাঁরা যে কোন ধর্মকে প্রগতি-বিরোধী বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ধর্ম যে আত্মার জাগরণ ঘটায়, দুর্বল মানুষকে শক্তিমান করে, তুচ্ছকে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করে, নরকে নারায়ণে পরিণত করে নরোত্তম করে তোলে—তা এ সকল অন্ধ

বিশ্বাসীদের দৃষ্টিবহির্ভূত। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সারা জীবন তাঁর 'এগিয়ে চলো' বা বেদের 'চরৈবেতি' বাণীর বাস্তব দৃষ্টান্ত। শিশু-কালেই তাঁর অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মননশীলতা দ্বারা তিনি দেখেছিলেন বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য 'চালকলাবাঁধা' বা জীবিকার্জনের উপায় লাভ, এর দ্বারা সত্যকে জানা যায় না। তাঁর বিচারশীল মন তখনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ল এ বিদ্যায় তার প্রয়োজন নেই, যে জ্ঞান সকল জ্ঞানের আকর, যাকে আয়ত্ত করলে সকল অন্ধকার দূর হয় তিনি তাকেই জানবেন। বিচার ও বিবেক ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বিশিষ্ট গুণ। এই বিচারবুদ্ধি এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত ছেড়ে না দেওয়ার যে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা—এ দু'টি গুণই তার জীবনপথে সফলতার কারণ। বিচারপূর্বক তিনি দেখেছিলেন অধ্যাত্ম পথের দু'টি অন্তরায়—কাম ও কাঞ্চন। এবং অধ্যাত্ম সত্যের পথে যেতে হ'লে সংসারের পথ ছেড়ে এগোতে হবে, যেমন পূবদিকে চলতে হ'লে পশ্চিম দিক ছেড়ে ক্রমেই আমরা দূরে যাই। পরিশেষে তিনি দেখলেন এ পথের শেষ বাধা অহং বুদ্ধি। সুতীক্ষ্ণ বিচার পূর্বক তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দেহের আপাত চাকচিক্যের অন্তরালে অবস্থিত রক্ত মাংস, হাড়,—এই হাড়ের খাঁচায় পূজার কোন সার্থকতা নেই। দ্বিতীয়তঃ টাকার দ্বারা আমরা ধন মান ঐশ্বর্য সবই পেতে পারি—কিন্তু সত্য যা, অবিনশ্বর যা, অনন্ত আনন্দধাম যা, তা কখনই পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ অহং বুদ্ধি সর্বদা আমাদের মনকে বহির্মুখী করে দিচ্ছে এবং মনের শান্তি ও সাম্য বিনষ্ট করে অশেষ ক্লেশের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অহং বুদ্ধির কারণ অজ্ঞানতা, বিশ্বাত্মার সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দেওয়াই হ'ল তাকে দূর করে দেওয়ার উপায়। সেই বিশ্বাত্মার সঙ্গে চেতনার সংযোগের জন্য বাক্যেও কখনও তিনি 'আমি ও আমার' কথাটি বলতেন না। কারণ বাক্যই চিন্তাতে প্রতিফলিত হয়। তাঁর তীক্ষ্ণ মেধার নিকট আর সংকল্পের দৃঢ়তার নিকট এ সকল বাধাই পরাজিত হয়েছিল। মনস্তত্ত্বের প্রতিটি পর্যায় বিশ্লেষণ করে তিনি এইরূপে বিচার দ্বারা, যুক্তির দ্বারা, মননশীলতার সহায়ে, প্রত্যক্ষ

অনুভূতির পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে প্রগতিশীল বিজ্ঞানী না বলে কেমন করে পারা যায়? তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর ভ্রূকুটি, আত্মীয় পরিজনদের বাধা, বাসনার প্রতিকূলতা, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা-বদ্ধতা কিছুই প্রতিহত করতে পারে নি। হয় সত্য লাভ না হয় মৃত্যু — এই দুঃসাহসিক পণ নিয়ে তিনি যৌবনের শ্রেষ্ঠতম দিনগুলি নিয়োগ করেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমতগুলির প্রত্যেকটির সত্যাসত্য নির্ণয় করতে। পরীক্ষা না করে তো তিনি কিছু বলেন নি, একটি কথাও তাঁর তত্ত্বের কথা নয়, সব প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা। এমন কি তিনি বলতেন 'গীতা' অর্থ কি না দশবার 'গীতা' উচ্চারণ করলে যা হয় তাই, অর্থাৎ ত্যাগী। অর্থাৎ কেবল 'being and becoming' এই হ'ল তাঁর ধর্ম। এমন একটি কথাও তিনি বলেন নি, যার ভিত্তি স্বীয় পরীক্ষিত নয়, অনুশীলিত নয়, অনুশীলন করা যায় না। তাও শুধু নয়, তিনি যা বাক্যে প্রকাশ করেছেন, তারই জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে বিরাজ করেছেন—নরের নরোত্তম মূর্তি হয়ে, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্মকে নিজের মধ্যে প্রতিভাত করে, মাত্র একান্ন বছরে একটি বিরাট জাতির পাঁচ হাজার বছরের সমগ্র অধ্যাত্ম জীবন নিজে যাপন করে। এঁর চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ আর কে, বৈজ্ঞানিক আর কে, প্রগতিশীল আর কে?

# সপ্তম অধ্যায়

## মায়াবাদ

### সন্ন্যাস ধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ

"India was saved by the begging bowl of the Sannyasin"—*Swami Vivekananda.*

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতেই বিবেকানন্দ এই তত্ত্ব জেনেছিলেন যে দেব-সত্বা সম্পন্ন মানুষ জন্ম-মৃত্যুর কঠিন নিগড় ভেঙে ফেলবার প্রয়াস করবেই, এই তার স্বভাব এবং ক্ষুদ্র 'আমিত্বের' সীমার উর্ধ্বে অসীম শক্তিমান হয়ে সে বিরাজ করতে চাইবে।

অতএব, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় সঞ্জীবিত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন ঃ "I am a Socialist"। সুতরাং, জীবন-মৃত্যুর রহস্য ভেদের প্রয়াসের সঙ্গে,—যা হ'ল ধর্মের মূলকথা, সমাজতন্ত্রবাদী হওয়ার মধ্যে বাস্তবিক কোন বিপরীত সম্বন্ধ আছে কি না বিচার করে দেখা প্রয়োজন। জীবন-মৃত্যুর এই রহস্য ভেদ করতে যাঁরা অগ্রসর হ'ন, এ জগৎ সংসারের চির-প্রবহমান রূপটির ভাল করে পরিচয় গ্রহণ তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়। এ জগৎ সংসারে কিছুই স্থায়ী নয়, এক অনন্ত প্রবাহে সবকিছু ভেসে চলেছে, 'আছে' কিম্বা 'নেই'—এও ঠিক করে বলা দুরূহ। এ রহস্যটিকেই তাঁরা 'মায়া' বলে অভিহিত করে থাকেন। অতএব, এ মায়া 'অলীকতা নয়, এ হ'ল একটি অনস্বীকার্য বাস্তব তথ্য—"a statement of fact"। সত্য যা, তার অবস্থান নিশ্চয়ই এই অনিত্যতা অতিক্রম করেই হ'বে। অতএব, তাঁদের এই অনিত্যবস্তু,—এই সংসারকে অতিক্রম করে যেতে হয়। এই অতিক্রম করবার প্রয়াসই হ'ল সন্ন্যাস। অতএব যাঁরা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তাঁরা মায়ার জগতের সব সম্বন্ধকে অস্বীকার করেন। এঁদের একমাত্র প্রচেষ্টা দুর্নিরীক্ষ্য মায়াতীত সত্যকে নিরীক্ষণ করা এবং তাতেই

প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সত্য যখন মায়াতীত বস্তু, তখন মায়াকে অতিক্রম না করতে পারলে তা কখনও জানা যাবে না। সুতরাং, সত্যকে জানবার জন্য চিরদিনই সন্ন্যাসব্রতের প্রয়োজন রয়েছে। প্রাচীন কালে বা আধুনিক কালে সর্বকালেই যখন মানুষের সত্য জানবার প্রয়োজন রয়েছে এবং তা জানবার জন্য মানব মনের দুর্নিবার তাগিদ আছে, তখন সন্ন্যাস ব্রতও চিরন্তন শাশ্বত মানব-ধর্ম রূপে বিরাজ করবে। এর আবেদন চিরকালই কিছু মানুষের কাছে অমোঘ থাকবে। বর্তমান যুগে তা অপ্রয়োজনীয় এবং "nauseating"—এমন অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক কথা একমাত্র ভীরু ও অল্প বিশ্বাসী মাত্র মনে করবেন, যে কোনও সাহসী সত্যানুসন্ধী তাকে অতি প্রয়োজনীয় ও জীবনের গতিশীল তার অবিচ্ছেদ্য ধর্ম বলে মনে করবেন। ঐকান্তিক সত্যপিপাসু বিবেকানন্দও তাই সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেছেন এবং এই 'মায়াবাদ'কে প্রচারিত করেছেন পাশ্চাত্য দেশে। মনে রাখতে হবে এই 'মায়াবাদী' সন্ন্যাসীই নিজেকে 'সমাজতন্ত্রবাদী' বলে ঘোষণা করেছেন। যখন তিনি এ কথা বলেছেন 'মায়াবাদের' ওপর দাঁড়িয়েই বলেছেন, 'মায়াবাদ'কে দূরে সরিয়ে রেখে নয়। অতএব, অবশ্যই মায়াবাদী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাস ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে কোথাও একটি সংগতি নিশ্চয়ই রয়েছে। সেই সংগতি-সূত্রের অনুসন্ধানই এখন আমাদের আবশ্যক।

রহস্যাবৃত যে সত্যের কথা ভারতের ধর্মদর্শন চিরদিন বলে আসছে, তার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ ধর্মদর্শনের উত্তুঙ্গ-চূড়া—শেষ কথা। এই বেদান্ত দর্শনোক্ত সত্য একদিকে উপলব্ধি, অপর দিকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের বিশ্লেষণী শক্তির পরাকাষ্ঠা এতে প্রকাশিত। তর্কশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রণালীকেও এজন্য উন্নতির শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এইরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে, তা'হল এই যে সত্য এক ও অভেদ এবং তার স্বরূপ সৎ-চিৎ ও আনন্দময়। যতক্ষণ কোন ব্যক্তি নিজ স্বরূপ জানতে না পারছে, ততক্ষণও তার

স্বরূপ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে না, সে তখনও এই 'সৎ-চিৎ-আনন্দ' স্বরূপই থেকে যাচ্ছে। সেই জন্যই স্বামীজী বলেছেন 'Each soul is potentially divine'—মানুষের স্বরূপ বোধ সুপ্ত থাকতে পারে, বিকাশের অপেক্ষা রাখতে পারে কিন্তু স্বরূপকে সব সময়ই অবিকৃত থাকতে হবে। যা এখন নেই, তা হতে পারে না, 'অনস্তিত্ব' থেকে 'অস্তিত্ব' আসতে পারে না। যে এখন স্বরূপতঃ সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ নয়, সে পরে তা প্রাপ্ত হতে পারে না। অতএব, মানুষে মানুষে স্বরূপতঃ কোন বৈষম্য নেই, যা আছে তা হ'ল বিকাশের বৈষম্য। সব মানুষই তাদের স্বরূপের দিক থেকে এক ও অভিন্ন—শক্তিমান্-দুর্বল, ধনী-দরিদ্র, অজ্ঞ-জ্ঞানী, পাপী-পুণ্যবান। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস সহায়ে এ তত্ত্ব উপলব্ধি করেছে, সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার আপনার। অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের তাৎপর্য এখানে। এ এক অপূর্ব সমদৃষ্টি ও সাম্য-উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং এইজন্যই অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদে বিশ্বাসীদের আচরণে এক আপাত বৈপরীত্যের আবির্ভাব ঘটে। এ যেমন একদিকে মানুষকে মায়াতীত সত্য উপলব্ধির জন্য সমাজ-সংসারের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছিন্ন করে অরণ্য-গিরি-গুহাবাসী হতে অনুপ্রাণিত করবে, আবার যে অদ্বৈত-তত্ত্ব উপলব্ধি করেছে তাকে উপলব্ধ একত্ব ও সাম্য সমাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। অরণ্যের নির্জনতা, পর্বত-গুহার নিঃসঙ্গত্ব ত্যাগ করে তখন সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীকে দাঁড়াতে হয় সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে এই মলিন সংসারের কোলাহলের মধ্যে। ভারতের সকল ধর্মনেতা ও অবতার আখ্যা-প্রাপ্ত পুরুষের কর্মক্ষেত্র তাই সমাজ। যুগে যুগে তাঁরা যেমন এক-দিকে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের গ্লানি দূর করেছেন, অপরদিকে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সাম্যের উপর। ভাগবতে আমরা এই সাম্য প্রচেষ্টার ইঙ্গিত পাই। বুদ্ধ-শঙ্কর প্রভৃতি সকলের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে একই ইঙ্গিত পাই।[১]

---

১। "Do you read the history of India ? Who was Ramanuja ? Who was Shankara ? Who was Nanaka ? Who was Chaitanaya ? Who was

এ আপাত বৈপরীত্যের সমাধান স্বামীজীই দিয়েছেন। জীবন ও ধর্ম পৃথক নয়, জীবনই ধর্ম। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা না হলে ধর্ম তো তত্ত্বের মধ্যে আবদ্ধ রইলো, তা বাস্তব সত্য হয়ে উঠলো না। অতএব তার বাস্তব প্রয়োগ চাই। বিবেকানন্দ এ সম্পর্কে বলেছেন—"বেদান্ত যদি ধর্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে একান্তভাবে কার্যকর হইতে হইবে। আমাদের জীবনের সর্বাবস্থায় উহাকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তু সম্পর্কে উপদেশ দেন—বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্বত্র বিরাজিত।"[১] আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবন এক ও অভেদ। সেইজন্য "আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে পর্বতগুহা ও নিবিড় অরণ্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কিরূপে মতবাদগুলি (অদ্বৈত বেদান্তের মতবাদ) আবার কর্মমুখর নগরীর রাজপথে কার্যে পরিণত হইতেছে।" অর্থাৎ আরণ্যক বেদান্তের প্রয়োগক্ষেত্র সমাজ। বস্তুতঃ যদি আমরা জেনে থাকি যে, সব মানুষ, সব প্রাণী একই দেবসত্বাসম্পন্ন, দেবত্ব-সত্বায় সকলে এক ও অভেদ, তা'হলে তার স্বতঃসিদ্ধ পরিণাম—জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সকলের একই অধিকার স্থাপন। এই কারণেই সন্ন্যাসী ধর্মনেতারা কাজ করেন সমাজে। তাঁদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র অরণ্য নয়। এমন কি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি আধ্যাত্মিক সত্য আস্বাদনে সমস্তক্ষণ মগ্ন থাকতেন, মুহুর্মুহুঃ যাঁর সমাধি হ'ত, আমরা দেখেছি তিনিও সর্বক্ষণ সমাজ-সংসারের কল্যাণ চিন্তা করেছেন এবং অবিরাম কর্ম করেছেন। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে বিবেকানন্দের মধ্যে বৈপ্লবিক সমাজ-চিন্তার পত্তন তিনিই করেছিলেন—'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' এই উক্তির

Kabira? Who was Dadu? Did not Ramanuja feel for the lower classes? Did he not try all his life to admit even the Pariah to his community? They all tried and their work is still going on." ('My Plan of Campaign' —Swami Vivekananda.)

১। 'কর্মজীবনে বেদান্ত'—প্রথম প্রস্তাব (বাণী ও রচনা) ২১৯.পৃঃ

দ্বারা। যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে এই কথা বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) শুনেছিলেন, সেইদিন তিনি বলেছিলেন "আজ এক নূতন আলোক দেখতে পেলুম।" তাছাড়া আমরা দেখেছি যখন একসময়ে বিবেকানন্দ তাঁর কাছে সর্বক্ষণ নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকবার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ধিক্কৃত করে বলেছিলেন 'ছিঃ তোর এত ছোট ধারণা, কালে যে তোকে বটগাছের মতো অনেককে আশ্রয় দিতে হবে।' এই উক্তির মধ্যে সমাজ-সংসারের প্রতি সন্ন্যাসীর মহান কর্তব্যের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট রয়েছে। যে সত্য সে জেনেছে তাকে তার বাস্তব প্রয়োগ করতে হবে। এ হ'ল তার কর্ম পরম্পরায় সুসঙ্গত পরিণতি বা সন্ন্যাসাশ্রমের শেষ ন্যায়সঙ্গত পরিণাম। ভারতীয় সন্ন্যাসীরা এ প্রচেষ্টা যুগে যুগে করেছেন, এ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সেইজন্য, স্বামীজী সম্ভবত লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলককে বলেছিলেন "India was saved by the begging bowl of the Sannyasin"—সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র ভারতীয় সমাজকে যুগে যুগে বিচ্ছিন্নতা হতে রক্ষা করেছে।

বস্তুতঃ, ভারতের ইতিহাসে যে সব ব্যক্তি ভেদ-বিভেদের বিচ্ছেদের ও অসাম্যের মধ্যে প্রীতি ও সাম্যের যোগ-সেতু রচনা করতে পেরেছেন, তাঁরাই আমাদের মহাপুরুষ।[১] শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা রীতি-মত সমাজ-বিপ্লবের ইঙ্গিত পাই, যার অবসান হয়েছে বিভিন্ন অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠায়। এমন কি সমাজে অর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার কথাও সেখানে পাওয়া যায়। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—সকলেই ক্ষুধার অন্ন পেতে পারে, তার চেয়ে বেশী যে ছলে বলে অধিকার করে, সে চোর, সামাজিকভাবে সে দণ্ডার্হ। কিরাত, হূণ, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, যবন, খস প্রভৃতি সকল জাতিই ভগবানের শরণে শুদ্ধ হয়।[২] বুদ্ধও ও জাতিভেদ মানেন নি, তাঁকে স্ত্রী-শূদ্রের মুক্তিদাতারূপে স্তুতি করা হয়েছে বিশেষভাবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

১। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'—রবীন্দ্রনাথ
২। ভাগবত ৭।১১।১০ ও ২।৪।১৮

সর্বদা মহাভাবে বিভোর থাকলেও জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন—সেই একান্ত জাতি-সচেনতার যুগে তাঁর নির্দেশে যবন হরিদাসের মৃত্যুর পর মৃতদেহের পাদোদক পান করেছিলেন তাঁর উচ্চবর্ণের শিষ্যগণ। রামানুজ তাঁর ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারিয়া এবং মুসলমানগণকে স্থান দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।[১]

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি, সন্ন্যাসী ও ধর্মপথের পথিকের পক্ষে সমাজের সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বরঞ্চ তাই তাদের জীবনযাত্রার ও জীবন দর্শনের স্বাভাবিক পরিণতি। এবং ইতিহাসে তার প্রমাণ আমরা বারবার পেয়েছি। সুতরাং স্বামীজীও ভারতের সন্ন্যাসীদের চিরন্তন ধারা ও ঐতিহ্য অনুসরণ করে সমাজে সাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছেন। অতএব তাঁর কর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে, ধর্ম ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নেই। ধর্মই তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের উৎস। তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ একান্তরূপে ধর্ম্মভিত্তিক –এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব।

---

১। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্রমবিকাশের ধারা'—স্বামী বিবেকানন্দ।

# অষ্টম অধ্যায়

## বৈচিত্র্যে একত্ব ও বিশেষ সুবিধা তত্ত্ব

"Unity in diversity is the scheme of the universe"—*Vivekananda*

আমরা পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ের আলোচনায় দেখেছি যে আজকের দিনে এ দেশীয় সমাজশাস্ত্রবিদগণ, বিবেকানন্দের মত বিশ্বাস ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে সঙ্গতিবিহীনতা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন তা ভ্রান্ত। বিবেকানন্দ এক প্রহেলিকাময় জটিল চরিত্র নন, কতগুলি বিরুদ্ধ ভাবনা-চিন্তার সামঞ্জস্যহীন সমষ্টি নন। তাঁর মতের মধ্যে যে যুক্তিসিদ্ধ ঐক্য দেখা যায় তা বিরল, গ্রন্থশেষে আমরা সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করব[১]। তাঁর সমাজতন্ত্রবাদ ও ধর্মাচরণ ও সন্ন্যাস যে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ এ দেখাবার জন্যে আমরা এখানে তাঁর সাম্যাদর্শ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা কালে দেখেছি যে বিবেকানন্দ যে সাম্যবাদের কথা বলেছেন তার ভিত্তি হল ফলিত বেদান্ত দর্শন। তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের মূলভিত্তি উক্ত দর্শনের এই আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ। এই আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের ভিত্তি দু'টি নীতির উপর (যা ফলিত বেদান্ত দর্শন হতেই প্রাপ্ত)। এক, বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব, দুই বিশেষ সুবিধাতত্ত্ব, যার উল্লেখ আমরা প্রসঙ্গতঃ একবার তৃতীয় অধ্যায়ে করেছি। এখানে এ উভয়ের বিশদ আলোচনা করে দেখবো বিবেকানন্দের সাম্যের ধারণার প্রকৃত স্বরূপটি কি।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে বিবেকানন্দের সাম্যবাদের প্রধান কথা সমান অধিকার নয়, একই অধিকার। সাম্যের এই অভিনব ধারণা আমরা অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে দেখি না। সমান অধিকারের ধারণা হতে এই একই অধিকারের ধারণা এজন্য শ্রেয়

১। সপ্তদশ অধ্যায়—'সমন্বয়াচার্য্য বিবেকানন্দ ও তাঁর সর্বাবয়ব সমাজদর্শন।'

যে যে পিছিয়ে পড়ে আছে তাকে এগিয়ে আনবার জন্য সাহায্যে প্রসারিত একখানি হস্ত এর মধ্যে আছে, আছে তার জন্য অন্তরের অগ্নিময় সহানুভূতি। মার্কস সহানুভূতিতে আস্থাশীল নন, কিন্তু বিবেকানন্দের মধ্যে সহানুভূতি ও বৈজ্ঞানিকতার অপূর্ব সমন্বয় আছে। এই অভিনব তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করে বিবেকানন্দ বলছেন—"There is, as it were, an infinite ocean behind, and you and I are so many waves, coming out of that infinite ocean; and each one of us is trying our best to manifest that infinite outside"—অনন্ত আত্মসমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় প্রত্যেক মানুষ প্রতিমুহূর্তে আপনার স্বরূপ বিকাশ করবার প্রয়াস করছে।[১] "So potentially each one of us has that infinite ocean of Existence, Knowledge and Bliss as our birthright, our real nature, and the difference between us is caused by the greater or lesser power to manifest that divine. Therefore each man should be treated not as what he manifests but as what he stands for"। অনন্ত শক্তি-জ্ঞান-আনন্দ স্বরূপ মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তা স্বরূপের দিক হ'তে কোন বৈষম্য নয়, সে বৈষম্য বিকাশের। বিকাশ সুযোগের উপর নির্ভর করে। অতএব সকলকে এ বিষয়ে সমান অধিকার দিতেই হ'বে, আর একটু অধিক অধিকার দিতে হবে তাকে, যে পিছিয়ে আছে, নতুবা একই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। অতএব বিবেকানন্দের মত "If there is inequality in nature, still there must be equal chance for all—if greater for some and for some less—the weaker should be given more chance than the stronger।" যে পিছিয়ে আছে, তারও সর্ববিষয়ে পূর্ণ অধিকার আছে, পিছিয়ে আছে বলে সে বঞ্চিত হবে, শোষিত হবে, তার কোন মানে নেই। কালে সকলেই উন্নতির এক স্তরে পৌঁছবে—"If one man is slower

১। 'The Spirit and Influence of Vedanta'—Swami Vivekananda.

than another, we need not be impatient, we need not curse him or revile him"। কাল অনন্ত, অতএব বর্তমানের এই বিকাশের তারতম্য—অধিকার ও সুযোগের ক্ষেত্রে, যুক্তিগত দিক হ'তে কোন বৈষম্য আনতে পারে না।

সুতরাং, দেখা যায় যে ভেদ বৈষম্য সমাজে যুগ যুগ ধরে এনেছে বহু রক্তপাত, বহু অত্যাচার, শোষণ, সে সকলের মূলে অদ্বৈত-বেদান্তের অস্ত্র সহায়ে বিবেকানন্দ কঠিন আঘাত করেছেন।

এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সমাজের ও বিশ্বের মূলে অধিষ্ঠিত একটি মৌলিক নিয়মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই মৌলিক নিয়ম হ'ল দু'টি বিপরীত প্রবণতার সহাবস্থান। একটি হ'ল বৈচিত্র্যকরণের প্রবণতা, অপরটি হল একত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ; একটি জাতি সৃষ্টির প্রবণতা, অপরটি জাতিভেদের নিগড় ভেঙে ফেলবার প্রবণতা। কিন্তু, বৈচিত্র্যকরণই জীবনের লক্ষণ, বৈচিত্র্যহীন একত্বে মৃত্যু ঘটে,—"the perfect unity is perfect annihilation, and that when the differentiating process that is at work in this universe ceases, the universe comes to an end"। সমাজে সকলের বৈচিত্র্যহীন সমানত্ব ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যহানি ঘটিয়ে অধঃপতন ও ধ্বংস আনে। কিন্তু তা সত্বেও যুগে যুগে ঐক্য ও সমানত্বের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও চিরন্তন ; আমরা দেখেছি সকল ধর্মনেতাগণের মূল প্রয়াস এটি। এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান দিয়েছেন বিবেকানন্দ, যার সম্যক তাৎপর্য অনুধাবন না করলে আমাদের সাম্যের ধারণা সুস্পষ্ট ও পূর্ণায়ত হয় না—"The whole universe is a play of unity in variety, and of variety in unity."। সমগ্র বিশ্ববিধানের মূল স্বরূপ—বহুত্বের মধ্যে একত্ব এবং একত্বের মধ্যে বহুত্ব।

এই অভিনব তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান যুগে অনেক ক্ষেত্রেই যে সমানত্বের আদর্শ সাম্যবাদীগণ দিয়ে

থাকেন, এ তত্ত্ব তার মূলগত ত্রুটি প্রকটিত করছে। Plato-র আদর্শ সমাজে এবং বর্ত্তমান চীনের 'Commune'গুলিতে সমানত্ব আনবার প্রয়াসের ফলে এমন কি পারিবারিক জীবনেরও অবসান ঘটাতে চাওয়া হয়েছে। Platc-র মতে সাম্যের অন্যতম সর্ত হ'ল "Community of wives and children"। এতে অধিকার[১] অস্বীকৃতি ও শোষণ সম্ভব নয় বটে, কিন্তু এর দ্বারা সৃজনী প্রতিভার মৃত্যু ঘটে এবং তা শুধু নয় সকলেরই বিকাশের পথে প্রবল বাধা হয়। এই প্রাতিভাসিক জগতে প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের দরুণ বিকাশের স্বকীয় কক্ষপথ আছে, সে পথে না চললে তার বিকাশ ঘটে না। একথা Plato ভুলে গিয়েছিলেন এবং আজকের দিনে চীনে কমিউনের প্রবর্ত্তকেরা ভুলে গেছেন। বিবেকানন্দ তাঁর একত্বের আদর্শ বলতে এরূপ বৈশিষ্ট্যহীন, প্রাণচাঞ্চল্যহীন সমাজের কথা বলছেন না। এ ধরণের একত্ববাদীগণ এতকাল 'ইউটোপীয়ান' আখ্যা পেয়ে এসেছেন। বিবেকানন্দের ঐক্য এই 'ইউটোপীয়ান' ঐক্য নয়। তাঁর মত একত্ব ছাড়া যেমন মানব সমাজের চলে না,—কারণ একত্বের অভাবে মানব সমাজ ভেদ-বৈষম্য ও অত্যাচারের লীলাক্ষেত্র হয়, তেমনি বৈচিত্র্য ছাড়াও সমাজের চলে না, কারণ বৈচিত্র্য না থাকলে নব নব বিকাশের অভাবে সমাজের মৃত্যু ঘটে। "That all men should be the same, could never be, however we might try. Man will be born differentiated ; some will have more powers than others ; some will have natural capacities, others not ; some will have peifect bodies, others not"।' অতএব, এই বিশ্ব-বিধানে মানুষে মানুষে বিকাশের পার্থক্য অপরিহার্য, কোনও মতেই তাকে বাধা দেওয়া চলে না, এবং দিলেও কল্যাণ হবে না। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য লোপ পেলে সৃজনী শক্তি লোপ পাবে, প্রতিভার স্ফুরণে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবধারার প্রবাহ সম্ভব হবে না। প্রতিভা ও সৃজনী শক্তি

১। 'Privilege'

বৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। অতএব, বৈচিত্র্য রুদ্ধ করা যায় না, করা উচিতও নয়। সুতরাং সব সমাজেই (এমন কি যাকে শ্রেণীবিহীন সাম্য সমাজ বলা হয় সেখানেও) কেউ এগিয়ে থাকবে, কেউ পিছিয়ে থাকবে, কেউ বিশেষ দক্ষতা দেখাবে সৃষ্টিমূলক কাজে, কেউ তা আদৌ পারবে না, তার জন্য কাউকে তার বাঁচবার অধিকার হতে বঞ্চিত করা চলবে না। তাই যদি হয় তাহলে একত্ব স্থাপন ও সাম্য স্থাপনের তাৎপর্য্য কি? সাম্য কি তাহলে মাত্র একটি কথার আঙ্গিক, এক অলীক আদর্শবাদ?

উত্তরে বিবেকানন্দ যা বলছেন তা শুধু অভিনব নয়, সাম্য সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ সম্পূর্ণ নতুন দিগ্‌দর্শন। তিনি বলছেন "the sameness as regards external forms and position can never be attained. But what can be attained is elimination of privilege।" ব্যবহারিক জীবনে, এই নামরূপের জগতে সর্বাত্মক সমানত্ব অর্জন করা যায় না, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে গঠিত বৈষম্য ও 'বিশেষ সুবিধার' অবসান ঘটানো যায়। বৈচিত্র্য থাকবেই, কেউ গুণী হবে, কেউ নির্গুণ, কেউ প্রতিভাধর হবে, কেউ বা বুদ্ধিহীন, কেউ বা অমিত বলশালী, কেউ বা ক্ষীণকায় দুর্বল—মানুষে মানুষে শক্তি বিকাশের এই তফাৎ থাকবেই—এ হ'ল প্রকৃতির বিধান। কিন্তু বৈচিত্র্য তো দোষের নয়, বৈচিত্র্য বরঞ্চ নতুন চিন্তা আনে, আনে নতুন উদ্ভাবনী শক্তি—উন্নতির সোপান হ'ল এই বৈচিত্র্য। কিন্তু বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে আবহমানকাল ধরে যে বিশেষ সুবিধার প্রাকার গঠিত, তাই অত্যাচার, নিপীড়ন, সাধারণের অধিকার অস্বীকৃতির কারণ। "The difficulty is not that one body of men are naturally more intelligent than another, but whether this body of men, because they have the advantage of intelligence, should take away even physical enjoyments from those who do not possess that advantage"—যে বুদ্ধিমান সে তার বুদ্ধি আছে বলে নির্বোধের

মুখের অন্ন কেড়ে খাবে এ বিধান পৃথিবীর কোথাও নেই। এইজন্য যুগে যুগে আমরা পৃথিবীতে যে সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করি মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে তা হ'ল এই বিশেষ সুবিধা অবসানের জন্য—পার্থক্য বা বৈচিত্র্য লোপের জন্য নয়, যা হ'ল অসম্ভব।

স্বামীজীর সাম্যবাদের যৌক্তিকতা এইজন্যই অধিক যে এ বিষয়ে বিশ্ববিধানের স্বরূপটাই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে—"unity in diversity is the scheme of the universe"। বৈচিত্র্য থাকবে, কিন্তু, তার মধ্যেও ঐক্য ও সামঞ্জস্য আছে, সেটিকে বজায় রাখতে হবে, তা' না হ'লে বিশ্বনিয়মের বিরোধিতার জন্য বিফল হতে হবে। বৈচিত্র্য রক্ষা করে একত্ব সম্পাদন যদি সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে করতে হয়, তাহলে তার তাৎপর্য হ'ল সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটানো। মানুষে মানুষে শক্তির পার্থক্য আছে। তাই সব কথা নয়, স্বরূপের ঐক্যের কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। স্বরূপের ঐক্য ও বিকাশের পার্থক্য এ উভয়ের সুসামঞ্জস্য স্থাপিত হয় বিশেষ সুবিধা বিদূরিত করতে পারলে। বিশেষ সুবিধার পক্ষে কোন যুক্তি নেই—বুদ্ধিমান, শক্তিমান, বলবান, ধনবান, যারা দুর্ব্বল, অক্ষম নির্বোধ ও দরিদ্র তাদের অন্নবস্ত্র ও আশ্রয় ও সামাজিক মর্য্যাদা হতে বঞ্চিত করবে এ কোনও মতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদীদের ধারণায় এই বৈচিত্র্য-তত্ত্ব ও এই 'বিশেষ সুবিধাতত্ত্ব' আমরা দেখতে পাই না। মার্কস এ সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা দেন নি। ফলে বিষম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। রাশিয়ার বিপ্লব সংঘটিত হবার ঠিক পরবর্তী তিন বৎসরে আমরা দেখতে পাই একদল বামপন্থীদের এই বৈচিত্র্যহীন সাম্য প্রতিষ্ঠার সর্বনাশা বিফল প্রয়াস। অবশ্য তাদের প্রয়াস সফল হয় নি এবং তাদের নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন পরবর্তী কালে করা হয় "New Economic Policy"[১] প্রবর্তন করে। পরবর্তীকালে আমরা দেখি শ্রমিকদের বিশেষ দক্ষতার জন্য বিশেষ পুরস্কার দেবার বন্দোবস্ত হয় ('incentive

১। Morris Dobb—Soviet Economic Development Since 1917

wage') এবং মজুরী পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে হ'লেও ব্যক্তিগত সৃজনী শক্তির উদ্বোধন ও উদ্যম আনয়নের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়েছে।

অতএব আমরা দেখছি যে বিবেকানন্দের 'একত্বে বৈচিত্র্য' ও বিশেষ 'সুবিধাতত্ত্ব' সমাজতন্ত্রবাদের ধারণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনা, তাতে সমাজতন্ত্রবাদ আরও পূর্ণাবয়বত্ব লাভ করেছে। এবং আমরা দেখলাম এই সকল তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা অদ্বৈতবাদের উপর—অন্য কোনও দর্শন এ গুলির সকল দিক, সকল অর্থ ও ইঙ্গিত এমন সুন্দরভাবে উদ্ঘাটন করে না। এই বিশেষ সুবিধা তত্ত্বের উপর সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ না হ'লে সমাজতন্ত্রবাদের বাস্তবতা ব্যহত হয়। মার্কস যে শ্রেণীবিহীন সাম্য সমাজের কথা বলেছেন, তার স্বরূপ বিশদভাবে কোথাও বর্ণনা করেন নি, ফলে অনেকেরই ধারণায় অনেক বিভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করেছে। এবং একদল অবাস্তব আদর্শবাদী আজও আছেন যাঁরা মনে করেন সকল ব্যক্তিকে একই ছাঁচে, একই চিন্তাধারায় গড়ে তুললে, মনের একই পোষাক পরালে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হ'বে। অবশ্য, সমাজ ক্ষমতাবান ও প্রতিভাবানদের জন্য, এমন মতাবলম্বী ব্যক্তি আজও একেবারেই বিরল নয়। সাম্যবাদ সম্বন্ধে বাদানুবাদ করতে গেলেই আমাদের এই চিন্তাগুলির সম্মুখীন হতেই হয়—এ মতগুলি জনসাধারণের চিন্তায় অত্যন্ত অধিক পরিমাণ স্থান অধিকার করে আছে। সেইজন্য সাম্যের প্রকৃত ধারণা, তার সুস্পষ্ট তাৎপর্য, জনমনের সামনে ধরে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

স্বামীজীর এই বিশেষ সুবিধাবাদ আমাদের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সাম্যের তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণাকে স্পষ্টতর করেছে সন্দেহ নাই। অদ্বৈত বেদান্তের প্রধান কথা—"Everyone is the embodiment of Knowledge, everyone is the embodiment of Eternal Bliss, and Eternal Existence"। অতএব ধন-বৈষম্য, বুদ্ধি-বৈষম্য, শিক্ষাবৈষম্য বা আত্মিকশক্তি-বৈষম্য হেতু

বিশেষ সুবিধা দাবী কেউই করতে পারে না। সুতরাং স্বামীজীর ভাষায়—"The work of Advaita, therefore, is to break down privileges"। অদ্বৈততত্ত্বের কাজ হ'ল বিশেষ সুবিধার অবসান ঘটানো। স্বামীজী আরও বলেছেন বর্তমান যুগে বিশেষ সুবিধার দাবী সীমাহীন হয়ে উঠেছে……"all this privilege claiming has become tremendously intensified with the extension of Knowledge." "Tremendous power is being acquired by the manufacturer of machines and other appliances and privilege is claimed to-day as it never had been claimed in the history of the world।"—জ্ঞানের বিস্তার, যন্ত্র আবিষ্কার, এক শ্রেণীর মানুষের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা এনে দিয়েছে—তারা হ'ল যন্ত্র উৎপাদক শ্রেণী। তারা অন্য সকলের সব অধিকার নিজেদের কুক্ষীগত করছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণ মানুষ এদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র হয়ে আছে,—তাদের রুচি পছন্দ সব কিছুই আজ যন্ত্র-উৎপাদকদের অঙ্গুলি হেলনে নির্ধারিত হচ্ছে। এ যুগেই অদ্বৈততত্ত্বের বিশেষ প্রয়োজন। "That is why the Vedanta wants to preach against it, to break down this tyranising over the souls of men।"

এই বিশেষ সুবিধা-তত্ত্ব স্বামীজীর সমাজতন্ত্রবাদের মূল ভিত্তি। এবং তাঁর সমাজদর্শনের অন্যতম মূলতত্ত্ব। এই বিশেষ সুবিধা অবসানের জন্য স্বামীজী চেয়েছেন যে মানুষের মধ্যে যে অনন্তশক্তিময় সত্তা সুপ্ত হয়ে আছে তার স্বীকৃতির উপর সব সমাজ, সব রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে।[১] শুধু তা নয় জীবনের অপ্রতিরোধ্য আধ্যাত্মিক প্রবণতা স্বীকার করে নিয়ে মানুষের সব স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে হবে। না হলে ব্যর্থ হবে সমাজ বিপ্লব, ব্যর্থ হবে সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, স্বাভাবিক বৈচিত্র্য ও বৈষম্য

---

১। তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অবলম্বন করে পুনরায় নূতন বিশেষ সুবিধা আবির্ভূত হবে। সব মানুষের যে এক স্বার্থ আছে—দেবত্ব বিকাশ সাধন—তাকে সমাজ জীবনে মুখ্য স্থান দিতে পারলে বিশেষ সুবিধার দাবীর স্থান পাওয়া সম্ভব নয়। অসাম্যকে প্রতিহত করবার এ একটি অবিসম্বাদী ও অমোঘ উপায়। সুতরাং প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে অদ্বৈত ভাবনা সকলের মধ্যে শিক্ষা সহায়ে বিশেষভাবে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অদ্বৈত ভাবনা, অদ্বৈত চেতনার প্রসার ব্যতীত অসাম্যকে বাধা দেবার আর কোনও উপায় নেই—'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়', এই হ'ল স্বামীজীর নির্দেশ।[১]

১। 'Vedanta and Privilege'—Complete works P. 424.

# নবম অধ্যায়

## পুরোহিত-তন্ত্র ও সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকা

"Religion goes down where priest-craft arises"
—*Vivekananda*

যে ব্যক্তি পরিকল্পনা করেছিলেন মানুষের সব স্বার্থকে আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তিনি আর যাই হোন মার্কস-এর সমগোত্রীয় সমাজতন্ত্রবাদী নন। এ বিষয়ে ডাঃ দত্তের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের গোত্র ভিন্ন, উৎস ভিন্ন এবং তা স্বতন্ত্র সুতরাং সম্পূর্ণ মৌলিক। তার ভিত্তি হ'ল আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ যা উদ্ভূত হয়েছে অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ হতে। কিন্তু তার বিস্তার ইতিহাস সহায়ে। এই ইতিহাসে ধর্মের কোন্ ভূমিকা উদ্ঘাটিত হয়েছে? সমাজদর্শনে এ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা।

সমাজ জীবনে ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কস ও বিবেকানন্দের তুলনামূলক আলোচনা করলে বিবেকানন্দের মৌলিকত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ডাঃ দত্তের অভিমত আলোচনা করতে গিয়ে মার্কসের মতের ভিত্তি কোথায় তা আমরা দেখেছি। দেখেছি যে ফয়ারবাকের কয়েকটি মন্তব্য হতে মার্কস-এঙ্গেলস্ সিদ্ধান্ত করেছিলেন "Religious ideas are the inverted reflections of the mundane world of the time।" আমরা এও দেখেছি যে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে অনেকের মত ফয়ারবাক্ ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েই যথেষ্ট মনে করেছেন, তার যুক্তিবত্তা প্রদর্শনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন নি।

মার্কস ফয়ারবাক্‌কে অনুসরণ করেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে "Exclusively Natural Scientific Materialism is indeed the foundation of the edifice of human

knowledge"। কিন্তু এঙ্গেলসের দু'একটি মন্তব্য আমাদের ভিন্ন কথা বলে। এঙ্গেলস্ এ প্রসঙ্গে বলছেন—"The real idealism of Feuerbach becomes evident as soon as we come to his philosophy of religion and ethics. He by no means wishes to abolish religion, he wants to perfect it।"[১] তবে একথা ঠিক খ্রীষ্টধর্মের অবৈজ্ঞানিকত্ব ফয়ারবাক্ সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও এঙ্গেলসের মতে তিনি ধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন করবার কথা বলেন নি। তা শুধু নয়, এঙ্গেলস্ বলেন যে ফয়ারবাকের নিজের কথা হ'ল "The periods of human history are distinguished only by religious change"। তৎসত্ত্বেও ফয়ারবাকই "Natural Scientific Materialism" দিয়েছেন বলে মার্কস এঙ্গেলস্ বলেছেন। এই 'Natural Scientific Materialism'কে তাঁরা 'foundation of the edifice of knowledge' মনে করেছেন। এই 'edifice of knowledge' গঠন তাঁদের মতে ফয়ারবাক্ করে যান নি—"But it did not fall to Feuerbach's lot to do this", এ কাজ তাঁরা নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল বলে মনে করেছেন। তাঁরা যে উপায়ে এই 'edifice' গঠন করেছেন তা বর্ণনা প্রসঙ্গে এঙ্গেলস্ বলেছেন "We live not only in nature, but also in human society, and this also no less than nature has its history of development and its science. It has therefore a question of bringing the science of society, that is the sum total of historical and philosophical sciences, into harmony with the materialist foundation, of reconstructing it thereupon"। প্রকৃতির নিয়ম ব্যাখানে যে দার্শনিক তত্ত্ব অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জড়বাদ প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন ফয়ারবাক্ তারই ভিত্তিতে নতুন করে সমাজ-বিজ্ঞানকে গড়ে তুলেছেন তাঁরা—কারণ তাঁদের মতে প্রকৃতির ইতিহাসের অনুরূপ সমাজের

১। Engels—Feuerbach And The End of Classical German Philosophy' —Selected works of Marx And Engels—vol. 11—340

ইতিহাস। অর্থাৎ ফয়ারবাকের ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত অভিমত হতে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর দর্শনমতকে গ্রহণ করেছেন তাঁরা—সেই দর্শন-মতকে আবার সমাজ-ব্যাখ্যায় নিযুক্ত করেছেন হেগেলের লজিক অর্থাৎ ডায়ালেকটিকস বা ত্রিভঙ্গ নয় প্রণালীর সঙ্গে যুক্ত করে। বিভিন্ন দার্শনিকের মতের জোড়াতালি হ'ল মার্কসবাদ,—কারও লজিক, কারও দর্শন-তত্ত্ব একসঙ্গে জুড়ে তাঁরা নিজেদের যে মত দাঁড় করালেন তার নাম দিলেন তাঁরা—'Historical-Scientific-Materialism'। এবং এইরূপ জোড়াতালি দেওয়ার স্বপক্ষে তাঁরা কোন যুক্তি দেখান নি এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে যেকথা তাঁরা বলতে চেয়েছেন, তা হেগেলীয় ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ ব্যতীতই তাঁরা বলতে পারতেন, তার জন্য ডায়ালেক্‌টীক্‌স অপরিহার্য নয়। ডায়ালেক্‌টীক্‌সকে তাঁরা জুড়েছিলেন বস্তুবাদের সঙ্গে কতটা নিজেদের মত ব্যক্ত করবার সুবিধার্থে, কতটা সত্য আবিষ্কারের প্রয়োজনীয় যুক্তিসিদ্ধ উপায় নির্ধারণ কল্লে সে বিষয়ে সুধীজনের মনে যে সন্দেহ রয়েছে এ কথা সত্য।[১]

যাই হোক, 'Historical-Dialectical-Scientific Materialism' তত্ত্বে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁরা যে অভিমত দিলেন তা এইরূপ —"Religion arose in very primitive times from erroneous primitive conceptions of men about their own nature and external nature surrounding them", অর্থাৎ ধর্ম আদিম মানুষের নিজের ও পারিপার্শ্বিক জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে অপরিণত ধারণা হ'তে উদ্ভূত তত্ত্ব। "But the transformations which this material undergoes, spring from class relations of the people", অর্থাৎ যুগে যুগে যেটুকু বিবর্তন এর হয়েছে, তা অর্থনীতিক শ্রেণী সম্পর্ক বিবর্তনের ফল। পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্য নিয়ে এঁরা শেষ সিদ্ধান্ত দিলেন যে ধর্ম শোষক শ্রেণীর

---

১। শ্রীতারকচন্দ্র রায় তাঁর 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস'—তৃতীয় খণ্ডে বার্টাণ্ড রাসেলের অভিমত উল্লেখ করেছেন মার্কসের দার্শনিক মত আলোচনান্তে।

শোষণের যন্ত্র এবং 'opium of the people'—জনসাধারণের আত্মাকে অহিফেনের মত জড় করে রাখে। অতএব, সমাজ-জীবনে ধর্মের ভূমিকা শোষণের যন্ত্ররূপে।

কিন্তু, বিবেকানন্দ সমাজ-জীবনে ধর্মের ভূমিকাটিকে একটু অন্যরূপে দেখেছেন। তাঁর মতে—"Priest-craft is in its nature cruel and heartless. That is why religion goes down, where priest-craft arises"।[১] এখানে দেখা যাচ্ছে, স্বামীজী পুরোহিততন্ত্রকে হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার জন্য নিন্দা করেছেন। হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর কেননা, শোষণ-কার্যে সহায়তা করেছে। 'বর্তমান ভারত' পুস্তিকাতে এই শোষণ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন "রাজ্য রক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন। বৈশ্যেরা রাজার খাদ্য, তাঁহার দুগ্ধবতী গাভী।" পুরোহিতগণের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করে 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' নিবন্ধে স্বামীজী বলছেন "পুরোহিতকুলের অধিকাংশ আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হইয়াই শুধু সেই সকল ক্রিয়াকর্মের সমর্থন করিত, যেগুলির জন্য সমাজব্যবস্থায় তাহারা অপরিহার্য এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা তাহাদের প্রাপ্য।" অর্থাৎ অবশ্যই পুরোহিততন্ত্র জনগণের শোষণের যন্ত্ররূপে কাজ করেছে, ইতিহাসের নির্ভুল ইঙ্গিত তাই। যুগে যুগে কি উপায়ে পুরোহিততন্ত্র শোষণের যন্ত্ররূপে কাজ করেছে তা স্বামীজী তাঁর 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করে দেখিয়েছেন। তিনি তাতে দেখিয়েছেন যে কখন রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে, কখন তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরোহিতগণ এ কার্য আবহমান কাল ধরে সম্পন্ন করেছে। যদি এই পুরোহিত-তন্ত্রকে ধর্ম বলে মনে করা যায়, তাহ'লে তা নিশ্চয়ই শোষণের যন্ত্র। কিন্তু এই পুরোহিততন্ত্রকে বিবেকানন্দ কোনও দিনই প্রকৃত ধর্ম বলে অভিহিত করেন নি। তাঁর মত—'Religion

১। 'Vedanta and Privilege'

goes down where priest-craft arises।" পুরোহিততন্ত্রের আবির্ভাব ঘটলে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়। পুরোহিততন্ত্র হ'ল ধর্মের নামে বিশেষ সুবিধাতন্ত্র। অতএব অন্যান্য বিশেষ সুবিধার মত এই বিশেষ সুবিধারও অবসান ঘটানো একান্ত আবশ্যক। এবং অদ্বৈতবেদান্তমতে যতক্ষণ তা না ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের উদ্ভব হয় না। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মম্'—ধর্মের এই তত্ত্ব অস্বীকৃত পুরোহিত-তন্ত্রে। যারা স্বরূপতঃ অমৃতময় সেই জনসাধারণকে যতক্ষণ পুরোহিতগণ বিশ্বাস করান যে তাঁরা ব্যতীত তাদের অনন্ত নরকবাস ততক্ষণ ধর্মের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। পুরোহিততন্ত্রের সংজ্ঞাই হ'ল ধর্মের অসদ্ভাব। বেদান্তবাদী বলেন সকলেই অমৃতের সন্তান। যদি কাউকে বলা হয় তুমি নিরয়গামী, তাহ'লে সে আর অমৃতের সন্তান নয়। অর্থাৎ ধর্ম ও পুরোহিততন্ত্রে পরস্পরের অসদ্ভাব দেখা যায়।

তাছাড়া, ইতিপূর্বে আমরা একবার দেখেছি যে প্রকৃত ধর্ম হ'ল 'being and becoming' 'being divine and becoming divine'। অর্থাৎ অনুভূতি হ'ল ধর্মের প্রধান কথা। 'Religion is realisation', 'Religion is the manifestation of divinity in man'। যে সকল আচার অনুষ্ঠানকে ধর্ম বলে পুরোহিতগণ অভিহিত করেন, সেগুলি ধর্মের আঙ্গিক মাত্র, তা ধর্ম নয়।

অতএব, পুরোহিততন্ত্র ধর্মের অস্বীকৃতি—"Says Vedanta we must give up the idea of privilege, then will all religion come. Before that there is no religion at all!" এ শুধু তত্ত্বের কথা নয়, ইতিহাসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই সুস্পষ্ট ভাষায় বিবেকানন্দ বলেছেন "Priest-craft is the bane of India. They are the offspring of centuries of superstition and tyranny. Root out priest-craft first।"

এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম ও পুরোহিততন্ত্রকে পৃথক করে, উভয়ের বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা বিশদরূপে বিশ্লেষণ করে, আমাদের

সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে নতুন তথ্য ও আলোকের সন্ধান দিয়েছেন। মার্কস বলেছেন "ধর্ম শোষণ করে," বিবেকানন্দ বলছেন না "ধর্ম শোষণের অবসান ঘটায়।" যা শোষণ করে তা পুরোহিততন্ত্র, ধর্মের নামে বিশেষ সুবিধাতন্ত্র তা হ'ল প্রকৃত ধর্মের অস্বীকৃতি, যার অবসান না হ'লে প্রকৃত ধর্ম আবির্ভূত হয় না। কার্ল মার্কস এই পুরোহিততন্ত্রের ভূমিকাটিকে ঠিকই লক্ষ্য করে দেখেছেন তবে তাঁর ভ্রান্তি হ'ল এই যে তিনি ধর্ম ও পুরোহিততন্ত্রকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করেছেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস বিশ্লেষণ করলেও, সম্ভবতঃ যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ হেতু, ইতিহাসের একটি ইঙ্গিত,—সমাজ-জীবনে ধর্মের সঠিক ভূমিকা—তাঁর কাছে অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন যে "Civilisation is the manifestation of Divinity in man।" যখনই আধ্যাত্মিকতার গ্লানি অপসারিত হয়েছে, তখনই সমাজের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, আধ্যাত্মিকতার প্রসারে বিশেষ সুবিধাগুলির অপসারণ ঘটেছে, ফলে সমাজের নিম্নস্তরে সাধারণ বর্ণের লোকেদের মধ্যে আত্মিক শক্তির স্ফুরণে রুদ্ধ সৃজনীশক্তি মুক্তি পেয়েছে। বৌদ্ধযুগে 'স্ত্রীশূদ্রের মুক্তিদাতা' বুদ্ধের সাম্য-বিধানের ফলে দেখা যায় শিল্পকলা ও ঐহিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি। কি করে এ সম্ভব হ'ল সে কথা আলোচনা করতে গিয়ে একজন বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদ বলছেন—"বুদ্ধদেব শূদ্র এবং স্ত্রীজাতির মুক্তির অধিকার স্বীকার করার ফলে ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে যে বিপুল প্রাণশক্তির সঞ্চার ঘটিল, যাহার ফলে স্থাপত্যে শিল্পে ধর্মান্দোলনে সৃজনী প্রতিভার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইল, তাহা হইতেই বুঝা যায়, কতখানি সৃজনী প্রতিভা সমাজের অবজ্ঞাতস্তরে এতদিন অনাদৃত অবস্থায় চাপা পড়িয়াছিল।"[১] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃত ধর্মের দ্বারা সাম্যস্থাপনের ফলে সভ্যতার অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছিল বৌদ্ধযুগে। এ প্রসঙ্গে আমরা আরও বিশদ আলোচনা

১। শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু—হিন্দু-সমাজের গড়ন।

করব পরে। তার পূর্ব্বে মার্কস ও মার্কসপন্থীদের সিদ্ধান্তের আরও একটু আলোচনা প্রয়োজন।

মার্কস তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের গোড়ায় হেগেলের "Idealism" সমালোচনা করে তাঁর আলোচনা সুরু করেন। হেগেলের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলঃ 'Absolute Idea'-ই হ'ল সত্য এবং চিন্তা ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই। যাকে আমরা জড়জগৎ বলি, তা ও চিৎ একই পদার্থ। চিৎই জড়রূপে প্রকাশিত, এবং জড় বলে কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নাই। চিৎ ও প্রজ্ঞা এক ও অভিন্ন, অচ্ছেদ্য ন্যায়ের বন্ধনে আবদ্ধ 'ক্যাটেগরি' সমূহই প্রজ্ঞা, এবং প্রজ্ঞার মধ্যে যে গতি-শক্তি আছে যা সিলজিস্‌মের গতিশক্তি সদৃশ—সেই গতিশক্তির ফলেই জগতের উদ্ভব হয়েছে, এবং প্রজ্ঞাই অচেতন জড়, উদ্ভিদ জীবজন্তু এবং অবশেষে জীবাত্মা, মানব-সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম এবং সর্বশেষে পূর্ণ-জ্ঞানরূপ 'দর্শন'রূপে প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টি ও মানব-সমাজ এবং রাষ্ট্রের ইতিহাস অসঙ্গ আত্মারই প্রকাশ, জ্ঞানের অভিব্যক্তি অসঙ্গ আত্মারই অভিব্যক্তি, এবং পরিপূর্ণ 'দর্শনে' পূর্ণজ্ঞানরূপে অসঙ্গ আত্মার অভিব্যক্তিই প্রজ্ঞার অভিব্যক্তির শেষক্রম। হেগেলের এই মত অনুসারে মানব-সমাজের ইতিহাস অসঙ্গ প্রজ্ঞারই অভিব্যক্তির ইতিহাস। অর্থাৎ 'Absolute Idea' ইতিহাস বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আপনার পূর্ণত্বস্বরূপে পৌঁছচ্ছেন। এর মধ্যে যুক্তির যে গলদ আছে তার জন্য মার্কস একে গ্রহণ করতে পারেন নি। 'Absolute Idea' পূর্ণত্বে পৌঁচচ্ছেন, পূর্ণসত্তাই বিবর্তিত হচ্ছে, অতএব, সমাজে পূর্ণত্ব, রাষ্ট্রে পূর্ণত্ব বর্তমান—এ তত্ত্ব সত্য বলে গ্রহণ করলে সামাজিক অত্যাচার, অবিচার শোষণ, রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্পেষণ এবং রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তিত্বের বিসর্জ্জন এগুলিও সমর্থন করতে হয়। ধর্মের বিকৃতিকে ও খ্রীষ্টধর্ম্মের অবৈজ্ঞানিক অংশকেও হেগেল সমর্থন করবার প্রয়াস করেছেন। এ জন্য, যুক্তিসঙ্গত ভাবেই হেগেলের মতবাদকে মার্কস 'ideological perversion' নামে অভিহিত করেছেন। হেগেলের মত খ্রীষ্টীয় মত ও দর্শনের সঙ্গে অভিন্ন বলেই প্রথমে ফয়ারবাক তার বিরোধিতা

করে ১৮৩১ সালে বেনামে তাঁর রচনা আরম্ভ করেন। এর পর স্ট্রস বাইবেল ও খৃষ্টধর্ম্মের কঠোর সমালোচনা করে খৃষ্টের এক জীবন চরিত প্রকাশ করেন, তারও ভিত্তি ছিল হেগেলের মত। হেগেলের দর্শন ঐরূপ খ্রীষ্টীয় মতের সঙ্গে অভিন্ন বলেই এই সকল সমালোচনা উদ্ভূত হয়েছিল। এর পরই হেগেলের শিষ্যগণ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। দক্ষিণপন্থীগণ হেগেলের দর্শনের খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুকূল ব্যাখ্যার এবং বামপন্থীগণ প্রতিকূল ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ছিলেন। মধ্যপন্থীগণ হেগেলের সমস্ত মত গ্রহণ না করলেও তাঁর প্রধান মতগুলি গ্রহণ করেছিলেন এবং বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় ও খৃষ্টধর্ম্মমতের ব্যাখ্যায় সেগুলি প্রয়োগ করেছিলেন।[১] মার্কস হেগেলের 'ideological perversion' থেকে তাঁর দ্বান্দিক পদ্ধতিকে মুক্ত করে তাকে বাস্তব জগতের ক্রমবিকাশের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। মার্কসের মতে ইতিহাসের বিবর্তন দ্বান্দিক পদ্ধতিতেই হয়—'thesis, anti-thesis ও synthesis'-এর মাধ্যমে—ত্রিভঙ্গ নয় প্রণালীতেই সমাজের পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। তবে ইতিহাসে যার বিবর্তন ঘটছে সে হ'ল 'বস্তু', তা idea বা cencept নয়। Hegel বলেছিলেন "Dialetics is the self-development of the concept", মার্কসের মতে ডায়ালেকটিকস হল বস্তুর বিকাশের পদ্ধতি।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'জ্ঞান যোগ' গ্রন্থের এক জায়গায় হেগেলের মত খণ্ডন করেছেন।[২] বিবেকানন্দের মত—পূর্ণ কখনও বিকশিত হ'তে পারে না। শূন্য হ'তে কখনও কিছু সৃষ্ট হতে পারে না। অপূর্ণ হতে পূর্ণ কখনও উদ্ভূত হতে পারে না। যা বিকশিত হয় তা অপূর্ণ। প্রজ্ঞার ইতিহাসের মাধ্যমে বিকাশ,—প্রজ্ঞাই যখন পূর্ণ চিৎরূপ সত্য, তখন চিৎরূপ সত্যের অপূর্ণতাই প্রতিপাদন করে। বেদান্ত সেইজন্য

---

১। শ্রীতারকচন্দ্র রায়—পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়

২। চিৎ হ'তে জড়ও উৎপন্ন হ'তে পারে না—কারণ যা চিৎ তা জড় নয়—উভয়ের গুণ পৃথক—'অপরোক্ষ অনুভূতি'—স্বামী বিবেকানন্দ ('বাণী ও রচনা'—পৃঃ ৩০১)

বলে পূর্ণস্বরূপ আত্মা কখনও বিবর্তিত হয় না, মায়ার আবরণ হেতু জগৎ-সংসার রূপে প্রতিভাত হয়। এই মায়া অলীক বস্তু নয়, অনিত্য অপূর্ণ সংসারের বাস্তব-রূপ। অতএব, বেদান্ত মতে জগৎ-সংসার অপূর্ণ—ভাল-মন্দের, সুখ-দুঃখের, জীবন-মৃত্যুর সংমিশ্রণ। নিরবধি কালের বিবর্তনেও তা এইরূপ অপূর্ণই থাকবে। এই কারণে বেদান্তবাদী বিবেকানন্দ অপূর্ণ মায়িক সংসারের অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ও মন্দকে কখনও সমর্থনের চেষ্টা করেন নি। হেগেলের সঙ্গে তাঁর এখানেই পার্থক্য এবং বিবেকানন্দের দর্শন এইজন্য হেগেলের দর্শন অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। অনেকেই বেদান্ত ও হেগেলীয় দর্শনকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করেন, কিন্তু হেগেলীয় 'Idealism' ও অদ্বৈতবেদান্তের অনেক পার্থক্য, অদ্বৈতবেদান্তমত 'Idealism' নয়, মায়াবাদের ভিত্তি হেতু বাস্তবতা। হেগেলও বেদান্তবাদকে গ্রহণ করেন নি. বেদান্তবাদীও হেগেলকে গ্রহণ করেন না। হেগেলের মতে প্রাতিভাসিক সত্তাও সত্য, কিন্তু বেদান্ত তা মনে করেন না। আর বেদান্তবাদী বলেন যে হেগেলের মত অবাস্তব আদর্শবাদ, কারণ পূর্ণ কখনও অপূর্ণ অবস্থা হতে বিবর্তিত হতে পারে না। এবং চিৎ হতে কখনও জড় উৎপন্ন হতে পারে না,[১] কারণ 'অনস্তিত্ব' হতে কখনও 'অস্তিত্ব' উৎপন্ন হতে পারে না।

হেগেলের আদর্শবাদে ধর্মের বিকৃতিগুলি ও অবৈজ্ঞানিকত্ব সমর্থনের প্রচেষ্টা থাকায়, মার্কসের মনে স্বাভাবিকরূপেই ধর্মের সম্বন্ধে বিরোধিতা জন্ম নিয়েছে। ধর্মের বিকৃতিগুলিকে হেগেলীয় ব্যাখ্যানুসারে মার্কস প্রকৃত ধর্ম বলে মনে করে ধর্মকে মানব-জীবন হতে বর্জন করতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দ তাঁদের সৃষ্ট ভ্রান্তি নিরসন করলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে হেগেলও ভ্রান্ত, তাঁর বামপন্থী ভাবশিষ্য মার্কসও ভ্রান্ত।

মার্কসবাদীগণ হেগেলের এই ভ্রান্তমত গ্রহণ করায় নানা বিভ্রান্তির

---

১। "কার্য যদি কারণের রূপান্তর মাত্র হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে অ-জড় কিন্তু নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর হইতে কিরূপে জড় অচেতন জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে? যদি কারণ শুদ্ধ ও পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কার্য অশুদ্ধ ও অপূর্ণ হয় কি করিয়া?" ('আত্মা')

সৃষ্টি হয়েছে। যথা বর্তমানকালে অনেক মার্কসবাদী প্রমাণ করবার প্রচেষ্টা করছেন যে অদ্বৈততত্ত্ব মানুষের 'দেবত্ব' ও তার অপরোক্ষ অনুভূতির কথা বলে মানুষকে নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকতে প্রণোদিত করেছে। তাঁদের যুক্তি হ'ল এই যে যদি মানুষ মনে করে যে সে দেবস্বভাব, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী, তাহ'লে সে ভাববে তার আর অভাব কি, কোন অভিযোগের আর প্রয়োজন কি? এতে রাজন্যবর্গ ও পুরোহিতদের জনগণকে শোষণ করতে সুবিধা হয়েছে। তাঁদের আরও মত, শোষণের উদ্দেশ্যেই ক্ষত্রিয় শাসকগণ 'অদ্বৈতবাদরূপ' অহিফেন আবিষ্কার করেছিলেন উপনিষদের যুগে যখন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ভারতে কায়েমী হয়েছে।[১] কিন্তু তাঁদের এ সিদ্ধান্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ অদ্বৈত বেদান্ত কখনও কোনও মানুষকে নিশ্চেষ্ট জড় হয়ে থাকতে বলছে না। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—এই হ'ল উপনিষদের বাণী। এই সকল মতবাদীরা ভুলে যান একটা কথা—"the whole of Hindu religion is based on realisation", হতে হবে, "being divine" এই হ'ল বেদান্তের কথা। সেইজন্য হিন্দুধর্ম ঘোষণা করেছে "চরৈবেতি"[২]। যে চলে সেই মধু লাভ করে, স্বাদুফল অর্জন করে; যে শুয়ে থাকে, তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে, যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে উঠে দাঁড়ায়, চলতে আরম্ভ করে তার ভাগ্যও উন্নত হয়—এই হল হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম বাণী।[৩] এ বাণী এগিয়ে চলার বাণী, আত্মজাগরণের বাণী। তাই বিবেকানন্দ বলছেন "ধর্ম অর্থই শক্তি···আকাশের মতো সীমাহীনতা আর সমুদ্রের মতো অতল গভীরতা লাভেরই নাম ধর্ম;" বলছেন "অজ্ঞান জড়বৎ জীবন

---

১। রাহুল সাংকৃত্যায়ন রচিত 'From Volga to Ganga'তে এ তত্ত্ব নানা কাহিনীর মাধ্যমে বিস্তারিত করা হয়েছে।

২। 'চরণ বৈ মধু বিন্দতি, চরণ স্বাদুমুদুম্বরম্। সূর্যস্য পশ্য শ্রেমানং যো ন তন্দ্রয়তে, চরণ। চরৈবেতি, চরৈবেতি॥"

৩। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' রাজপুত্র রোহিত ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের কাহিনী।

যাপন অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। পরাজয়ের অপেক্ষা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যু শ্রেয়। ইহা ধর্মের মূলকথা।” “মানুষ যখনই কোনো কাজের জন্য উঠিয়া দাঁড়ায় তখনই সে সত্য সন্ধানের পথে যাত্রা সুরু করে। দুর্বল ভীরু স্বার্থপর নির্জীবের না ইহকাল, না পরকাল। তেজস্বী বীর্যবান সংযমীই ধর্মলাভের অধিকারী। হে যুবকগণ আগে নিজের উপর বিশ্বাস আনো। আত্মবিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিবে।” অতএব, প্রকৃত ধর্ম বলহীনের লভ্য নয়। প্রকৃত ধর্মের কথা আত্মবিশ্বাসী হওয়া, ‘অভীঃ’ হওয়া, এগিয়ে চলা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও শক্তির জাগরণ আনা। এ সকলই আত্মার জাগরণের অগ্নিময় বাণী। এ ধর্ম কি “opium of the people ?” এ ধর্ম হ’ল জীবনের সকল দুঃখকে, দুর্দশাকে আত্মবলে জয় করা। এ হ’ল জীবনকে জয়, সমগ্র বিশ্ব-জগৎকে জয়। প্রকৃত ধর্মের কাজ হ’ল দুর্বলতার মোহস্বপ্ন হ’তে সকলকে জাগ্রত করা, প্রত্যেকের মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে নিদ্রোত্থিত করা। সেইজন্য এ ধর্মের মূলকথা দুর্বলকে শক্তি দান, তুচ্ছকে মর্যাদাদান, নগণ্যকে অসামান্যত্ব দান,—এদের সব খর্বতা, অপূর্ণতার ঊর্দ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে সমর্থ করা। ধর্মকে যে বিভ্রান্তির জালে মার্কসবাদীগণ জড়িয়েছিলেন তাকে তা হ’তে বিবেকানন্দ মুক্তি দিয়েছেন এবং সমাজ জীবনের দিক হতে তার সত্য তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

ধর্মের এই সত্যভূমিকা মার্কসবাদীর দৃষ্টি পথে পড়ে না বলে তাঁদের ইতিহাস-ব্যাখ্যায় অনেক সময়ই তথ্যকে বিকৃত করে নিতে হয়েছে, বিশেষতঃ ভারতের ইতিহাস আলোচনায়, কারণ ভারতে সমাজ-সংস্কৃতি রূপায়ণে নানাবিধ কারণে ধর্মের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। না হ’লে তাঁরা সমাজ বিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে মার্কসের নির্দ্ধারিত ছকের সঙ্গে সত্যিকারের ইতিহাসের সঙ্গতি খুঁজে পান না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এঁদের মতে জনকরাজসভায় যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে হত্যা করবার ভয় দেখিয়ে তাকে জড়বাদ প্রতিষ্ঠা-কর্ম্ম হতে বিরত করেছিলেন এবং তার জন্য গার্গী গৃহে (?) ফিরে এসে বিলাপ

করেছেন পরিজনবর্গের (?) কাছে ; সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন পরম অত্যাচারী অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিলাসী রাজা ছিলেন।[১] কিন্তু ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব ও সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে আমরা বিবেকানন্দের যে বিশ্লেষণ পাই তাতে ইতিহাসকে বিকৃত করবার প্রয়োজন হয় না। উপনিষদের ও বেদের অন্তর্ভুক্ত, যুগ যুগ ধরে বহু শ্রুত ও বহু প্রচারিত কাহিনীগুলির সঙ্গে অলীক ঘটনার সংযোজনা করে বা তন্মধ্যে উপস্থিত আবহমান-কাল ধরে পরিচিত বিরাট চরিত্রগুলির মুখে কাল্পনিক কথা জুগিয়ে ইতিহাসের নামে অসত্য কাহিনী রচনা করবার প্রয়োজন হয় না। বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি দর্শন-সাহিত্যের বহু প্রাচীন গ্রন্থ যেমন তথ্য সরবরাহ করছে, ঠিক তেমনি অবিকৃতভাবে সেগুলি গ্রহণ করে সমাজ-বিকাশের ধারা বর্ণনা করা যায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বৈজ্ঞানিক ইতিহাস এইরূপ অবাস্তব মিথ্যা কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। ঐতিহাসিকের যে মহান দায়িত্ব রয়েছে, তাতে যথাশীঘ্র সম্ভব এ পথ তাদের পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

---

১। রাহুল সাংকৃত্যায়ণ—"From Volga to Ganga"

# দশম অধ্যায়

## ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

"প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিহিত"—
—বিবেকানন্দ

হেগেলের মত যে সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ নয়, এবং তজ্জন্য গ্রহণযোগ্য নয়, মার্কসের এ সিদ্ধান্ত ঠিক। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন অধ্যাত্মবাদের সাহায্যে, আর মার্কস করেছেন বস্তুবাদের সাহায্যে। মার্কস তারপর ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মার্কসের ব্যাখ্যা "Materialistic Interpretation of History' (ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা) নামে খ্যাতি অর্জন করেছে আর বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাকে আমরা 'Spiritualistic Interpretation of History' (ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা) আখ্যা দিতে পারি।

অনেকে বলেন ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আর নতুন কি? হেগেলের ব্যাখ্যাই তো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। কিন্তু, মনে রাখতে হ'বে হেগেল-এর 'Idealistic Interpretation of History' হতে বিবেকানন্দের এই 'Spiritualistic Interpretation of History'-র অনেক প্রভেদ। আধ্যাত্মিক কোন কিছুকেই 'Idealistic' আখ্যা দেওয়া আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। হেগেল-এর 'Absolute Idea'র বিবর্তন তত্ত্বই 'Idealistic Interpretation of History'। আর বিবেকানন্দের 'Spiritualistic Interpretation of History' অনুসারে পূর্ণ স্বরূপ সেই চিৎসত্ত্বা (ব্রহ্ম) কখনও বিবর্তিত হতে পারেন না; বিবর্তিত হলে তাতে অপূর্ণতা দোষ ঘটবে। হেগেলের মত আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে খণ্ডন করেছি, অতএব এখানে তার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বিবেকানন্দের ইতিহাস ব্যাখ্যা একটি সম্পূর্ণ মৌলিক ব্যাখ্যা এবং সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যধর্মী। বিবেকানন্দের এই 'Spiritualistic Interpretation of History' কয়েকটি মূলসূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত :

(ক) প্রথম, সমাজ জীবনে ক্রমবিকাশের লক্ষ্য উন্নতি—"Progress is its watchword"

(খ) দ্বিতীয়, উত্থান-পতনের নীতির মধ্য দিয়েই সব অগ্রগতি সম্পন্ন হয়—"No progress is in a straight line," "All progress is in successive rise and falls."

(গ) তৃতীয়, মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বভাবের প্রসারই সভ্যতা—"Civilisation is the manifestation of Divinity in man", "Civilisation is the manifestation of spirituality."

(ঘ) চতুর্থ, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের চক্রপথে ইতিহাস আবর্তিত হয়—"Materialism and Spirituality in turn prevail in Society।"

(ঙ) পঞ্চম, ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ অচ্ছেদ্য বিশ্ববিধান এবং প্রাতিভাসিক জগতের সকল পরিবর্তন এই দুয়ের মাধ্যমে ক্রমাগত বৃত্ত রচনা করে চলেছে। উত্থান-পতনের নিয়ম এই দুয়ের উপর নির্ভরশীল।

(চ) ষষ্ঠ, মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য পূরণে সমাজে দু'টি বিপরীত প্রয়াস চিরন্তন—একটি জড়বাদ ভিত্তিক, অপরটি অধ্যাত্মবাদ ভিত্তিক। বিশ্ব বিধান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, এ উভয়ই বাস্তব প্রয়াস।

এই কয়টি মূল সূত্র মার্কসবাদ ও হেগেলের মতবাদ থেকে বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের মৌলিক পার্থক্য প্রকটিত করছে।

প্রথমতঃ বেদান্ত আশার তত্ত্ব। দুঃখ হতে এর যাত্রা সুরু কিন্তু সমাপ্তি আনন্দে। অতএব বেদান্ত উন্নতিতে বিশ্বাসী। সমাজ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে যুগে যুগে, পরবর্ত্তী যুগের উন্নতি পূর্ব পূর্ব যুগের সব উন্নতিকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে চলে—এ তত্ত্ব অনেক

সমাজ-বিজ্ঞানী বলবেন অবৈজ্ঞানিক। সব উন্নতির শেষে অবনতি অবধারিত, অতএব সমাজ উন্নত হয়েছে কিনা বলা চলে না। বিবেকানন্দের অভিনবত্ব এইখানে, তিনি বলেন আমরা একই স্থানে ফিরে আসি না, বৃত্ত রচনা করতে করতে এগিয়ে চলেছি। বিবেকানন্দের প্রথম সূত্রটির সঙ্গে দ্বিতীয় সূত্রটি বিবেচনা করলে দেখব, বৈজ্ঞানিকত্ব কি সুন্দরভাবে তিনি আশ্রয় করেছেন। তিনি বলছেন উন্নতি হয় তবে সরলরেখাকারে নয়, উত্থান পতনের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাই। মার্কস তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যায় সরলরেখাকারে সমাজ উন্নতির দিকে (অর্থাৎ শ্রেণীবিহীন সাম্য সমাজের দিকে) এগিয়ে চলে বলে মনে করেন। তাঁর 'logical process of evolution' হ'ল 'dialectical process'। দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাতের মাধ্যমে সমাজ এগিয়ে চলে সোজা। বর্তমানে সোরোকিন[১] প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানী মার্কস-এর এই 'principle of linear progress'কে অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণ করেছেন। কারণ, তাঁদের মতে তর্কশাস্ত্রের বিধি হ'ল এই যে, উন্নতি থাকলে অবনতি থাকবেই, ক্রমবিকাশ থাকলে ক্রমসঙ্কোচ থাকবেই আর বিবর্তন বা evolution থাকলে পুনর্গুপ্তি (অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্তি) বা involution থাকবেই। মার্কস-এর ত্রিভঙ্গ নয় প্রণালীতে যেমন thesis, antithesis, synthesis অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধযুক্ত পদ্ধতি, তেমনি এগুলি। বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এ তত্ত্বের প্রথম স্ফুরণ হয়। যথা মহাভারতকার বলছেন—

> "সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তা সমুচ্ছ্রয়াঃ।
> সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্" (স্ত্রীপর্ব)

—"সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়"। মানব জীবনের একটি মূল সত্য এই উন্নতি-অবনতি তত্ত্ব। এ কথা মায়াবাদেরও মূল কথা।

১। Pitirim Sorokin—"Social and Cultural Dynamics"—Chapter on the 'Theory of Rhythm'

অতএব, মানব জীবনের এই মূল তত্ত্বটি ইতিহাসে যেভাবে প্রকটিত তা বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন এবং সমাজ বিবর্তনে তাঁর 'তরঙ্গাকারে পরিবর্তন তত্ত্ব' বিবৃত করেছিলেন। যে তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে সমাজের বুকে, তা আবার নীচু হয়ে মিলিয়ে যায়, পুনর্বার নূতন তরঙ্গ আসে—এইভাবে উত্থান এবং পতনের ধারায় সমাজ অগ্রগতির পথে ছুটে চলেছে।

সমাজ-জীবনের উন্নতি যে একটি সরলরেখার আকারে সম্ভব নয়—এ সিদ্ধান্ত শুধু বিবেকানন্দের নয়—এ মত পোষণ করেন অনেক প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী।[১] যথা সোরোকিনের মতেও ঢেউয়ের আকারে সমাজের বিকাশপথটি রেখায়িত। দেখা যায় উনিশ শতকের উন্নতি তত্ত্ববিদ্‌গণের অনেকেই মার্কসের মত সরলরেখার উন্নতি তত্ত্বে বিশ্বাসী। এর কারণ এরা তখন অনতিদীর্ঘকাল পূর্বে আবিস্কৃত ডারউইনের জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অতি মাত্রায়। সমাজকে তাঁরা জীবদেহের অনুরূপ মনে করেছেন। ডারউইনের মতে প্রাণিজগতের ক্রমবিকাশ সরলরেখায় উন্নতির পথে পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়ে এগিয়ে চলেছে। এজন্য এঁরা সরলরেখায় সমাজ-বিকাশের ধারা দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

এঁরা যে এইরূপ ভ্রান্তমত প্রকাশ করেন তার আরও কারণ এই যে—কোন একটি বিশেষ সমাজ সংস্কৃতির স্তরে (Ideational, Idealistic অথবা Sensate স্তরে) সমাজ জীবনের বিভিন্ন শাখায় সরলরেখাকারে বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু, এ রেখা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঋজুভাবে বিস্তৃত নয়। পাশ্চাত্য সমাজ জীবনের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে দীর্ঘকালব্যাপী পরিসংখ্যান সহায়ে অনুসন্ধান করে সোরোকিন সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন "There is no slightest doubt that if the time period is not too long, there are millions of socio-cultural process with a linear trend during such a period. Quite different is the

১। Cowell—History, Civilisation and Culture. Sorokin—Social and Cultural Dynamics

situation, if the existence of a linear trend is asserted for an infinite time or for a period that factually exceeds the duration of the given linear trend. When they are considered in a longer time perspective, these linear trends are discovered to be finite and are replaced by new trends either different or opposite to previous ones"। সোরোকিন দেখিয়েছেন যে কিছুদূর পর্যন্ত যে প্রবণতাকে ঋজুরেখায় অগ্রসর হতে দেখা যাচ্ছে, কিছুকাল পরে তার ধারা বদলে যায়, সম্পূর্ণ উল্টো প্রবণতা এসে সমাজ-জীবনকে অধিকার করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সোরোকিন বলেছেন যে অতীন্দ্রিয় ভাবধারার যুগে শিল্পকলা, সাহিত্য, সব কিছুর ক্ষেত্রে দেখা যায় অতীন্দ্রিয়তার ছাপ এবং তা বেশ কিছুকাল ধরে ক্রমবিকাশের ধারায় ঋজুরেখায় বিস্তৃত হয়ে ক্রমে বিপরীত প্রবণতায় পরিণত হয়, তখন সব কিছুর মধ্যে দেখা যায় ইন্দ্রিয়ানুগতার প্রভাব। অতীন্দ্রিয়তার যুগে ধর্মই হয় সঙ্গীত-শিল্প-কলা-দর্শন-সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন, আর ইন্দ্রিয়ানুগতার যুগে ঐহিক সুখসম্ভোগই হয় এ সকলের আশ্রয়। পরিবর্তনের ধারা তাই অখণ্ড ঋজুরেখায় প্রকটিত নয়। সোরোকিন তাঁর এই তত্ত্বের নাম দিয়েছেন "Theory of Rhythm" বা "ছন্দ-প্রবাহ তত্ত্ব।"

এখন এই 'Theory of Rhythm' মানলে অতীন্দ্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়ানুগতার ক্রমিক আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 'Linear Progress' তত্ত্ব মানলে ভ্রান্ত গবেষকের মনে হতে পারে যে অধ্যাত্মবাদ প্রক্ষিপ্ত বস্তুমাত্র, কিংবা বস্তুবাদ এইরূপ প্রক্ষিপ্ত বস্তু। কিন্তু তা বাস্তব সত্য নয়। কিছু সময়ের ব্যবধানে নিয়মিতভাবে বস্তুবাদের পুনরাবির্ভাব লক্ষ্য করে সরলরেখায় উন্নতি-তত্ত্বে বিশ্বাসী মার্কসবাদী বস্তুবাদকেই একমাত্র সত্যতত্ত্ব বলে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। উপনিষদের যুগে এবং বৌদ্ধযুগে অধ্যাত্মবাদের যে প্রভাব, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা বলেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের

৮

অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই অধ্যাত্মবাদ—'অধ্যাত্মবাদ শুধু শাসকশ্রেণীর দর্শনই নয়, সেই শ্রেণীর কাছে শোষণের হাতিয়ারও'।

এই যুক্তি অনুসরণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজেই অধ্যাত্মবাদের স্থান, নিঃশ্রেণিক সমাজে তার স্থান নেই। এ কথা বলার মূলে তাঁদের উপর পুরাতাত্ত্বিক মর্গানের প্রভাব। কিন্তু আধুনিক যুগের আরও উন্নত পুরাতত্ত্ব হয়ত অন্যকথা বলে। মার্কসবাদী বলেন যে প্রাক্‌বিভক্ত আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যে ধর্মানুষ্ঠান রীতিনীতি দেখা যায় এবং যা প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে লক্ষণীয় তা বস্তুবাদী। কিন্তু ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় 'এশিয়ার ধর্মজীবন' নামক এক নিবন্ধে আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত উপস্থাপিত করে দেখিয়েছেন যে এশিয়ায় আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং চেতন-অচেতন সব বস্তু প্রাণবন্ত, এ ধারণা—যা হ'ল অধ্যাত্মবাদের সূচনা, তা পরিলক্ষিত হয়।[১] দ্বিতীয়তঃ, মার্কসবাদের প্রকল্প যদি সত্য হয় তা' হলে শ্রেণীসমাজে বস্তুবাদ থাকতে পারে না, কারণ শ্রেণীসমাজের ধর্ম হ'ল আধ্যাত্মিক মতবাদ। এ কথা ইতিহাস-সিদ্ধ নয়। উপনিষদের যুগের অবসানকালে আমরা দেখি চার্বাক মতের আবির্ভাব, অথচ সে যুগ ত' শ্রেণীবিহীন সমাজের যুগ নয়, নিদারুণ শ্রেণী-সংগ্রামের যুগ। এবং মার্কসবাদীই বলছেন যে শ্রেণীবিভক্ত ভারতীয় সমাজের এক স্তরে সহজিয়া-সাধন, তন্ত্র-মন্ত্র সাধন, মধ্যবর্তীকালের বৌদ্ধদের অধ্যাত্ম-দর্শনের প্রভাব কাটিয়ে বস্তুবাদী লোকায়ত দর্শন-চিন্তা পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষণ প্রকট করছে।[২] কিন্তু সহজিয়া মতবাদের প্রাধান্যের এ যুগও তো উৎকট শ্রেণীসংগ্রামের যুগ।[৩]

---

১। ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়—'এশিয়ার ধর্মজীবন'-'দেশ', ২৭ শে কার্ত্তিক, ১৩৬৬ সাল। এ বিষয়ে Pitirim Sorokin এর গবেষণাও লক্ষ্যনীয়।

২। শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—লোকায়ত দর্শন।

৩। বৌদ্ধধর্ম্ম যে লোকায়তিক জড়বাদী—এ মত বিবেকানন্দ তাঁর 'জ্ঞানযোগে' খণ্ডন করেছেন, 'বাণী ও রচনা'—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৩

অতএব, 'Linear Progress' তত্ত্ব অনুসরণ করে এঁরা অনৈতিহাসিক পরস্পর বিরোধী যুক্তি ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন দেখা যায়। অথচ সত্য এই যে সহজ-যানীরা এক অলৌকিক অতীন্দ্রিয় আনন্দপূর্ণ অবস্থাকেই 'সহজ' বা 'সহজানন্দ' অবস্থা বলে মনে করেছেন।[১] একে মার্কসবাদীরা শাসকশ্রেণীর চাপানো চিন্তা বলে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নেই। কারণ, বর্তমানকালের পুরাতাত্ত্বিকেরা দেখিয়েছেন যে অতীন্দ্রিয় ভাবনার স্ফুরণ প্রাক্‌বিভক্ত সমাজেও দেখা যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে পরবর্তী সমাজে মানুষের বুদ্ধি ও মননশীলতার প্রগতিতে সে ভাবনা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

আবার, 'Theory of Rhythm' অনুযায়ী দেখা যায় অধ্যাত্মবাদী শাসকশ্রেণীর দর্শনও কালক্রমে বস্তুবাদের কবলিত হয়েছে, তখন ধর্মচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়েছে ভোগের উপকরণ-সংগ্রহ। তখন সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত সবকিছুর অবলম্বন হয়েছে ইন্দ্রিয়ানুগতা এবং ধর্মদর্শন-চিন্তা ও শিল্পচর্চা ও জীবন-চর্যা এই ইন্দ্রিয়ানুগতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে দেখা যায়। উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রে এর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। রামমোহনের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা সাহিত্য এবং কবিগান, হাফ-আখড়াই সঙ্গীত প্রভৃতিতেও তার প্রমাণ মেলে।

মোটের উপর ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে সরলরেখায় উন্নতি সম্ভব নয়। সোরোকিনও গ্রীক-রোমান সংস্কৃতি নিয়ে বিপুল গবেষণা করে এ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সোরোকিন দেখিয়েছেন যে 'Creto-Mycenean culture' এর যুগ ( খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে নবম শতাব্দীতে ) চিত্রশিল্পে, সঙ্গীতে ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুগতার প্রভাবের কাল ; তার পরবর্তী গ্রীক সভ্যতার আমলে ( খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কালে ) অতীন্দ্রিয় ভাবনার প্রভাব দেখা যায়। পুনরায় কিছুকাল পরে ( খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে ) হেলেনীয় সংস্কৃতিতে

১। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী—'বাংলার সাধনা'।

ইন্দ্রিয়ানুগতার প্রভাব সুপরিস্ফুট। আধুনিক কালের ইতিহাস পর্যন্ত বিস্তারিত গবেষণার ফলে সোরোকিন এই ছন্দের প্রবাহ সম্বন্ধে দৃঢ় সমর্থন পেয়েছেন। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত বাস্তব ইতিহাসই আমাদের সরলরেখায় অগ্রগতি-তত্ত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এ তত্ত্ব যে শুধু অনৈতিহাসিক তা' নয়, এ তত্ত্বের যুক্তিগত ভিত্তিও দৃঢ় নয়। এর পেছনে যুক্তির দৌর্বল্য প্রমাণ করেছেন সোরোকিন। এ সম্পর্কে সোরোকিনেরই 'Theory of Limit' এবং 'Theory of Immanent change'—এ দুটি তত্ত্বের আলোচনা প্রয়োজন। সোরোকিন বলেন কোন উন্নতি বা অবনতি অনির্দিষ্ট কালের জন্য প্রসারিত হতে পারে না। মহাভারতের সেই তত্ত্ব আবার এসে পড়ছে—সব উন্নতির শেষে অবনতি অনিবার্য, সব বৃদ্ধিরই ক্ষয় আছে, বিশ্ববিধানে এই পরিণতি অমোঘ। সোরোকিনেরও মত সব কিছু বিকাশের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কোন কিছু বিকাশের প্রবণতা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে পারে তখনই, যখন তার উপর বহিঃস্থ অন্য কোনও প্রভাব এসে পড়বার কোন সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে সোরোকিন বলছেন—"A perpetual tendency in social process is a mere complicated form of uniform and rectilinear motion in mechanics. Newton's law tells us under what conditions this is possible. In order for such to occur there must be absolute non-interference of any exterior forces, or absolute isolation from any environmental influence is essential. Otherwise definite movement in one direction is impossible, and friction and shocks of external forces would disturb the movement and eventually change its direction. Through gravitational forces, for instance, linear movement becomes circular and eliptical."

এই যে বস্তু-জগতের অপরিহার্য নিয়ম, সমাজ জীবনেও তা

প্রযোজ্য, কারণ বিভিন্ন প্রকার বহিঃশক্তি তার গতিপথ পরিবর্তিত করে দেয়। কোন একটি সুনির্দিষ্ট বিকাশ পথের সীমা এইরূপে নিরূপিত হয়—"Social processes individually or in their totality, are not absolutely isolated from the outside Cosmological and Biological worlds, nor from the pressure of the 'social processes'. They permanently and ceaselessly interfere with each other. Unless we postulate a miracle or an active Providence, it is quite improbable that all these innumerable forces would be negligible or constant at every moment, thus maintaining the direction of the processes unchanged. Such an assumption of a perfect and eternal balance of numerous cosmic, biological and social processes is equivalent to a miracle and contrary to all probability।" বহিঃশক্তির প্রক্ষেপের জন্য কোন একটি বিশেষ ধারার বিকাশ কিছুকাল পরেই বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অন্যান্য ধারার আবির্ভাব ঘটে। এই কারণেই সব বিকাশের ধারারই সীমা আছে, সব উন্নতিরই অবসান আছে, সব অধঃপতনের শেষ আছে। এই বিশ্ববিধানের ফলে বরাবর ঋজুরেখায় কোন গতিই সম্ভব নয়, একস্থানে না একস্থানে এসে ঋজুরেখার শেষপ্রান্ত দেখা দেবে, পথ বক্রগতিতে ভিন্ন অভিমুখে চলবে।

এই বিশ্ববিধানের কথাই বিবেকানন্দ ব্যক্ত করেছেন—"Each progress is in successive rise and falls," "There is no progress without corresponding digression" ইত্যাদি উক্তিতে। "আশ্চর্যের বিষয় কখন কখন অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়, তাহার পরই আবার জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করে, যেন তরঙ্গের গতিতে একটির পর একটি আসিয়া থাকে।"[১] ইতিহাসে মানবসমাজের ক্রমবিকাশের এই ধারাকে তিনি ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন যাকে এত

১। পরমকুডী বক্তৃতা

তর্কবিধি সম্মত ও যুক্তি-সহ বলে সোরোকিন পরবর্তী কালে বিপুল গবেষণা সহায়ে প্রমাণ করেছেন।

এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিবত্তাকে অবশ্য সোরোকিনের দ্বিতীয় নীতি—'Theory of Immanent Change'—আরও সুস্পষ্ট করেছে।

সোরোকিন বলেন যে সমাজ পরিবর্তনের মূল কারণটি অন্তর্নিহিত, বহিঃস্থ নয়, যদি সমগ্র বহিঃশক্তি অপরিবর্তনীয় থাকে তাহলেও সমাজ আপন ধর্মে গতিবেগ লাভ করবে। এই অন্তর্নিহিত গতিবেগের উপর বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্গত মহাজাগতিক (cosmic), জৈবিক (biological) এবং সামাজিক ধারা (social processes) প্রক্ষিপ্ত হয়ে তার পথকে বক্রগতিসম্পন্ন করে তোলে—"In regard to any socio-cultural system, it changes by virtue of is own forces and properties. It cannot help changing, even if all its external conditions are constant. The change is thus immanent in any socio-cultural system, inherent in it and inalienable from it. It bears in itself the seeds of its change।" এই স্বাভাবিক অন্তর্নিহিত শক্তি ছাড়া অন্য কোন বহিঃশক্তি দ্বারা পরিবর্তন এই বাস্তব জীবনে সম্ভব নয়। কারণ সোরোকিনও এ বিষয়ে সচেতন যে 'যা নেই' তা থেকে 'যা আছে' তা কখনও উৎপন্ন হতে পারে না। পরিবর্তনের ফল নূতন বস্তু শূন্য হতে প্রসূত হতে পারে না, পরিবর্তিত বস্তুটির পূর্বাবস্থার অন্তর্নিহিত স্বভাব বা স্বরূপের মধ্যেই তার নবরূপকে প্রসুপ্ত থাকতে হবে। আমরা যদি এই Immanent Theoryতে না বিশ্বাস করি তাহলে সমাজ-বিবর্তনের কোনও শেষ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, এক প্রশ্ন হতে কেবল অপর একটি প্রশ্ন উদ্ভূত হয়, প্রশ্নের সমাধান আর হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক—ভারতীয় পরিবারপ্রথার স্বরূপ (গ) যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তার কারণ শিল্পবিপ্লব (খ) এবং শিল্পবিপ্লবের কারণ পাশ্চাত্য প্রভাব (ক)। প্রশ্ন হবে 'ক' এর কারণ কি? অর্থাৎ গ থেকে খ, খ থেকে ক, ক থেকে অন্য

কিছু—এই একটি আদি-অন্তহীন কার্যকারণ ধারা চলেছে, কোথাও আদি কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেইজন্য আদি কারণ যদি খুঁজে পেতে হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে কার্য ও কারণ অভিন্ন বস্তু। সুতরাং সব সম্ভাবনাকে পরিবর্তনশীল বস্তুটির মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকতে হবে। সোরোকিন সেইজন্য সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন—"Any consistent theory of externalistic change does not solve the problem, but merely postpones the solution, and then comes either to a mystry in a bad sense of this term or to the logical absurdity of pulling the proverbial rabbit out of mere nothing।" বহু পূর্বে ভারতীয় দর্শন-বেত্তাগণ একথা বলেছিলেন। সাংখ্যমতে 'অসৎ' থেকে 'সৎ' উৎপত্তি হতে পারে না। তাঁরা বলেন যে এজন্য involution বা অব্যক্ত সত্তায় সঙ্কোচন স্বীকার করবার প্রয়োজন আছে। অব্যক্ত সত্তার ব্যক্ত রূপই ক্রমবিকাশ, আবার ব্যক্ত হতে অব্যক্তে প্রত্যাবর্তন ক্রমসঙ্কোচন। কার্য যখন অব্যক্ত রূপ ধারণ করে তখন তার সব ধর্ম বীজাকারে রক্ষিত হয়। পুনরায় বিকাশের সময় সেই বীজ শাখা পল্লবিত বৃক্ষরূপে দেখা দেয়। সমাজ-বিজ্ঞানের দিক হতে এ তত্ত্বের গুরুত্ব সোরোকিন তাঁর 'Theory of Immanent Change' এ প্রমাণিত করেছেন। এ সম্পর্কে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁর 'ভারতের সাধনা' গ্রন্থে যে কথা বলেছেন তা খুবই যুক্তিযুক্ত—

"Evolution (ক্রমবিকাশ) এর সঙ্গে Involution (ক্রমসঙ্কোচ) স্বীকার না করিলে জীবতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রকৃত ব্যাখ্যা বা মীমাংসা পাওয়া সম্ভব নহে। ভারতীয় বিজ্ঞান বা পরিণামবাদ উক্ত দুইটি তত্ত্বই স্বীকার করে, সেইজন্য কালতত্ত্ব ও মানবীয় উন্নতি সম্বন্ধে উহার সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত হইতে বিলক্ষণ পৃথক" ('ভারতের সাধনা')।[১]

---

১। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত 'ভারতের সাধনা' পুস্তকখানি আজকের পাঠকসমাজের কাছে অনাদৃত, কিন্তু পুস্তকখানি সমাজতত্ত্ব বিষয়ের গবেষণামূলক মূল্যবান গ্রন্থ; স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের কোন কোন দিক সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

এই Involution তত্ত্ব ও Immanent change তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গী-সম্পর্কযুক্ত। বস্তুতঃ involution ব্যতীত immanent change সম্ভব নয়। যদি অন্তর্নিহিত কারণে একই যুগপ্রবণতা বিকশিত হয় বারে বারে, তবে তার পেছনে involution না ঘটলে প্রবণতাগুলি একই প্রবণতা হতে পারে না ; involution এর দরুণ কার্য কারণ রূপে অবস্থান করছে এবং প্রবণতাগুলি বীজাকারে সংরক্ষিত হচ্ছে।

এই অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধযুক্ত involution এবং immanent change-এর ধারণা গ্রহণ করলে economic determinism রূপ ভ্রান্ত তত্ত্বের হাত থেকে সমাজবিজ্ঞানের মুক্তি ঘটে এবং সমাজ-বিকাশের পূর্ণ সত্যরূপ আমাদের দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। এ সম্পর্কে সোরোকিনের শেষ সিদ্ধান্ত : "The above is sufficient to answer the problem of Dynamics. Why a whole integrated culture as a constellation of many cultural subsystems changes and passes from one state to another. The answer is : it and its subsystems—be they painting, sculpture, architecture, music, science, philosophy, law, religion mores, forms of social, political and economic organisation—change because each of these is a going concern and bears in itself the reason of its change।" কিন্তু, গতির কারণ অন্তর্নিহিত হ'লেও গতিবেগ ইত্যাদি অন্যান্য বাহ্যশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হ'তে পারে। এইজন্য প্রবণতাগুলি বারবার একই প্রবণতা হলেও তাদের নূতন রূপে আবির্ভাব ঘটে। সোরোকিন এ সম্পর্কে বলেছেন—"The external circumstances may accelerate or weaken the realisation of the immanent potentialities of the system and therefore of its destiny।" মোটের উপর দেখা যাচ্ছে জড়বাদের যুগেও বীজাকারে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক প্রবণতা সুপ্ত থাকে। স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে তা আবদ্ধ থাকে, কিন্তু তারাই জিনিসটাকে ধরে রাখে। আবার অতীন্দ্রিয়তার যুগে সব মানুষ অতীন্দ্রিয় ধারণা করতে পারে না, কিছু মানুষের

মধ্যে ইন্দ্রিয়ানুগতা থেকে যায় এবং পরে তাই প্রবল হয়ে উঠে অতীন্দ্রিয়তাকে হটিয়ে দেয়। অর্থাৎ কোন যুগই পূর্ণ বিকশিত হয় না। এক যুগ হতে আর একযুগের পার্থক্য এই কারণেও ঘটে, আবার বাহ্যশক্তির প্রভাবে গতিবেগের বিভিন্নতায়ও ঘটে। এক Ideational যুগ ( অতীন্দ্রিয় ভাবনার যুগ ) ঠিক ঠিক অপর Ideational যুগের অনুরূপ নয়।

বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় এই প্রকল্পটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে যে কোন বিকাশই পূর্ণ হতে পারে না, তাঁর কথা হ'ল "Perfection means infinity, and manifestation means limit।" পূর্ণ অর্থ অসীমতা, বিকাশ অর্থ সসীমতা। অর্থাৎ বিবেকানন্দের মতে ভাল-মন্দ চিরদিন সব সমাজে থাকবে, শুধু তার রূপান্তর ঘটবে; কোন অবস্থায় বহু মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটবে, কোনও অবস্থায় ঘটবে না—"There come periods in history of the human race, when, as it were, whole nations are seized with a sort of world weariness, when they find that all their plans are slipping between their fingers, that old institutions and systems are crumbling into dust, that their hopes are all blighted and everything seems to the out of joint"। সোরোকিনের মতেরই অনুরূপ বিবেকানন্দের পরবর্তী কথাগুলি "Two attempts have been made in the world to found social life; the one was upon religion, and the other upon social necessity. The one was founded upon spirituality, the other upon materialism; the one upon transcendentalism and the other upon realism."

অতএব, তরঙ্গাকারে এই যে পরিবর্তন আমরা দেখছি তা আসছে অতীন্দ্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়ানুগতার আবির্ভাবের ক্রমিক ধারায়। সেইজন্য বিবেকানন্দের তৃতীয় সূত্র হ'ল: "Materialism and Spirituality in turn prevails in society"। সোরোকিনের গবেষণা বিবেকা-

নন্দের এই মতকেই তথ্য-প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠিত করেছে। সোরোকিনের মতে সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশের তিনটি স্তর আছে—Ideational, Idealistic ও Sensate। প্রথমোক্ত স্তরে ধর্মে-কর্মে, আচার-আচরণে, শিল্পকলায়, সাহিত্য ও ইতিহাস রচনায়—সর্বত্র, অধ্যাত্মপ্রবণতার সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়, দ্বিতীয়টিতে কিছু তার মালিন্য ঘটে এবং ইন্দ্রিয়ানুগতার ছাপ কিছু পরিলক্ষিত হ'য়, আর তৃতীয়টিতে পুরোপুরি ইন্দ্রিয়ানুগ মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, সোরোকিনের 'Social and Cultural Dynamics' গ্রন্থের[১] সপ্তম অধ্যায়ে দেখা যায় যে চিত্রকলার ক্ষেত্রে Ideational যুগে অঙ্কনের বিষয়বস্তু : "God, the Virgin, The Soul, The Spirit, The Holy Ghost and other religious and mystical topics।" Sensate যুগে বিষয়বস্তু : "The empirical and visual.···In content they represent character-painting"। আর মধ্যবর্তী Idealistic যুগে—"Though the subject-matter is super-empirical, the form in which it is rendered attempts to embody some visual resemblance to what is considered to be its empirical aspects—e.g. Picture of Paradise, Inferno, The Last Judgment"।

সোরোকিন এমনি করে সাহিত্য, দর্শন, নীতিবোধ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তব দৃষ্টান্ত সহায়ে এই যুগ-বিভাগ প্রমাণিত করেছেন এবং তারপর দেখিয়েছেন যে চক্রাকারে Ideational, Idealitic ও Sensate—এই তিন যুগ ক্রমিক ধারায় আবর্তিত হয় এবং সমাজ-সংস্কৃতির গতিপথ এই চক্রপথ।

কিন্তু প্রশ্ন এই, Ideational, Idealistic এবং Sensate মাত্র এই তিনটি অবধারিত আকারেই কেন সমাজের নবরূপায়ন ঘটে? এর উত্তরে বলতে হয় যে পরিবর্তনের অনন্তরূপ সম্ভব নয়—কারণ পরিবর্তনের বিষয় হ'ল সমাজরূপ একটি বস্তুর বস্তু-সত্তা বা নিজরূপ—যার গুণ (properties) সীমাবদ্ধ। এইজন্য তার রূপ বা

১। Abridged Edition.

পরিণামকেও সীমাবদ্ধ হতে হ'বে। এ হ'ল একটি তথ্যভিত্তিক সত্য (empirical reality)। অতএব, এই স্তরগুলিকেই একের পর একে ফিরে আসতে হবে। দিন রাত্রির আবর্তনের মত এই আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের আবর্তনও অবধারিত।

সোরোকিনের মতে মার্ক্সীয় ইতিহাস ব্যাখ্যা যা জড়বাদ-ভিত্তিক তা বর্তমান Sensate যুগেরই একটি অভিব্যক্তি মাত্র। এ যুগ সম্পর্কে সোরোকিনের নিম্নলিখিত উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "Just as the mentality of the truth of faith spiritualises everything, even the inorganic material phenomena and their motions or happennings, so the mentality of the truth of senses, which by definition perceives and can perceive only the material phenomena, materialises everything, even the spiritual phenomena like the human soul"। এই যুগে আত্মাও জড়বস্তু বলে আখ্যা পায়, আর ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা আসবে না কেন? তাছাড়া, সোরোকিন অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে Sensate যুগেই শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতম হয়ে ওঠে—"The sensate society is turned towards this world, toward the improvement of economic condition as the main determinant of sensate happiness. To this purpose it devotes its chief thoughts, energy, attention and efforts. In an over-developed sensate mentality, everybody begins to fight for a maximum share of happiness and prosperity. This leads often to conflicts between sects, classes, states, provinces, unions etc., and often results in revolts, wars, class-struggles, over-taxation, which ruin security and in the long run make economic prosperity impossible"। ইন্দ্রিয়ানুগতার এই যুগে অর্থই জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং সকলেই আর্থিক উন্নতির ফলস্বরূপ ধনসম্পদে অংশ লাভের জন্য সংগ্রাম করে। ফলে বিদ্রোহ, বিপ্লব, দুর্বহ করভার

শেষপর্যন্ত আর্থিক উন্নতিকে অসম্ভব করে তোলে। সেইজন্যই পরিণামে sensate যুগের অবসান হয়, পরবর্তীকালের উপযোগী পরিবর্তন ধীরে ধীরে দেখা দেয়, ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগে অনেকেরই বিরক্তি আসে, মানুষের মূল্যবোধ বদলায়, পরিশেষে আসে আবার Ideational যুগ।

আশ্চর্য কথা সোরোকিন বিবেকানন্দের অনেক পরবর্তী সময়ের লেখক। কিন্তু মনে হয় সোরোকিন যেন বিবেকানন্দের প্রতিধ্বনি। বিবেকানন্দেরও কথা এই যে জড়বাদের প্রভাবে সভ্যতার অধঃপতন হয়।[১] বিবেকানন্দ তাঁর 'পরমকুডী' বক্তৃতায় বলছেন "আশ্চর্যের বিষয়, কখন কখন অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়, তাহার পরই আবার জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করে।......একই দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে জড়বাদ পূর্ণপ্রতাপে রাজত্ব করিতে থাকে—ধন-ঐশ্বর্য্যই গৌরবের অধিকারী হয়; যে শিক্ষায় অধিক অন্নাগমের উপায় হয়, যাহাতে অধিক সুখলাভের উপায় হয়, তাহারই আদর হইতে থাকে। ক্রমে এই অবস্থা হইতে আবার অবনতি আরম্ভ হয়। সৌভাগ্যসম্পন্ন হইলেই মানবজাতির অন্তর্নিহিত ঈর্ষাদ্বেষও প্রবল আকার ধারণ করে—পরস্পর প্রতিযোগিতা ও ঘোর নিষ্ঠুরতাই তখন যুগধর্ম হইয়া পড়ে। 'চাচা আপন বাঁচা'—ইহাই তখন সকলের মূলমন্ত্র হইয়া পড়ে। এই অবস্থা কিছুদিন চলিবার পর মানুষ চিন্তা করিতে থাকে—জীবনের সমগ্র পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত। ধর্ম সহায় না হইলে,—জড়বাদের গভীর আবর্তে ক্রমশঃ মজ্জমান পৃথিবীর সাহায্যে ধর্ম অগ্রসর না হইলে,—ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তখন মানুষ নূতন আশায় সঞ্জীবিত হইয়া নব অনুরাগে নূতন ভাবে নূতন গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য নূতন ভিত্তি

১। "জড়বাদের উপর যে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত, তাহা একবার নষ্ট হইলে আর উঠে না। একবার সেই অট্টালিকা পড়িয়া গেলে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়"—বিবেকানন্দের বাণী সংগ্রহ।

পত্তন করে। তখন ধর্মের আর এক বন্যা আসে। কালে আবার উহারও অবনতি হয়।"

ধর্মের যুগের অবসান হবার কারণ অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিবেকানন্দ। "প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন একদল লোকের অভ্যুদয় হয়, যাহারা পার্থিব ব্যাপারে বিশেষ ক্ষমতার দাবী করেন। ইহারই অব্যবহিত ফল— পুনরায় জড়বাদের দিকে প্রতিক্রিয়া।" সুতরাং ধর্মের অবসান ঘটায় বিশেষ সুবিধা এবং বিশেষ সুবিধার আবির্ভাব জড়বাদের আরম্ভ। "জড়বাদের দিকে গতি একবার আরম্ভ হইলে বিভিন্ন প্রকার শত শত বিষয়ে একচেটিয়া দাবী আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ এমন সময় আসে যখন সমগ্র জাতির শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষমতাগুলি নয় সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ক্ষমতা ও অধিকারগুলি কয়েকটি ব্যক্তির করায়ত্ত হয় এই অল্পসংখ্যক সর্বসাধারণের ঘাড়ে চড়িয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। তখন সমাজকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হয়। এই সময় জড়বাদদ্বারা বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে[১]।"

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে জড়বাদের প্রভাবেই বিশেষ সুবিধা প্রাধান্য লাভ করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুগতার প্রবণতা ধর্মকে গ্রাস করে পরিশেষে অত্যাচার শোষণ নিয়ে আসে। তখন ধর্ম আর প্রকৃত ধর্ম থাকে না। তা হয়ে দাঁড়ায় শোষণের মাধ্যম পৌরহিত্য। তখন জনগণকে জড়বাদেরই আশ্রয় নিয়ে পৌরহিত্যের নিগড় অস্বীকার করতে হয়। অতএব জড়বাদ সময়ে সময়ে সমাজ-প্রগতির সহায়তাও করে। অতএব বিবেকানন্দ যে শুধু জড়বাদের প্রভাবে সভ্যতা ধ্বংস হয় একথা বলেছেন তা নয়, জড়বাদ সময়ে সময়ে কিরূপে সমাজকে বিশ্লেষ হতে রক্ষা করে তাও দেখিয়েছেন! বিবেকানন্দের মৌলিকত্ব এখানে, দৃষ্টির গভীরতা এখানে। তিনি বারবার বলেছেন এ কথা যে ইংরেজ আমলে বস্তুবাদের প্রচার ভারতের উন্নতির বিশেষ সহায় হয়েছে। মার্কস যেমন স্বল্প বিচারে

---

১। পরমকুডী বক্তৃতা।

ধর্মকে বর্জন করলেন, বিবেকানন্দ জড়বাদের বিচারে সেরূপ করেন নি। জড়বাদের যথাযথ স্থান যা ইতিহাস নির্দেশ করছে তা এই সত্যনিষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী কখনও আপনমতের পরিপোষক হবে ভেবে অস্বীকার করেন নি, সমাজ-জীবনে তার কল্যাণপ্রদ রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এদিক দিয়ে ঐতিহাসিকের মহান কর্তব্য তিনি যে ভাবে পালন করেছেন তা বিশেষ ভাবে অনুকরণীয়। এর কারণ বিবেকানন্দ দর্শন-প্রণেতা মাত্র নন, বাস্তব কর্মী ও সত্যসন্ধ ঋষি। কাজেই সত্যপথচ্যুত তিনি হ'ন নি। এদিক থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে তিনি Idealist নন, Realist এবং Positivist, বাস্তবে সত্য যেভাবে প্রতীয়মান তিনি তাকে সে ভাবে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু, এ সত্ত্বেও তিনি নিঃসংশয় ছিলেন যে একমাত্র আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠায় সভ্যতার প্রসার সম্ভব হয়, অগ্রগতির একমাত্র পথ দেবত্বের বিকাশ। ইতিহাসে সত্যই দেখা যায় বৈদিক যুগে যে আধ্যাত্মিকতার প্লাবন এসেছিল, উপনিষদের যুগে যা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, চিন্তার যে উৎকর্ষ ঘটেছিল তখন, তা আমরা আজও অতিক্রম করতে পারি নি। ভগবান বুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষকে শিল্পে, স্থাপত্যে ও আর্থিক জীবনে উন্নতির যে স্বর্ণচূড়ায় অধিষ্ঠিত দেখেছি তা আজও আমাদের গর্বের বস্তু। বুদ্ধের পর পুনরায় ভারতবর্ষ জড়বাদের কবলিত হয় এবং তার পরই আমরা পেলাম জগতের সর্বাপেক্ষা চূড়ান্ত দুঃসাহসিক মতবাদ—মায়াবাদ, যার যুক্তিবত্তা খণ্ডন আজও কেউ করতে পারেন নি, যা বুদ্ধির উৎকর্ষের সর্বোচ্চ চূড়া বলে আজও বিবেচিত।

ইতিহাসের এই শিক্ষা থেকেই বিবেকানন্দ সিদ্ধান্ত গঠন করেছেন যে "প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিহিত, আধ্যাত্মিকতা বিলীন হইয়া বস্তুবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে এই প্রাণশক্তি শুকাইতে থাকে।" এই হ'ল তাঁর ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার শেষ সিদ্ধান্ত।

আমরা আমাদের আলোচনায় সোরোকিনের গবেষণার সাহায্য

নিয়ে দেখেছি—বিবেকানন্দের ইতিহাস ব্যাখ্যা প্রমাণিত সত্য। সোরোকিনের সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার মূলে ছিল হেগেলের দর্শনতত্ত্বের প্রভাব। কিন্তু, সোরোকিন হেগেলকে অতিক্রম করে আরও অগ্রসর হয়েছেন এবং হেগেলের দ্বান্দ্বিক মতকে 'Theory of Rhythm'এর দ্বারা খণ্ডন করেছেন। তবুও, সোরোকিনের মত সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। সোরোকিনের 'Theory of Rythm'এর ভিত্তি 'Theory of Limit' ও 'Theory of Immanent Change' যা স্বপক্ষে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও Involution তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। প্রকারান্তরে সোরোকিন একথা স্বীকার করলেও, কার্যতঃ Involution তত্ত্বের কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও বিবৃতি তাঁর মধ্যে নেই, সেই বিবৃতি আমরা পাই বিবেকানন্দের মধ্যে। সাংখ্য দর্শনের এই তত্ত্বের যে উদ্ঘাটন তিনি তার 'জগৎ—বহির্জগৎ' শীর্ষক বক্তৃতায় করেছেন তাতে সমাজদর্শনে এক নূতন আলোকসম্পাত হয়েছে। তাঁর এই তত্ত্ব সমাজ বিবর্তনের গতিক্রমকে, তার কার্যকারণ ধারাকে অতি সুস্পষ্ট করে তুলেছে। মার্কসীয় দর্শনের অসম্পূর্ণতা সোরোকিন উদ্ঘাটিত করেছেন। মার্কসের সরলরেখায় গতিক্রম সমাজের গতিপথের পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। শ্রেণীবিহীন সাম্য সমাজে নূতন antithesis কি রূপ নেবে, synthesis এর রূপই বা কি হ'বে—মার্কস এ সম্বন্ধে নীরব। তাঁর এ নীরবতা জিজ্ঞাসু মানুষের চিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। যে সমাজ-বিবর্ত্তন-তত্ত্ব সমাজের সম্পূর্ণ চিরন্তন গতিক্রম ব্যাখ্যা করতে পারে তাই গ্রহণীয়। সোরোকিনের তত্ত্ব সেই জন্যে মার্কসীয় তত্ত্বের তুলনায় অধিক গ্রহণীয় কারণ যুক্তি ও বুদ্ধির সমস্ত দাবী সম্পূর্ণ স্বীকার করে এ তত্ত্ব। সোরোকিনের এই তত্ত্বকে আবার সম্পূর্ণতা দান করেছেন বিবেকানন্দ। যদিও বিবেকানন্দ সোরোকিনের পূর্ব্বসূরী, তথাপি সোরোকিন বিবেকানন্দকে অতিক্রম করতে পারেন নি। বিবেকানন্দের তত্ত্বই সম্পূর্ণ তত্ত্ব।

# একাদশ অধ্যায়

## ইতিহাস বিবর্তনের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও স্বামী বিবেকানন্দ

"No progress is in a straight line"—*Vivekananda*

কার্ল মার্কস হেগেলের নিকট হ'তে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করে দেখিয়েছেন যে ইতিহাসের গতিক্রম এই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বা ত্রিভঙ্গ নয় প্রণালীতে বিধৃত। সম্প্রতি কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ এরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে বিবেকানন্দও এই দ্বান্দ্বিক-ত্রিভঙ্গ নয় প্রণালীতে ইতিহাসের বিবর্তন দেখিয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি মার্কসের দ্বারা প্রভাবিত। কোন একজন অধ্যাপক 'বিবেকানন্দের রাষ্ট্র-চিন্তা' শীর্ষক এক নিবন্ধে[১] মন্তব্য করছেন "ইতিহাস বিশ্লেষণে স্বামীজী স্পষ্টতঃ দ্বন্দ্বাত্মক পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষত্রিয়দের দ্বন্দ্ব প্রাচীন চিন্তাধারার বিরুদ্ধে নতুন সমাজ চেতনার দ্বন্দ্ব ; বুদ্ধ এমন কি রামকৃষ্ণের আবির্ভাবও এই দ্বন্দ্বের ফল" এবং পরিশেষে বলছেন "ইতিহাস বিশ্লেষণে স্বামীজীর উপর মার্কসীয় পদ্ধতির প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।"

আমরা দশম অধ্যায়ে দেখেছি বিবেকানন্দ বিশ্ববিধানের ক্রম-সঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ,—ব্যক্ত হতে অব্যক্ত ও অব্যক্ত হতে ব্যক্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে যে বৃত্তাকার গতিপথ তাই ইতিহাসের গতিপথ বলে নির্দেশ করেছেন। এই গতিপথে, দু'টি বিভিন্ন পরিবর্তন ধারা দেখা যায়। এক, আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের আবর্তন-বিবর্তন, আর ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র শ্রেণীর আবর্তন-বিবর্তন। এই দু'টি বিভিন্ন পরিবর্তন ধারার সম্পর্কও নির্ণয় করেছেন বিবেকানন্দ। সকল অবস্থাতেই শ্রেণী-সংগ্রাম চলেছে এবং তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যা

১। সাহিত্যের খবর—বিবেকানন্দ শ্রদ্ধাস্মরণ সংখ্যা ; 'বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তা'—অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু।

দেখাচ্ছে যে জড়বাদের আধিপত্যের চূড়ান্ত মুহূর্তে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে, অধ্যাত্মবাদের প্রসারের কালে অধ্যাত্মবাদীদের সমন্বয় চেষ্টায় শ্রেণীসংগ্রাম প্রশমিত হয়। এবং এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের শেষ সিদ্ধান্ত : সভ্যতার প্রাণশক্তি হ'ল আধ্যাত্মিকতা।

প্রথমতঃ মার্কস এই বৃত্তাকার-পরিবর্তন-পদ্ধতি স্বীকার করেন নি।

দ্বিতীয়তঃ মার্কস আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদের ক্রমিক আবর্তন স্বীকার করেন নি।

তৃতীয়তঃ মার্কস স্বীকার করেন নি যে সভ্যতার প্রাণশক্তি হ'ল আধ্যাত্মিকতা।

বিবেকানন্দ মার্কসীয় সরলরেখাকারে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিবর্তনকে অবৈজ্ঞানিক প্রতিপাদন করে বলেছেন—"আমরা ক্রমাগত সরলরেখায় উন্নতি করিয়া চলিতেছি এ কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইহা অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র"। এ বিষয়ে তাঁর গণিতশাস্ত্রের প্রমাণের উল্লেখ পূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। ডারউইনের ক্রম-বিকাশবাদের প্রভাবে সরলরেখায় উন্নতি-তত্ত্ব সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের মনে এক সময়ে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন এ তত্ত্ব অসম্পূর্ণ, ক্রমবিকাশ থাকলেই ক্রমসঙ্কোচনও থাকবেই। বর্তমানে আইনস্টাইনের চতুর্মাত্রিক সত্তার আবিষ্কারে (Time-space-continuum—দেশের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ, এই তিন মাত্রা + কাল এক মাত্রা) এ বিষয়ে নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। আইনস্টাইনের মতে এ সত্তার মধ্যে যখন জড় পদার্থ থাকে না তখন তার সাম্যাবস্থা এবং অনন্ত বিস্তৃতি, কিন্তু জড়ের আবির্ভাব ঘটলে তার আর সে বিস্তৃতি থাকে না। "যেখানে জড় পিণ্ডের অবস্থান সেখানেই তার আশেপাশের সত্তা যেন বেঁকেচুরে যায়। এবং এক গতিশীল পদার্থ যখন অপর কোন এক পদার্থজনিত এরূপ বাঁকাচোরার মধ্যে এসে পড়ে, তখন আর ঋজুভাবে চলতে পারে না, বাঁকাচোরার রীতি অনুযায়ী তার গতিপথও হয়ে পড়ে কুটিল।" সুতরাং বিবেকানন্দের মতের সমর্থনে আমরা আধুনিক

বিজ্ঞানকে পাই, মার্কসের মতের স্বপক্ষে তা পাই না। সেজন্য মার্কসের মত বিবেকানন্দ কর্তৃক সঙ্গতরূপেই বর্জিত হয়েছে।

সে যাই হোক, যে কথা অধ্যাপক মহাশয় বলতে চেয়েছেন তা হ'ল এই যে বিবেকানন্দের মতে সমাজ বিবর্তন শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চলে। শ্রেণীদ্বন্দ্ব ঘটে ঠিকই, কিন্তু সেটিই একমাত্র বিবর্তনের কারণ নয়, প্রধান কারণ আধ্যাত্মিকতার 'evolution' ও 'involution'। শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের ফলেই রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি আবির্ভূত হয়েছেন—এও বিবেকানন্দের কথা নয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের প্রকৃত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থের 'ব্রহ্ম ও জগৎ' শীর্ষক বক্তৃতায়। সেখানে তিনি বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন কি ভাবে 'আরণ্যক' বেদান্ততত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি আবির্ভূত হয়েছিলেন। বারবার জড়বাদের কবল হ'তে দেশকে রক্ষার জন্য এঁরা আবির্ভূত হয়েছেন। এবং ভারত-ইতিহাস ব্যাখ্যায় এ সিদ্ধান্তও তিনি বারবার উপস্থাপিত করেছেন যে অদ্বৈতবেদান্তের প্রচার দ্বারা ভারতবর্ষ ধ্বংস হতে রক্ষা পেয়েছে। "লোকায়ত দর্শনের প্লাবনে দেশ যখন প্লাবিত তখন," বিবেকানন্দ বলছেন, "বুদ্ধদেব আসিয়া সাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিলেন।" ভারতের ইতিহাস আলোচনা তিনি যে দু'টি নিবন্ধে[১] করেছেন সেখানেও তিনি ধর্মাচার্যগণের সমন্বয়সাধনের ফলে সমাজের সাম্যের ভিত্তিতে নব রূপায়ণ সংঘটন উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ শুধু সংঘর্ষই নয়, সমন্বয় প্রচেষ্টাও ইতিহাসে লক্ষিত হয়। এবং বিবেকানন্দের মতে শ্রেণী-সংগ্রাম ইতিহাস বিবর্তনের মুখ্য কারণ নয়, তার অবস্থা মাত্র, শ্রেণীসংগ্রাম সেই মুখ্য কারণের ধাক্কায় কখনও তীব্র হয়, কখনও ক্ষীণ হয়। দ্বন্দ্ব ছাড়া ইতিহাস নেই, ঠিক কথা। কিন্তু মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মূল প্রতিপাদ্য কথা একমাত্র শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা, পরিশেষে বিপ্লবের দ্বারা, সমাজ পরিবর্তিত হয়। বিবেকানন্দ এ কথা মেনে নেন নি। ভেদ বৈষম্য সৃষ্টির প্রয়াস ও সাম্য ও সমন্বয় প্রয়াস—

১। 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' ও 'বর্তমান ভারত'।

এই উভয়েরই মাধ্যমে ইতিহাস বিবর্তিত, এই হ'ল স্বামীজীর প্রকৃত অভিমত।

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে :

প্রথমতঃ বিবেকানন্দ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অন্তর্নিহিত যে সরল-রেখাতত্ত্ব তা গ্রহণ করেন নি।

দ্বিতীয়তঃ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অপর সিদ্ধান্ত যে একমাত্র শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের দ্বারাই সমাজের রূপান্তর ঘটে, এও তিনি মেনে নেন নি।

তৃতীয়তঃ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সিদ্ধান্ত ও বিবেকানন্দের বৃত্তাকার তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত :

(ক) বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত ধর্ম সমাজ-জীবনের বিবর্তনের সক্রিয় শক্তি, এর সাহায্যে সমাজ-সংস্কৃতি অগ্রগতির পথে চলে, মার্কস বলেন ধর্ম শ্রেণী-সমাজের ভূত, শোষণের যন্ত্র।

(খ) বিবেকানন্দের মতে ধর্ম সভ্যতার প্রাণশক্তি, মার্কস বলেন জড়বাদই সেই শক্তি।

অতএব আমরা দেখছি যে বিবেকানন্দের উপর মার্কসের প্রভাব আদৌ প্রতিফলিত নয়। তবে সম্ভবতঃ বিবেকানন্দ মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কারণ দেখা যায় স্পষ্টতঃ তিনি বৈজ্ঞানিক জড়বাদ খণ্ডন করেছেন এবং বারবার ভারতবর্ষকে সাবধান করেছেন যে যেন ধর্মের বন্যায় দেশকে প্লাবিত করার পূর্বে সমাজতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক আদর্শ সকল গ্রহণ না করা হয়।

একমাত্র শ্রেণীসংঘর্ষ ও শোষণ সম্পর্কে মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে তা তিনি মার্কস-এর নিকট হতে গ্রহণ করেছিলেন তা প্রমাণিত নয়। ভারত-ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তাঁকে এ তত্ত্ব দিয়েছিল। শূদ্র-বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখে তাকে স্বাগত জানানোও যে মার্কসের প্রভাবে পড়ে তিনি করেছেন তা নয়। কারণ আমরা দেখি দর্শন চিন্তা, পুরাতত্ত্ব অনুশীলন, ইতিহাস বিশ্লেষণ—এ সকল ব্যাপারেই মার্কসের সঙ্গে তাঁর মতের স্পষ্ট বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। সুতরাং ইতিহাস অনুশীলনই তাঁর সিদ্ধান্তের কারণ।

## দ্বাদশ অধ্যায়

### জাতীয় বৈশিষ্ট্যতত্ত্ব : ভারতের জাতীয় জীবনে ধর্মের ভূমিকা

"ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি"

—বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের অন্যতম মূলতত্ত্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্যতত্ত্ব। প্রত্যেক জাতির জীবন কোন একটি কেন্দ্রীয় শক্তিকে প্রতিফলিত করছে আবহমানকাল ধরে। তাঁর নিজের ব্যাখ্যানুসারে "আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে অনেক ঘুরিয়াছি, জগতের সম্বন্ধে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। দেখিলাম সকল জাতিরই এক একটি প্রধান আদর্শ আছে—তাহাই সে জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। রাজনীতিই কোন কোন জাতির জীবনের মূলভিত্তি; কাহারও বা সামাজিক উন্নতি কাহারও বা মানসিক উন্নতি বিধান, কাহারও বা অন্য কিছু। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—শুধু ধর্মই। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, উহারই উপর আমাদের জীবনরূপ প্রাসাদের মূলভিত্তি স্থাপিত।"[১]

অনেকের অভিমত হেগেলের প্রভাবে বিবেকানন্দ এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যতত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন। হেগেল Idealist আর বিবেকানন্দ যখন ধর্মাচার্য তখন নিশ্চয়ই Idealist—এই তাঁদের অভিমত। যেন এ একটি স্বতঃসিদ্ধ অনিবার্য বিষয়, এ মত পোষণের পশ্চাতে কোন যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। হেগেল ও বিবেকানন্দের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে তা আমরা নানাস্থলে দেখেছি। সমগ্র হেগেলীয় মতবাদকে বিবেকানন্দ একটি কঠোর মন্তব্যসহ পরিত্যাগ করেছেন—"হেগেলের মূল কথাটা এই : সেই এক নিরপেক্ষ সত্তা, বিশৃঙ্খলামাত্র; আর সাকার ব্যষ্টি উহা

১। কুম্ভকোণামে প্রদত্ত বক্তৃতা—'বাণী ও রচনা'—পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৬৬

হইতে মহত্তর। অর্থাৎ অ-জগৎ হইতে জগৎ শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ হইতে সংসার শ্রেষ্ঠ। ইহাই হেগেলের মূলকথা, সুতরাং তাঁহার মতে তুমি যতই সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিবে···ততই তুমি উন্নত হইবে।"

বিবেকানন্দ তাঁর এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যতত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন তাঁর 'ভারতে বিবেকানন্দ' শীর্ষক বক্তৃতামালায়। যথা, কলম্বো বক্তৃতায় তিনি বললেন—"ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স বা জার্মানী বা যে কোন দেশের একজন কৃষককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন—'তুমি কোন্ রাজনীতিক দলভুক্ত,' সে বলিয়া দিবে—সে উদারনৈতিক বা রক্ষণশীল দলভুক্ত এবং কাহাকেই বা ভোট দিবে। আমেরিকার কৃষক জানে সে রিপাব্লিকান না ডেমোক্রাট। এমন কি রৌপ্য সমস্যা (silver question) সম্বন্ধেও সে কিছু অবগত আছে। কিন্তু তাহার ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন, সে বলিবে, 'বিশেষ কিছুই জানি না। গীর্জায় গিয়া থাকি মাত্র।' বড় জোর সে বলিবে তাহার পিতা খ্রীষ্টধর্মের অমুক শাখাভুক্ত ছিলেন। সে জানে গীর্জায় যাওয়াই ধর্মের চূড়ান্ত।

"অপরদিকে একজন ভারতীয় কৃষককে জিজ্ঞাসা করুন 'রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু জানো কি?' সে আপনার প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া বলিবে, 'এটা আবার কি?' সোসালিজম্ প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, শ্রম ও মূলধনের সম্পর্ক এবং এইরূপ অন্যান্য কথা সে জীবনেও শোনে নাই। সে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে, রাজনীতি বা সমাজ-নীতি সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বুঝে। কিন্তু তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় 'তোমার ধর্ম কি' সে নিজের কপালের তিলক দেখাইয়া বলিবে 'আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত।' ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহার মুখ হইতে এমন দু' একটা কথা বাহির হইবে, যাহাতে আমরাও উপকৃত হইতে পারি।" অর্থাৎ ভারতের জনমানসে ধর্ম ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত—সুদীর্ঘকাল ব্যাপী জনমানসের সঙ্গে সাক্ষাৎ সান্নিধ্যহেতু বিবেকানন্দ এ তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।[1]

---

১। "নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা বলিতেছি। এই ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি" (কলম্বো বক্তৃতা)।

এছাড়া, বিবেকানন্দের এই তত্ত্বের প্রধান ভিত্তি তাঁর ইতিহাস অনুশীলন। কুম্ভকোনামে প্রদত্ত বক্তৃতায় এ বিষয়ে তাঁর ইতিহাস সমীক্ষা পাওয়া যায়—"ভালই হউক বা মন্দই হউক, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছে; শতাব্দীর পর শতাব্দী দীপ্ত স্রোতপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, দেখিতেছি, ভারতাকাশ ধর্মতত্ত্বের সাধনায় পরিব্যাপ্ত; ভালই বলো আর মন্দই বলো, আমাদের জীবনের আরম্ভ ও পরিণতি ঐ সমস্ত ধর্মাদর্শের সাধনক্ষেত্রে। ফলে ঐ সাধনা আমাদের রক্তে প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত শিরায় শিরায় উহা স্পন্দিত হইতেছে এবং আমাদের প্রকৃতির সহিত, জীবনীশক্তির সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। এই অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্মশক্তিকে স্থানচ্যুত করিতে হইলে প্রতিক্রিয়ার কি গভীর শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে ভাবিয়া দেখ! সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে মহানদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে উহা না বুজাইয়া ধর্মকে পরিত্যাগ করা চলে কি? তোমরা কি বলিতে চাও হিমতুষারালয়ে আবার ভাগীরথী ফিরিয়া যাইবে এবং পুনর্বার নূতন পথে প্রবাহিত হইবে? তাহাও যদি বা সম্ভব হয়—তবুও জানিও, আমাদের দেশের পক্ষে পরমার্থসাধনরূপ বিশেষ জীবন খাতটি পরিহার করা অসম্ভব এবং রাজনৈতিক বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি রূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে।"

ভারতের জীবনে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার এই প্রভাবের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ আমাদের সম্মুখে দু'টি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। প্রথম যুক্তি: ভারতবর্ষ বস্তুবাদী পন্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্তে দেখেছে যে সে পথ ভুল, তাতে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি কিছুই লভ্য নয়। অনেক ঠেকে, অনেক ভুলভ্রান্তি করে ভারত অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে আধ্যাত্মিকতার পথই সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ'। সেইজন্যই সে সদর্পে জগতে ঘোষণা করেছে 'ন প্রজয়া, ন ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ', ধনের দ্বারা নয়,

১। 'হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তি'।

সন্তান-উৎপাদনের দ্বারা নয়, ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হ'তে পারে। ভারতের এই স্পর্দ্ধিত প্রচারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতির পর জাতি অবতীর্ণ হয়েছে। বিবেকানন্দের ভাষায় "তাহারা সকলেই ব্যর্থ হইয়াছে, প্রাচীন জাতিসমূহ ক্ষমতা ও অর্থগৃধ্নুতার ফলে ও দুর্দশার চাপে বিলুপ্ত হইয়াছে, নূতন জাতিসমূহ পতনোন্মুখ। শান্তি অথবা যুদ্ধ, সহনশীলতা অথবা অসহিষ্ণুতা, সততা অথবা খলতা, বুদ্ধিবল অথবা বাহুবল, আধ্যাত্মিকতা অথবা ঐহিকতা এগুলির মধ্যে কোনটির জয় হইবে। সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও বাকি।"

"বহুযুগ পূর্বে আমরা এ সমস্যার সমাধান করিয়াছি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়া সেই সমাধান অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছি, শেষ পর্যন্ত ইহাই ধরিয়া রাখিতে চাই।"[১] ভারত সুপ্রাচীন দেশ, তার প্রাচীনতাই তাকে এইসকল বিভিন্ন পরীক্ষার সুযোগ দিয়েছে, পরীক্ষান্তে সুনির্দিষ্ট পথেও সে বহুকাল ধরে চলেছে। তাই তার সমাজ-জীবনের কোষে কোষে, গণ-মানসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধর্ম অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে যুগযুগান্ত ধরে। এবং তা বাস্তব অনুশীলনের বস্তু,—কর্মে, জীবন-চর্যায় প্রাণবন্ত।

দ্বিতীয় যুক্তিঃ আদিম আর্যগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হেতু ভারতীয় সংস্কৃতির উপরোক্ত কাঠামো গড়ে উঠেছে। এই আর্যজাতি বিবেকানন্দের মতে দু'টি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। "এক তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তি, দুই নির্ভীক কবিকল্পনা। এই দুইটি সমন্বিত শক্তির বলেই আর্যজাতি চিরদিন ইন্দ্রিয়স্তর হইতে অতীন্দ্রিয় স্তরের দিকে গতিশীল।"[২] আর্য-জাতির সমাজ-বিন্যাস, শিল্প-কৃতি, ধন-সম্পদ উৎপাদন "সব কিছুর পশ্চাতে এই জাতির চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সহস্র বৎসরব্যাপী সাধনা নিহিত ছিল।" "কলা-বিজ্ঞান, এমনকি প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা পর্যন্ত সব কিছু এমন ছন্দোময় ভাবধারা মণ্ডিত ছিল যে, চরম ইন্দ্রিয়ানুভূতি

---

১। 'জগতের কাছে ভারতের বাণী'।

২। "ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ"।

অতীন্দ্রিয় স্তরে উত্তীর্ণ হইত, স্থূল বাস্তবতা সূক্ষ্ম অবাস্তবতার রঙিন আভায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিত।”

এই আর্যজাতির আরও একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল। কেবলমাত্র সমস্ত কিছুর আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন নয়, বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী যা স্রোতোধারার মত ভারতে বিভিন্ন যুগে এসেছে, তাদের সমীকরণ সাধন সে করেছে। এই সমীকরণ পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠী যেভাবে সম্পন্ন করেছে, ভারতে আর্যজাতি তা করেনি। অন্যান্য দেশে বাহুবলে বলীয়ান গোষ্ঠী বিজিত গোষ্ঠীর ধর্ম-সংস্কৃতি প্রভৃতির বিলোপসাধন করে আপন ধর্ম-সংস্কৃতি তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এইরূপে বিজয়ী গোষ্ঠী নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন সহায়ে বিজিতের বৈশিষ্ট্য হরণ করেছে। কিন্তু আর্যজাতি বর্ণাশ্রমপ্রথার মাধ্যমে নিজ গোষ্ঠীভুক্ত করে নিয়ে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে আয়ত্তে এনেছিল।[১]

বিবেকানন্দের এই অভিমত আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্দের গবেষণা-লব্ধ সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত। আমরা প্রসঙ্গক্রমে ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে সমাজ-বিন্যাসের কয়েকটি মৌল উপাদান আছে, যথা—উৎপাদন-প্রণালী, ধর্মকর্ম, ধ্যান-ধারণা, শিল্পকর্ম প্রভৃতি। এই মৌল উপাদানগুলির বিশেষ বিশেষ সমাবেশকে এক একটি ‘cultural complex’ বলে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন উপাদানের বিন্যাসের ধরণও এক নয়। ক্রোয়েবার প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীদের মতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৌল উপাদানগুলির সমাবেশ ও বিন্যাসের বিভিন্নতার ফলে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাঠামো বিশিষ্ট

---

১। “তাতার, দ্রাবিড়, আদিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ক্ষণিক আভাস পাওয়া যায়; শেষে দেখা যায় ইহাদেরই শোণিতধারা, ভাষা, ধর্ম ও আচার-পদ্ধতির নির্ধারিত অংশ-সংযোগে ধীরে ধীরে আর্যদেরই অনুরূপ আর এক মহান জাতির উদ্ভব হইয়াছে, যাহারা আরও শক্তিশালী,—উদার অঙ্গীভূত করণের ফলে অধিকতর সংবদ্ধ।

“আরও দেখা যায়, এই কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী গ্রহণ-শক্তির প্রভাবে সমগ্র দেশের জনসাধারণের উপর স্বকীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ অঙ্কিত করিয়াও বিশেষ গর্বের সঙ্গে নিজেদের ‘আর্য’-পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং অপরাপর জাতিকে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াও আর্যজাতির অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠীর মধ্যে কাহাকেও গ্রহণ করিতে অসম্মত।”

রূপ গ্রহণ করে। এই যুক্তি অনুসারে প্রতিভাত যে ভারতে আদিম-যুগে ঋগ্বেদীয় আর্যজাতির মধ্যে ধর্মের প্রাধান্য থাকায় এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উপর তার ব্যপক প্রভাবের দরুন ধর্মের প্রাধান্য ভারতীয় জাতীয় জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।[১] এজন্য ভাষা, সম্প্রদায়, বংশ, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি এ সব কিছুর পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতীয় জাতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য এই ধর্ম। পাঁচ হাজার বছর ধরে এই সুবিশাল জনগোষ্ঠী এর পুষ্টিসাধন করেছে।

জগতের ইতিহাসে ভারতের এই জাতীয় ধর্মসাধনার অত্যন্ত গুরুত্ব আছে। বিবেকানন্দ তাঁর অনুপম ভাষা ও যুক্তি সহায়ে তা উদ্ঘাটিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলছেন—"শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা স্তিমিত প্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণ তেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা রাণীর মতো পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন শক্তির সাধ্য নাই এ জয়যাত্রার গতিরোধ করে·········সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্ব-প্রধান প্রেরণা ও বাণী।"

এই উক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে বিবেকানন্দের জাতীয় বৈশিষ্ট্যবাদ কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতা প্রসূত নয় এবং সঙ্কীর্ণতা প্রতিপাদনও করে না। বিভিন্ন জাতি আপন বিশেষ সাধনার দ্বারা জগতকে প্রভাবিত করে, পরস্পর আদান-প্রদানে মানব-সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়। এর মধ্যে ভারতের সাধনা পশুমানবকে দেবমানব করা। এই মহান সাধনার ধারা অব্যাহত বিভিন্ন যুগ-প্রবাহের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে। বিবেকানন্দের মতে—"ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশিরপাতের ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, অথচ

১। Kroeber লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'Configuration of Cultural Growth.'

পৃথিবীর সুন্দরতম কুসুমগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে।...যখনই তাতার, পারসীক, গ্রীক বা আরব জাতি এ দেশের সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগ সাধন করিয়াছে, তখনই এদেশ হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বন্যাস্রোতের মতো সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে।" ইংরেজ জাতির সঙ্গে সংযোগও পুনর্বার তাই ঘটিয়েছে, এই হ'ল স্বামীজীর বিশ্বাস। এর লক্ষণও স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন—"লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যেক সভ্যদেশে সেই বাণীর জন্য অপেক্ষমাণ, যে বাণী, আধুনিক যুগের অর্থোপাসনা যে ঘৃণ্য বস্তুবাদের নরকাভিমুখে তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে।" স্বামীজীর মতে বেদান্তের উচ্চতম ভাবধারাই এই সব সামাজিক আশা আকাঙ্ক্ষার অধ্যাত্ম-রূপান্তর সাধন করতে পারবে।

সেজন্য স্বামীজী সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে বেদান্তের আদর্শ কেবল ভারতবর্ষে নয়, ভারতেতর দেশেও প্রচার করতে হবে ; লেখার মধ্য দিয়ে নয়, ব্যক্তির মধ্য দিয়ে প্রত্যেক জাতির মানস-গঠনে এই চিন্তাধারা সঞ্চার করতে হবে। এবং এমনি করে বিপুল পরিবর্তনের প্রবাহ সারা ভারতে, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

এইরূপে তাঁর মত—ভবিষ্যতে ভারতের উন্নতি তার স্বকীয় পথে ঘটবে। তাঁর দৃঢ় অভিমত স্বকীয় বিকাশের পথ ভিন্ন কোন জাতির উন্নতির অন্য পথ নাই। সেজন্যই তিনি ঘোষণা করলেন—"ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে, চৈতন্যের শক্তিতে, বিনাশের বিজয় পতাকা লইয়া নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া সন্ন্যাসীর বেশ-সহায়ে। অর্থের শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে।"[১]

উপরোক্ত আলোচনায় পরিস্ফুট যে এই বিশেষ 'জাতীয় বৈশিষ্ট্য-তত্ত্ব' সমাজতন্ত্রবাদে বিবেকানন্দের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং এ তত্ত্ব তথ্যভিত্তিক ও ইতিহাস-সম্মত এবং আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীদের গবেষণা দ্বারা সমর্থিত।

১। 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি।'

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## শ্রেণীবিন্যাস ও যুগ-আবর্তন : মার্কস ও বিবেকানন্দ

"মানব-সমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটি শ্রেণী দ্বারা শাসিত হয়"

—বিবেকানন্দ

আমরা একাদশ অধ্যায়ের আলোচনায় দেখেছি যে ইতিহাস-বিবর্তন-তত্ত্বে বিবেকানন্দ শ্রেণীসংগ্রামকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। মানবজাতির ইতিহাস বহুলাংশে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, যদিও বিবেকানন্দের মতে ইতিহাস-বিবর্তনে এটাই প্রধান কথা নয়। মানুষের দেবত্ব বিকাশের প্রয়াসই ইতিহাসের মুখ্য কথা,—বারবার জড়বাদের উপর আধ্যাত্মিকতার আধিপত্য স্থাপনই গুরুত্বপূর্ণ কথা। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামও ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বাস্তব সত্য। এই শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্রতম হয়ে ওঠে জড়বাদের প্রাধান্যের যুগে, এবং উপশমিত হয় অধ্যাত্মবাদের প্রাধান্যের যুগে। এইরূপে দেখা যায় যে শ্রেণী-সংগ্রাম ইতিহাস বিবর্তনের অন্যতম মূলতত্ত্ব।

এই শ্রেণী-সংগ্রামকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন মার্কস, তাঁর ইতিহাস-বিবর্তন-তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে শ্রেণী-সংগ্রাম নির্ভর। মার্কস-এর শ্রেণীর ধারণা সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক ধারণা। উৎপাদক শ্রেণী ও মালিক শ্রেণী এই দুইটি হ'ল তাঁর মতে মৌলিক শ্রেণী। অবশ্য মধ্যবর্ত্তী আরও দু'একটি শ্রেণীর উল্লেখ মার্কস করেছেন, তার মধ্যে স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় প্রকার শ্রেণীই বিদ্যমান। মিশ্র শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য করণিক শ্রেণী, অস্থায়ী শ্রেণীর মধ্যে মুখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা শিল্পায়নের প্রভাবে ক্রমশঃই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। মার্কসের শ্রেণী-বিভাগ কর্মবিভাগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এবং সমাজের বিবর্তন উৎপাদন কুশলতার পরিবর্তনে আসে, কিন্তু পরিবর্তনের মাধ্যম শ্রেণীসজ্ঘর্ষ। মার্কসের মতে : যারা শারীরিক শ্রমদান করে তারা

অতিরিক্ত মূল্য ( Surplus Value ) উৎপন্ন করে—এই অতিরিক্ত মূল্য তাদের ভোগব্যবহারের পরিমাণের অতিরিক্ত। সেই অতিরিক্ত মূল্যের বণ্টন শ্রেণীদ্বন্দ্বের কারণ—প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রেণীমনোভাব ও বিশেষ মানসিকতা এই দ্বন্দ্বের ফলে জন্ম লাভ করে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে বর্তমানে কোন কোনও ব্যক্তি মনে করেন যে বিবেকানন্দের শ্রেণীসংগ্রামবাদ মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামবাদের দ্বারা প্রভাবিত।[১] সেজন্য বিবেকানন্দের 'শ্রেণীর' ধারণা এবং 'শ্রেণী বিন্যাসের' বিশ্লেষণ আলোচনা করে যথাযথ বিচার করবার প্রয়াস আমরা এখানে করছি।

বিবেকানন্দ ইতিহাস বিশ্লেষণ করে আবহমানকাল ধরে সমাজে চারটি মৌলিক শ্রেণী দেখতে পেয়েছেন, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিও কর্মবিভাগ। এই কর্মবিভাগের ভিত্তিতেও অর্থনৈতিক কর্মবিভাগই বর্তমান। কিন্তু মার্কসের সঙ্গে পার্থক্য এই যে এখানে শারীরিক শ্রম-দানকারীকেই একমাত্র উৎপাদক শ্রেণী বলে মনে করা হয় নি। ব্রাহ্মণের বৃত্তি অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও যজন-যাজন, ক্ষত্রিয়ের দেশ-শাসন, বৈশ্যের উৎপাদন পরিচালনা, আর শূদ্রের কায়িক শ্রমদান। মার্কসের ধারণার ভিত্তি আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের দ্বারা পরিত্যক্ত শ্রম-মূল্য নীতি। সেইজন্য কায়িক শ্রমদানকারীকেই তিনি একমাত্র মূল্য-উৎপাদক বলে মনে করেছেন। শুধু তাই নয়, স্থূল দ্রব্য-সমষ্টিকেই একমাত্র উৎপন্ন দ্রব্য বলে তিনি বিবেচনা করেছেন। কিন্তু আধুনিক মতে অধ্যাপনা-কর্ম যে সেবা প্রবাহের সৃষ্টি করে, তারও অর্থ-মূল্য আছে এবং তাও জাতীয় আয়সমষ্টির অন্তর্গত। বিবেকানন্দের ধারণা সর্বপ্রকার সামাজিক কর্মই মূল্য-উৎপাদক এবং এই উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকৃতির অবদানকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—এক, বিদ্যানুশীলন ও প্রচার; দুই, সমাজ-ব্যবস্থার পরিচালনা, তিন, ধনোৎপাদন পরিচালনা ও চার, ধনোৎপাদনে শ্রমদান। মার্কস শেষোক্ত দুই প্রকার কর্মের ভিত্তিতে দু'টি মৌলিক

১। একাদশ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর অভিমত দ্রষ্টব্য।

শ্রেণীকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, প্রথম দু'টিকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু বিচার এবং বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায় যে উপরোক্ত প্রথম দু'টি শ্রেণী মানসিকতা ও কর্মের প্রকৃতির প্রভেদের দরুণ সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণী। বিবেকানন্দ সেইজন্য চারটি শ্রেণীই মৌলিক বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং শ্রেণীর ধারণার দিক হতে মার্কস ও বিবেকানন্দের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ বিবেকানন্দের মত ইতিহাসে এই চারটি শ্রেণীর ক্রমিক প্রাধান্য দেখা গিয়েছে এবং এই শ্রেণী প্রাধান্যের ভিত্তিতেই ইতিহাসের স্তর বিভাগ করা যায়। সর্বপ্রথম হ'ল ব্রাহ্মণ যুগ, তারপর ক্ষত্রিয় যুগ, তৃতীয় বৈশ্য যুগ, চতুর্থ শূদ্রযুগ। এবং এ চারটি যুগ একটি চক্রপথে ক্রমান্বয়ে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ আগামী শূদ্র যুগের পরে পুনর্বার ব্রাহ্মণ যুগ আসবে।

ইতিহাস পরিক্রমা করে বিবেকানন্দ এই চারটি যুগের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ, লক্ষণ নির্ণয় ও গুণাগুণ বিচার করেছেন।[১] প্রথম ব্রাহ্মণ যুগ : "এই ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের যুগে বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান, দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহুত হয়ে পানভোজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। মানববলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহপ্রার্থী। তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদই সর্বশ্রেষ্ঠ কর।" ব্রাহ্মণ যুগে পুরোহিত-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে স্বাভাবিক নিয়মে। যখনই আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে বিশেষ সুবিধার দাবী এসে পড়ে, এবং আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে পড়ে, তখনই পুরোহিতগণ প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের আদর্শচ্যুত হয়ে ঐহিক লাভালাভকে বড় করে ধরেন। এই যুগে রাজশক্তির স্থান সমাজে গৌণ, অধ্যাত্ম-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির সম্মান আগে, এই ধারণা হতেই তার বিকৃত ধারণা যে পুরোহিতের স্থান

---

১। শ্রেণীসংগ্রামবাদের বিশ্লেষণ বিবেকানন্দ করেছেন তাঁর 'বর্তমান ভারত' ও 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধদ্বয়ে। এখানে এই দুইটি প্রবন্ধ হতেই প্রায় সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হ'ল।

আগে—এ তত্ত্ব এসে পড়ে। ব্রাহ্মণত্ব তখন আর আদর্শ নয়, বংশগত জাতিত্ব। পুরোহিতগণ আপন ঐহিক স্বার্থকেই প্রাধান্য দেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ সুস্পষ্ট ভাষায় বলছেন—"পুরোহিত-কুলের অধিকাংশ আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হইয়াই শুধু সেই সকল ক্রিয়াকর্মকে সমর্থন করিত যেগুলির জন্য সমাজ-ব্যবস্থায় তাহারা অপরিহার্য এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা তাহাদের প্রাপ্য"। পুরোহিতগণের সমাজে এই প্রাধান্য, যার কাছে এমন কি রাজশক্তিরও মাথা নত, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন ..."কখনও বিভীষিকাময় আদেশ, কখনও সহৃদয় মন্ত্রণা কখনও কৌশলময় নীতিজাল বিস্তার রাজশক্তিকে অনেক সময়ই পুরোহিত-কুলের নির্দেশবর্তী করিয়াছে।" তা শুধু নয়, "সকলের উপর ভয় পিতৃপুরুষের নাম, নিজের যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন।" রাজশক্তির উপর এই আধিপত্য এমনই সর্বাঙ্গীন ছিল যে "পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন।" বিবেকানন্দের শ্রেণীবাদের প্রধান বক্তব্য মুখ্য শ্রেণী কর্তৃক প্রজাপুঞ্জের শোষণ।

এই যুগের মূল্য বিচার করতে গিয়ে বিবেকানন্দ এর কয়েকটি গুণও দেখিয়েছেন—"এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়।" কারণ বিদ্যার চর্চ্চাই ব্রাহ্মণদের ক্ষমতার মূল, এরই কাছে শাসকশ্রেণী মাথা নত করে।

পরবর্তী যুগ ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের। ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের অবসান ও ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের সূচনার কারণ এ উভয় শ্রেণীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ। আবার, এই সংঘর্ষের কারণ ক্ষত্রিয় শ্রেণীর আপন ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ। এই সময়ে ক্ষত্রিয় শাসকশ্রেণীর মধ্যেও জ্ঞান চর্চা প্রসার লাভ করেছে—উপনিষদ প্রধানতঃ রাজর্ষিগণ দ্বারা আবিষ্কৃত। ফলে "যে রাজন্য শক্তি ও শৌর্যই জাতিকে রক্ষা করিত, পরিচালিত করিত এবং যাহাদের নেতৃত্ব তখন উচ্চ মনন ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহারা শুধু ক্রিয়ানুষ্ঠান-দক্ষ পুরোহিতবর্গকে

সমাজের সর্বোচ্চ স্থান ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিল না।" এই সংঘর্ষের দরুন একদল লোক বীতশ্রদ্ধ হয়ে জড়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময়ই চার্বাক দর্শনের প্রাদুর্ভাবের কাল।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে পৌরহিত্যশক্তির প্রাধান্যের অবসান হ'ল এবং রাজশক্তি প্রাধান্য পেল। বিবেকানন্দের মতে এই "ক্ষত্রিয় শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ।" কিন্তু এ যুগের গুণ ঃ "এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।"

তারপর আসে বৈশ্য শাসনের যুগ। এর পূর্ববর্তী দীর্ঘকালে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের অবিরাম সংঘর্ষ চলেছে এবং পরিশেষে যন্ত্রোৎপাদনের প্রাধান্যহেতু বৈশ্যশ্রেণী জয়লাভ করে। ভারতে এই শ্রেণীর প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠাকর্তা ইংরেজ শাসকবর্গ। এ যুগের লক্ষণ—"এর ভিতরে ভিতরে শরীর নিষ্পেষণ ও রক্ত শোষণকারী ক্ষমতা।" এ যুগের সুবিধা হ'ল এই যে "বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমন কালে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে।" তাছাড়া, "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াধিপত্যে যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার ধনের।"

সর্বশেষ যুগ শূদ্র আবির্ভাবের যুগ। বর্তমানে আমরা বৈশ্য আধিপত্যের যুগে রয়েছি। স্বামীজীর অভিমত শূদ্র যুগের সুস্পষ্ট লক্ষণসমূহ দেখা যাচ্ছে—"তাহারই পূর্বাভাস পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া আকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।" এ যুগের গুণকীর্তন স্বামীজী নানাস্থলে করেছেন। কিন্তু এইটাই স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য যে এর ত্রুটি সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সে ত্রুটি হ'ল এই যে—"এতে হয়তো সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাবে।" অতএব এ যুগকে বিবেকানন্দ আদর্শ যুগ বলে মনে করেন নি। কিন্তু তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল যে শূদ্র অভ্যুত্থান অনিবার্য

ও অপ্রতিরোধ্য। তিনি সুস্পষ্ট বলেছিলেন "শূদ্রগণের শূদ্রত্বের সহিত প্রাধান্য হইবে।"

এই আলোচনা হ'তে দেখা যায় যে শ্রেণীর ধারণা ও শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাদৃশ্য যেমন লক্ষিত হয় তেমন বৈসাদৃশ্যও লক্ষিত হয় এবং বৈসাদৃশ্যই অধিক। বিবেকানন্দের শ্রেণী-সংগ্রামের ধারণা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং তা মার্কসীয় তত্ত্বের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য বহন করে না এ আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। এই মাত্র দেখা গেল যে শূদ্র শাসনের যুগের ত্রুটি প্রদর্শন—এও সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব। কারণ মার্কস শ্রমিক শাসনকেই আদর্শ ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। শ্রেণীশাসনের যুগচক্রের ধারণাও বিবেকানন্দের মৌলিক ধারণা।

পরিশেষে বিভিন্ন যুগে শ্রেণীবিন্যাসের ক্রম ও পন্থা সম্পর্কেও মার্কস ও বিবেকানন্দের ধারণার মধ্যে প্রচুর প্রভেদ দেখা যায়। মার্কসের মতে আদিম সাম্য সমাজ শ্রেণীবিহীন সমাজ, বিবেকানন্দের ধারণায় বা ইতিহাস বিশ্লেষণে এরূপ নিঃশ্রেণিক আদিম সমাজের স্বীকৃতি নেই। তাঁর মত: মানুষের যে চারটি মৌলিক কর্ম সমাজ-জীবনে দেখা যায়, তা চিরন্তন, সুতরাং কর্মভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ আবহমানকালের সব সমাজে আছে।[১] কিন্তু বিভিন্ন কালে চক্রাকারে এক একটি শ্রেণীর প্রাধান্য ঘটবে। মার্কসের শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা এই যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণী দেখা গেছে। যথা: "In the early epochs of history, we find almost everywhere complicated arrangement of society into various orders, a manifold gradation of social rank."

"In ancient Rome we have patricians and plebians, knights and slaves."

"In the Middle Ages, feudal lords, vassals, guild

---

১। পত্রাবলী দ্বিতীয় খণ্ড ৬৫ নং পত্র।

masters, journeymen apprentices, serfs ; in almost all of these classes, again subordinate gradations."

"...the epoch of the bourgeoisie possesses however this distinctive feature : it has simplified the class antagonisms. Society as a whole is more and more splitting into two great classes directly facing each other ; Bourgeoisie and Proletariat."[১]

অতএব দেখা যাচ্ছে মার্কসের মতে শ্রেণীবিন্যাস আদিতে জটিল ছিল, এখন তা অনেক সরল হয়েছে। আদিম দাস-ব্যবস্থার সমাজে দেখা যায় চারটি প্রধান শ্রেণী, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ছয়টি প্রধান শ্রেণী, আর, তাছাড়া অসংখ্য শাখা-উপশাখা লক্ষিত হয়। আর বর্তমান ধনিক সমাজে ধনিক ও শ্রমিক—মাত্র এই দুই শ্রেণী বর্তমান। পরবর্তী সমাজে থাকবে একটি মাত্র শ্রেণী—শ্রমিকসমাজ। ক্রমে শ্রেণী-বিভেদই লুপ্ত হ'বে। মার্কসের এ ধারণার কোন প্রভাব আমরা বিবেকানন্দের উপর দেখি না। কারণ বিবেকানন্দের মত শূদ্র-প্রাধান্য অন্তে পুনর্বার ব্রাহ্মণ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'বে। মহাভারতে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। পৃথিবীতে এক সময়ে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ-শ্রেণী অবস্থান করত এইরূপ যুক্তি সহায়ে বিবেকানন্দ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে আগামী যুগে শূদ্রগণের ক্রমে ব্রাহ্মণায়ণ হবে, ফলে পরিশেষে ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের পুনরাবর্তন ঘটবে। আর সকল কালের সমাজে এই চারটি শ্রেণীই দেখা যায় এবং প্রত্যেক যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর আধিপত্য ঘটে। মার্কসের মত তা নয়।

বিবেকানন্দের এ বিষয়ে আর একটি বিশিষ্ট অবদান আছে। বিবেকানন্দের মতে প্রত্যেক দেশেই যে যুগচক্রের আদিতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য হ'বে তা নয়, অন্যান্য শ্রেণীর প্রাধান্য দিয়ে যুগচক্রের আবির্ভাব ইতিহাসে দেখা যেতে পারে। প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখান যে পাশ্চাত্য দেশে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আদি পুরুষ কোন

১। 'The Communist Manifesto'—P. 1.

স্বনামখ্যাত দলপতি বা শাসক এবং এ বিষয়ে কোন কোন ব্যক্তি আজও প্রভূত গর্ব অনুভব করে থাকেন। এদের পূর্বপুরুষ ক্ষত্রিয় শাসকদের আধিপত্য হ'তে সমাজ-জীবনযাত্রা আরম্ভ করেছে, সেইজন্য এদের স্মৃতিতে আছে শাসকশ্রেণীর আভিজাত্যের ও শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট ছাপ।[১]

এইরূপে দেখা যায় যে বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্কসের শ্রেণীসংগ্রাম-তত্ত্ব অনেক দিক দিয়েই পৃথক। যদিও উভয়ের দৃষ্টিতেই ইতিহাস সমীক্ষণে শ্রেণীসংগ্রাম সমাজ-বিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তিরূপে দেখা দিয়েছে।

---

১। 'জগতের কাছে ভারতের বাণী'।

# চতুর্দশ অধ্যায়

## বিপ্লব ও ক্রান্তি ঃ
## ধর্মপ্লাবন ও রক্তাক্ত সংগ্রাম

"নিম্নস্তরস্থ মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার করিত"

—বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের মতে শুধু যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাধান্য ঘটে তা নয়, তাদের মধ্যে সংঘর্ষও চলেছে আদিকাল হ'তে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংঘর্ষের ইঙ্গিত রামায়ণে পরশুরাম কর্তৃক একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করবার রক্তাক্ত কাহিনীর মধ্যে নিহিত আছে। বৌদ্ধপ্লাবন কালেও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের মধ্যে সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের অবসানে রাজশক্তি ও পুরোহিতশক্তি হাত মিলিয়ে চলেছে দেখা যায়। ফলে তাদের সংঘর্ষ ঘটেছে শূদ্র ও প্রজাপুঞ্জের সঙ্গে, যার পরিচয় পাওয়া যায় এই সময়ে বাংলা দেশের কৈবর্ত বিদ্রোহের মধ্যে। এই শ্রেণী-সংঘর্ষ কোন কোন কালে লোকক্ষয়কারী বিপ্লবের রূপ নিয়েছে—'বর্তমান ভারত' নিবন্ধে স্বামীজী সেই অভিমতই প্রকাশ করেছেন। শূদ্রযুগের উল্লেখ করতে গিয়ে স্বামীজী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। রাশিয়ায় কিম্বা চীনে এই অভ্যুত্থান ঘটবে এবং স্যোসালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি মতবাদ তারই সূচনা, এরূপ কথা তাঁর কাছ হতে শোনা গেছে। অতএব রক্তাক্ত বিপ্লবের সম্ভাবনা স্বামীজীর ধারণায় ছিল।

কিন্তু স্বামীজী অপর এক প্রকার বিপ্লবেরও উল্লেখ করেছেন এবং এটি তাঁর মৌলিক ধারণা। ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণে তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতের সমাজজীবনে নানারূপ পরিবর্তন এসেছে ধর্মপ্লাবনের মধ্য দিয়ে। ধর্মবিপ্লবই ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের ভূমিকা গ্রহণ করে এক সমাজ-ব্যবস্থা হতে অপর সমাজ-

ব্যবস্থায় সংক্রান্তি সম্ভব করেছে। যথা 'বর্তমান ভারতে' স্বামীজী বলছেন "পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্মকাণ্ডের প্রাণনিপীড়ক ভাব হইতে সমাজকে সদাচার ও জ্ঞানমাত্রাশয় জৈন, এবং অধিকৃত জাতিদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিম্নস্তরস্থ মনুষ্য-কুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে রক্ষা করিত?" এই রূপে দেখা যায় যে শূদ্রের সামাজিক অধিকার লাভ বৌদ্ধধর্মান্দোলনের অন্যতম ফল। ধর্মান্দোলন ও সমাজ বিপ্লব এখানে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছে। সেই জন্য বিপ্লব কথাটি ধর্মান্দোলন সম্পর্কেও প্রযুক্ত করা যেতে পারে।

সকল প্রকার ধর্মান্দোলনের মধ্যে এই সকল বিপ্লব ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাকে তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনাও করেছিলেন। কারণ এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই পরে প্রধান হয়ে ওঠে এবং ধর্মের গ্লানি আনে। হয়তো তাঁর এ সম্পর্কে দু'একটি কঠোর উক্তি নাস্তিকতাপ্রিয় সমাজতন্ত্রবাদীদের উৎসাহিত করবে। তিনি বলেছেন "অর্থহীন শব্দনিচয়ের উচ্চারণে যদি সর্বকামনা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কে আর বাসনা-তৃপ্তির জন্য কষ্টসাধ্য পুরুষকারকে অবলম্বন করিবে?" কিন্তু তাঁর এ উক্তির উদ্দেশ্য শ্রেণীসংগ্রামের প্রকৃত রূপটি উদ্ঘাটন করা, প্রকৃত ধর্মকে অস্বীকার করা বা নিন্দা করা নয়। কারণ অপর এক স্থলে তিনি বলছেন, "ধর্মের নামে যত দোষারোপই করা হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে উহা ধর্মের দোষ নহে; কেবল ধর্মই কোন কালে মানুষকে উৎপীড়ন করে নাই, ডাইনীকে পুড়াইয়া মারে নাই। তাহা হইলে কে মানুষকে এই সকল নৃশংস কাজ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল? ইহা রাজনীতি, কখনও ধর্ম নহে, যদি রাজনীতি ধর্মের নাম গ্রহণ করিয়া কাজ করে তবে সে দোষ কাহার?" অর্থাৎ তিনি ধর্মের নামে প্রচারিত রাজনীতিকে নিন্দা করেছেন, ধর্মকে নয়।

বিবেকানন্দের 'শ্রেণীসংগ্রামবাদ' সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রজাপুঞ্জের বা সাধারণের যে শক্তি, তাই প্রকৃত

সামাজিক শক্তির আধার। যে শ্রেণী এই শক্তির সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, সেই শক্তিই পরাভূত হয়েছে ('বর্তমান ভারত')। তাঁর মতে সামাজিক শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জের অধিকার অস্বীকৃতি বিপ্লবের প্রধান কারণ সর্বযুগে। বিশেষ সুবিধা যখন সৃষ্ট হয় তখনই প্রজাপুঞ্জের অধিকার অস্বীকৃত হয়, এবং বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী প্রজাপুঞ্জকে শোষণ করে। এর পরিণাম বিপ্লব—এবং রক্তক্ষয়-কারী বিপ্লব। বিবেকানন্দ তাঁর 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' শীর্ষক নিবন্ধে এ সম্বন্ধে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন। সিথীয়ান আক্রমণের পরে দেখা গেল যে এই বৈদেশিক শাসকগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করছে এবং তার পরবর্তী যুগে তাদেরই সহায়ে পৌরোহিত্য-শক্তি বিশেষ ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। তার পরিণাম প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলছেন—"কখনও যুদ্ধের কোলাহল ও আর্তনাদ, কখনও ব্যাপক নরহত্যার জনশ্রুতি—সেকালের এই ছিল পরিস্থিতি।"

একমাত্র ধর্মের দ্বারাই বিনা রক্তপাতে সমাজের রূপান্তর সম্ভব। এইজন্য বিবেকানন্দ তাঁর কর্মসূচীতে বারবার বলেছেন "আগে ধর্মের প্লাবনে দেশকে প্লাবিত কর।" বলেছেন—"What I believe in is evolution।" যাঁরা বলতে চান পাশ্চাত্য social revolutionary-দের অনুসরণ করে তিনিও ভারতে রক্তাক্ত বিপ্লবের আয়োজন করতে চেয়েছেন, তাঁরা অতিশয় ভ্রান্ত। কারণ শুধু শূদ্র-অধিকার স্থাপন তাঁর কল্পনা ছিল না। তাঁর কর্মসূচীতে আমরা যে বিপ্লবের আয়োজন দেখি তা হ'ল 'আত্মিক বিপ্লব',—বন্দী মানবাত্মার সুপ্ত শক্তিসকলকে মুক্তি দেওয়ার এবং তার সত্তার পুনর্গঠনের আয়োজন। তিনি চেয়েছিলেন এবং সুস্পষ্ট দেখেওছিলেন যে "ভবিষ্যৎ ভারতে উচ্চবর্ণেরা ভূতকাল", শূদ্রগণ আধিপত্য স্থাপন করবে। কিন্তু তজ্জন্য অন্ধ, অজ্ঞ, আত্মবিস্মৃত জনগণকে সেদিকে বলপূর্বক তাড়না করবার কথা একবারও তিনি চিন্তা করেন নি। তাদের বিদ্যুৎগতিতে শিক্ষা দিতে হবে, তাদের সুপ্ত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে, তাদের বিদ্যার অধিকার, সদাচার এবং উচ্চমানবীয়

ভাবসকলের দ্বারা ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে হবে। তারপর তাদের ভাগ্য তারা স্থির করবে। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ নিরুত্তর যে তারপর তারা সশস্ত্র বিপ্লব করবে কি অন্য উপায়ে সমাজজীবনে আপনার আধিপত্য স্থাপন করবে। কিন্তু এ বিষয়ে মার্কস্‌ও নিরুত্তর, তাঁর কথা হ'ল যে 'have-not'-দের সংখ্যা যখন অত্যন্ত বেশী হ'বে এবং ধনিকদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হ'বে, তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনিকদের বিতাড়িত করে সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিতশ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করবে। এ হ'তে রক্তাক্ত বিপ্লবতত্ত্ব লেনিন ও তাঁর অনুবর্তীগণ গড়ে তোলেন। যাইহোক বিপ্লবের ভূমিকায় ধর্মের অবতরণ ও বিপ্লবের কার্যসাধন—এ তত্ত্ব আবিষ্কার স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-বিজ্ঞানে এক নূতন অবদান।

# পঞ্চদশ অধ্যায়

## শূদ্র-সংস্কৃতির রূপ ঃ
## বিবেকানন্দের অবদান

"শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে"—বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ পরবর্তী যুগকে শুধু শূদ্রবিপ্লবের ও শূদ্রশাসনের যুগ বলেই ক্ষান্ত হ'ন নি, শূদ্রবিপ্লব অপরিহার্য এবং কাম্য বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের একটি উক্তি এ বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা দেয়—"ভারতের উচ্চবর্ণেরা তোমরা ভূতকাল···। বর্তমান কালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্ছে ওটা অজীর্ণ-জনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতে তোমরা শূন্য। তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে অনেকগুলি রত্নপেটিকা আছে। এখন ইংরেজ রাজ্যে, অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালী, মুচি মেথরের মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান হ'তে, হাট থেকে, বেরুক কারখানা থেকে।"

এই উক্তিটি নানাদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু শূদ্র-অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যে তিনি এতে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তা নয়, শূদ্র অধ্যুষিত সমাজে তার সংস্কৃতি কি রূপ নেবে তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি এখানে। এবং শূদ্র-সমাজের হাতে ব্রাহ্মণ যুগের অধ্যাত্মতা, ক্ষত্রিয় যুগের শৌর্য, বৈশ্য যুগের আর্থিক উন্নতি পৌঁছে দিতে হ'বে এই তাঁর অভিমত।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে শূদ্রবিপ্লব হ'লেই সব সমস্যার সমাধান হ'বে এমন কথা তিনি বলেন নি। যেখানে বর্তমানকালীন সমাজতন্ত্রবাদ প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী বলে ঘোষণা করেছেন, সেখানেও তিনি যুক্ত করেছেন আরও একটি কথা : "I am

a socialist not because it is a perfect system but because half a loaf is better than no bread।" তা শুধু নয়, আমরা দেখেছি তিনি বিশ্বাস করতেন যে শূদ্রশাসনের যুগে সভ্যতার অধঃপতন ঘটবে, অর্থাৎ সবকিছুর মান নীচু হয়ে যাবে। সুতরাং শূদ্রশাসনের প্রতিষ্ঠাই তাঁর শেষ কথা নয়, শূদ্র-সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটানোই তাঁর উদ্দেশ্য। যে সমাজ সকলের দেবত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, যে সমাজ মানুষের সব স্বার্থকে একমাত্র আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত করবে, তাই ছিল তাঁর স্বপ্নের সমাজ। সুতরাং যে শ্রেণীবিহীন সাম্যসমাজের রূপ তাঁর ধ্যানে সর্বদা জাগ্রত ছিল তা হ'ল দেবত্বের ভিত্তিতে গঠিত সাম্যসমাজ। এই আদর্শে সাম্যসমাজ সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা ছিল তা তিনি সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত করে গিয়েছেন : "If it is possible to form a state in which the knowledge of the priest period, the culture of the military and the distributive spirit of the commercial and the ideal of equality of the last can all be kept in tact, minus their evils, it will be an ideal state।" শ্রেণীবিহীন সমাজের যে দেবরূপায়ণ তাঁর আকাঙ্ক্ষার বস্তু ছিল তাই মানব-সমাজের "আমূল রূপান্তর" সাধন করে এই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। তিনি তাই দুটি বিপ্লব একসঙ্গে কামনা করেছিলেন। এক, বিশেষ সুবিধার অবসানে শ্রেণীবিহীন সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠা (শূদ্রগণের প্রাধান্যসহ)। আর দুই, সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক বিপ্লব—সেই শ্রেণীবিহীন সাম্যসমাজের মানুষের দেবত্বের পূর্ণ উদ্বোধনের আয়োজন। সেইজন্য স্বামীজীর সমাজ-বিপ্লবের পরিকল্পনা মার্কস প্রভৃতি সমাজ-বিপ্লবীদের পরিকল্পনা হ'তে ব্যাপকতর। এ হ'ল এক আমূল রূপান্তরের পরিকল্পনা, মার্কসের মতে অর্থনৈতিক বিপ্লবেই সব সমস্যার অবসান হয়, স্বামীজীর মতে "কুবেরের ঐশ্বর্যও যদি কেউ ভারতের হাতে তুলিয়া দেয়, তবুও ধর্ম-পথ ত্যাগ করিলে ভারতের মৃত্যু অনিবার্য।" শুধু ভারত সম্পর্কেই নয় সারা পৃথিবী সম্বন্ধেই তাঁর এই মত দেখা যায়— "...যে সমাজ বা

যে জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে যত অগ্রসর, সে সমাজ ও সে জাতি তত সভ্য।" কারণ "নানা কলকারখানা করিয়া ঐহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলেই সে জাতি বিশেষ সভ্য হইয়াছে তাহা বলা চলে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে।"

অতএব আমরা দেখছি যে তাঁর মতে প্রথম যে বিপ্লব হ'বে তাতে "শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার বলবীর্য প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রের ধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে" (বর্তমান ভারত)। কিন্তু শূদ্র ধর্মকর্ম সহ শূদ্রের অভ্যুত্থান শ্রেণীসমাজের বিকাশের শেষ পর্যায় নয়, সমাজ-বিপ্লবের শেষ স্তর নয়। শূদ্রের ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়নই শেষ পর্যায়। ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ তিনি ব্যাখ্যা করে বলছেন—"ব্রাহ্মণ স্বার্থহীন, সম্পদহীন, একমাত্র নৈতিক নিয়ম ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার শাসন ও অনুশাসনের উর্ধ্বে।" মহাভারতের সাক্ষ্যে তিনি এ তত্ত্ব পেয়েছিলেন যে আদিযুগে কেবলমাত্র একটি বর্ণ ছিল, তা হ'ল ব্রাহ্মণ, তারপর অধঃপতন ঘটে তাদের, যার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। যুগচক্রের পরিবর্তনের ধর্ম অনুসারে পুনরায় শ্রেণীবিহীন ব্রাহ্মণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হ'বে।। শুধুমাত্র শূদ্র অভ্যুত্থানের কথা নয়, শুধুমাত্র শূদ্র বিপ্লবের ক্ষেত্র রাশিয়া চীনের উল্লেখ নয়, শূদ্রত্ব সহ শূদ্র সংস্কৃতির কথা নয়, স্বামীজী এও ঘোষণা করেছিলেন যে ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে পুনর্গঠিত মহান সমাজ আবার আসছে, তার লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হচ্ছে—"We read in the Mahabharata that the whole world was in the beginning peopled with Brahmanas, and that as they began to degenerate they became divided into different castes, and that when the cycle turns round they will go back to the Brahminical origin. This cycle is turning round, and I draw your attention to it।" সেইজন্যই বিশেষ করে তাঁর কর্মপন্থায়

দ্বিতীয় অভিনব বিপ্লব সংগঠনের প্রয়াস প্রধান স্থান পেয়েছে—"The command is the same to you all, that you must make progress without stopping, and that from the highest man to the lowest pariah every-one in this country has to try and become the ideal Brahmana।"[১] যুগ যুগ ধরে শূদ্রগণকে শুধু ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়, সর্বপ্রকার শিক্ষাদীক্ষার অধিকার হ'তেও বঞ্চিত করা হয়েছে। উচ্চতম সংস্কৃতি-জীবনে তাদের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নি। আজ এই শূদ্রশাসনের যুগেও যদি তাদের এ অধিকার না দেওয়া হয়, শিক্ষা-সংস্কৃতির অবনতি অনিবার্য। সেইজন্য তৎপর হ'তে হ'বে যাতে শূদ্রগণের হাতে ব্রাহ্মণদের শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি এসে পোঁছায়, যাতে শূদ্র-অধিকার স্থায়ী হ'তে পারে, যাতে জ্ঞানে, গরিমায় সভ্যতার উন্নততম শীর্ষে উন্নীত হ'তে পারে শূদ্রাধিপত্যের যুগ। সেইজন্য তিনি আহ্বান জানালেন প্রকৃত বিপ্লবী কর্মীদের লক্ষ্য করে—"Carry the light and life of the Vedanta to every door and rouse up divinity that is hidden within every soul।" অর্থাৎ তিনি নির্দেশ দিলেন তোমরা প্রত্যেকে ব্রাহ্মণ হও, পারিয়াকেও ব্রাহ্মণ করে তোল। এই হ'ল আসল বিপ্লব—এই হ'ল মূলদেশে অগ্নিসংযোগ। "মূলদেশে অগ্নিসংযোগ কর, ক্রমে সেই অগ্নি ঊর্ধ্ব-দেশে উঠিতে থাকিবে," "ক্রমে তাহা সারা পৃথিবীকে গ্রাস করিবে"—"Our solution of the caste-question is not degrading those who are already high up······but it comes by every one of us fulfilling the dictates of our Vedantic religion, by our attaining spirituality, and by our becoming the ideal Brahmana।" শূদ্রায়ণ আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, উচিত ব্রাহ্মণত্বকে লক্ষ্যে রাখা। আর্য, অনার্য, ব্রাত্য সকলকে যদি এই লক্ষ্যে না প্রতিষ্ঠিত করা যায়, সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব নয়। কারণ সভ্যতার অগ্রগতির একটাই সর্ত আছে

১। 'The Mission of Vedanta'

তা হ'ল ঃ সমাজ-জীবন, রাষ্ট্র-জীবন, সর্বপ্রকার গোষ্ঠী-জীবন, সর্বত্র এই স্বীকৃতি অর্জন যে—"প্রত্যেক নরনারী, শুধু তাহাই নয়, উচ্চতম দেবতা হইতে তোমাদের পদতলে ঐ কীট পর্যন্ত সকলেই ঐ আত্মা—হয় উন্নত, নয় অবনত। প্রভেদ—প্রকারগত নয়, পরিমাণগত।"

এখন "আত্মার এই অনন্ত শক্তি জড়ের উপর প্রয়োগ করিলে জাগতিক উন্নতি হয়, চিন্তার উপর প্রয়োগ করিলে মনীষার বিকাশ হয় এবং নিজের উপর প্রয়োগ করিলে মানুষ দেবতা হইয়া যায়।"[১]

সুতরাং এই আত্মিক বিপ্লব ব্যতীত শূদ্র-সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটিত হবে না—শূদ্রশক্তির সকল সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশলাভও ঘটবে না, এই হল স্বামীজীর এ সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত।

১। 'হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা'।

# ষোড়শ অধ্যায়

## ভিত্তি ও সৌধ

"অরণ্যাচারী মৃগয়াজীবি কোল পূর্বপুরুষদের জন্য আমরা গর্বিত"

—বিবেকানন্দ

অদ্বৈতবেদান্তদর্শন বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের ভিত্তি, foundation of the edifice of his thought, কিন্তু the whole of the edifice নয়। তাঁর চিন্তার সৌধ গড়ে উঠেছে নৃতত্ত্ব পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যাত ইতিহাস সহায়ে। শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রেণীবিন্যাস, বিপ্লব ও সমন্বয় চেষ্টা, আগামী শ্রমজীবিদের দেবত্বকেন্দ্রিক শ্রেণীবিহীন সমাজ—এই সকল সেই সৌধের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সেইজন্য বিবেকানন্দের ইতিহাস-সমীক্ষণ বিচার করতে গেলে বিবেকানন্দ কর্তৃক উপরোক্ত বিজ্ঞানসমূহের ব্যবহার ও তথ্যপুঞ্জাদি সমাবেশ আলোচনা করা প্রয়োজন। অনেকেই এ বিষয়ে অবহিত নন। অনেকের ধারণা যেহেতু বিবেকানন্দ ধর্মাচরণে বিশ্বাসী, সেই হেতু বিবেকানন্দের ধারণা সকলের ভিত্তি মিস্টিসিজম্ ও অপ্রাকৃত কতগুলি দার্শনিক মতবাদ। এইজন্য বিবেকানন্দের দ্বারা রূপায়িত 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে'র বৈজ্ঞানিক উপাদানগুলি অনুসন্ধান করে দেখা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে সে সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা সন্নিবেশিত করছি।

বর্তমান সময়ে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে ইতিহাস-ব্যাখ্যার একটি প্রবণতা এসেছে। ইতিহাস যে শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ কিম্বা রাজা ও শাসক-শ্রেণীর চরিত কথা নয়, এ হ'ল সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ কাহিনী—এ ধারণা সুস্পষ্টভাবে লাভ করবার পর থেকে ঐতিহাসিকগণ এই সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি সম্বন্ধে চেতনালাভ করেছেন। এই পদ্ধতি হ'ল—"The process of writing history from the bottom up"—অর্থাৎ সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে ইতিহাস অনুসন্ধান করা

—পুঁথি ছেড়ে সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণ করে দেখা। তা না হ'লে সমাজ-বিকাশের কাহিনীর মূলরহস্য অজানিত থেকে যায়। "History conceived without its social medium is the motion perceived without that which is moving"[১]—ম্যানহাইমের এই উক্তি এ বিষয়ে যথার্থ সত্য প্রদর্শন করছে। নূতনকালের ইতিহাস সেইজন্য অধিকতররূপে আঞ্চলিক জনসংস্কৃতির বিশ্লেষণ-ভিত্তিক। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের এই সমাজ-তাত্ত্বিক পদ্ধতির আবিষ্কার একান্তই আধুনিক। মর্গানের গবেষণার ভিত্তিতে মার্কস এই পদ্ধতিতে আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু এ পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই বিংশ শতাব্দীতেই। আমাদের দেশে ইতিহাস রচনায় এর প্রভাব নিতান্তই সাম্প্রতিক।[২]

আশ্চর্যের বিষয় বিবেকানন্দ ইতিহাসের এই সমাজতাত্ত্বিক উপকরণটি সেই উনিশ শতকের শেষভাগেই আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে গিয়েছেন। তখনও মার্কসের রচনা ইউরোপে আজকের মত জনপ্রিয় হয় নি, ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস বিচারের পদ্ধতিতে তাঁর প্রভাবও মেনে নেন নি। সেই সময় স্বামীজী তাঁর 'আর্য ও তামিল' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। উক্ত নিবন্ধের প্রারম্ভেই তিনি বলছেন: "সত্যই এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি-পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হ্রদ-অধিবাসীগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসীগণ নিশ্চয়ই কোনকালে সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন। গুহাবাসী ও পত্রসজ্জা-পরিহিতগণকে এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো-কেলোরীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক

---

১। Karl Manheim—'The False And The Proper Concept Of History And Society.' (P. 37).

২। শ্রীবিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' ও শ্রীনির্মলকুমার বসু রচিত 'হিন্দুসমাজের গড়ন' এই পদ্ধতিতে লিখিত দু'খানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রাধান্যে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ: সেই সব দেশেই সভ্যতার প্রথম আলো উদ্ভাসিত হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ পুরোহিত বলতে যে শ্রেণী বোঝায় এই পুরোহিত-শ্রেণী তারা নয়। স্বামীজী যাদের প্রশান্তচিত্ত শ্রমণ ব্রাহ্মণ সাধক ও মহাপুরুষ বলে অভিহিত করেছেন তারাই পরবর্তীকালের পুরোহিত শ্রেণী নয়। পরবর্তীকালের পুরোহিত-শ্রেণী ঐহিক ধন সম্পদের কাঙাল, উচ্চ আদর্শভ্রষ্ট। পুরোহিত-শ্রেণীর সঙ্গে প্রকৃত ধর্মচর্যারত ব্রাহ্মণের পার্থক্য নির্দেশ করে স্বামীজী বলছেন—"প্রাচীন ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিরা পুরোহিতদের নির্দেশকে অস্বীকার করে শুদ্ধ সত্য প্রচার করেছিলেন। পুরোহিতদের শক্তিকে তাঁরা বিনষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু করেওছিলেন।"[১] বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করবার জন্য তিনি প্রাচীন ইহুদি জাতির ইতিহাসের সাহায্য নিয়েছেন। বলছেন তিনি এক জায়গায়—"ইহুদীদের ইতিহাস স্মরণ করলেই বোঝা যায়, তাদের দু'রকম ধর্মনেতা ছিল—পুরোহিত ও ধর্মগুরু। পুরোহিতেরা জনসাধারণকে শুধু অন্ধকারেই ফেলে রাখত, আর তাদের মনে যত কুসংস্কারের বোঝা চাপাত। পুরোহিতদের অনুমোদিত উপাসনা পদ্ধতিগুলি ছিল মানুষের উপর আধিপত্য কায়েম রাখবার অপকৌশল মাত্র।" সমস্ত Old Testament-এ পুরোহিতদের সঙ্গে ধর্মাচার্যদের বিরোধ দেখা যায়। ধর্মাচার্যগণ জনসাধারণকে পুরোহিতদের সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত যীশুর আবির্ভাবে শেষোক্তদের জয় হয়—"এই মহাপুরুষ পৌরোহিত্যরূপ দানবীয় স্বার্থপরতাকে নিধন করেন এবং তার কবল থেকে সত্যরত্ন উদ্ধার করে বিশ্বের সকলকেই তা দিয়েছিলেন।" ধর্মাচার্যদের উদারতার ফলে বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্ভূ'ত জাতিগণ (races) তাদের ধর্মকর্ম, আচার আচরণ, রীতিনীতি নিয়ে ভারতের সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। সেইজন্য ভারতের ধর্ম-ব্যবস্থায় উচ্চতম অদ্বৈত-তত্ত্ব থেকে নিম্নতম সাপ ব্যাঙ

১। 'বুদ্ধের বাণী'

ইত্যাদি জীবজন্তু পশুপক্ষী পূজার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত—"From the high spiritual flights of the Vedanta Philosophy of which the latest discoveries of science seem like echoes, to the low ideas of idolatary with its multifarious mythology, the agnosticism of the Buddhists and the atheism of the Jainas, each and all have a place in Hindu's religion।"[১] কি ভাবে এই সংমিশ্রণ হয়েছে তার দু-একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত বিবেকানন্দ দিয়েছেন। 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—"সীথিয়ানদের ভারত আক্রমণ এবং পাটলিপুত্র সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সব যেন হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এই আক্রমণকারীর দল নিজেদের বাসভূমি মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ প্রচারকদের আক্রমণে ইতিপূর্বে ক্রোধদীপ্ত হইয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সূর্যোপাসনার সহিত নিজেদের সৌরধর্মের প্রভূত সাদৃশ্য তাহারা লক্ষ্য করিল এবং যখন ব্রাহ্মণগণ তাহাদের বহু আচার-পদ্ধতি নিজেদের ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইল, তখন সহজেই তাহারা ব্রাহ্মণদের পথ অবলম্বন করিল।" এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ভাবে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর মধ্যে বিজাতীয় জাতি ও ধর্মীয় আচার ব্যবহারের সমন্বয় হয়েছে। এ সম্বন্ধে স্বামীজীর সিদ্ধান্ত অন্যান্য সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেছেন। যথা প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী নির্মলকুমার বসু বলছেন "নানা জাতি যখন ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার করিয়া বৃহত্তর হিন্দু সমাজ গঠন করিতে লাগিল, তখন কাহারও আচার অনুষ্ঠানকে অকারণে নষ্ট করা হয় নাই।……ফলতঃ হিন্দুসমাজ যেমন নানা জাতির সংশ্লেষের দ্বারা রচিত হইয়াছে, হিন্দুধর্মও তেমনি নানা মত ও পথের সংশ্লেষের দ্বারা বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে।"[২] অতএব দেখা যাচ্ছে ধর্মাচার্যগণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন

১। Chicago Lectures—Paper on Hinduism

২। হিন্দু সমাজের গড়ন—পৃঃ ৭৫

তা হ'ল সমন্বয় ও সমীকরণ সাধনের, আর অধ্যাত্ম-আদর্শভ্রষ্ট পুরোহিতেরা বিশেষ সুবিধার প্রাকার গঠন করে, ভেদবৈষম্যের সৃষ্টি করে, নিষ্ঠুর শ্রেণীসংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল। বিবেকানন্দের এই সিদ্ধান্ত সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণে সমস্ত অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছে। সর্বাপেক্ষা বড় কথা পুরোহিততন্ত্র, তার শোষণ প্রভৃতির সঙ্গে ধর্মাচার্যগণের সমন্বয় প্রয়াসের পার্থক্য প্রদর্শন করে মানবের সামাজিক কল্যাণপথচ্যুতি তিনি রোধ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলেই এটা তিনি করতে পেরেছেন—প্রাচীন বর্ণ, ধর্ম, জাতি-বিন্যাস প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে তিনি এই সকল সিদ্ধান্ত গঠন করেছেন।

ভারতের জাতিগত এই বৈশিষ্ট্য—সমন্বয় ও সমীকরণের প্রয়াসের ফলে আবহমানকাল ধরে বিভিন্ন জাতির ( race ) সংমিশ্রন—প্রথম স্পর্দ্ধিত সমর্থন পায় বিবেকানন্দের কাছে। তখন শাসকশ্রেণী প্রচারিত ভ্রান্ত ও অশ্রদ্ধেয় তত্ত্ব—ভারতীয় উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আর্য-জাতি ও শূদ্রশ্রেণী অনার্য—আমাদের জাতীয় জীবনে বহুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। বলাবাহুল্য তাঁদের এ তত্ত্ব ভারতের জাতীয় জীবনে ভেদবৈষম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যদ্বারা প্রণোদিত ছিল। বিবেকানন্দ অকাট্য যুক্তিজাল সহায়ে এ সকল তত্ত্ব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেন। এ সম্পর্কে 'জগতের কাছে ভারতের বাণী' শীর্ষক অসমাপ্ত রচনায় তিনি যে যুক্তি পরম্পরা উপস্থাপিত করেছেন তা' হল নিম্নোক্তরূপ—

"১২। একটি জাতীয় পটভূমিকা পাওয়া গেল—আর্যজাতি।

১৩। মধ্য এশিয়া হইতে বাল্টিক উপসাগর অবধি এলাকায় কোন পৃথক ও বিশিষ্ট আর্যজাতি ছিল কিনা, তাহা অনুমানের বিষয়।

১৪। তথাকথিত জাতি-রূপ ( type )। বিভিন্ন জাতি সর্বদাই মিশ্রিত ছিল।

১৫। সোনালী চুল ও কালো চুল।

১৬। তথাকথিত ঐতিহাসিক কল্পনা হইতে সহজ বুদ্ধির

বাস্তব জগতে অবতরণ। প্রাচীন নথিপত্র অনুসারে আর্যদের বাসভূমি ছিল তুর্কীস্থান। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের মধ্যবর্তী দেশে।

১৭। ইহার ফলে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের মিশ্রণ দেখা দেয়।"

এই সকল খণ্ড টুকরো মন্তব্যের মধ্যে বিবেকানন্দ যা বলতে চেয়েছেন তাহ'ল এই যে ঐতিহাসিক কল্পনার স্তর হ'তে কঠিন বাস্তবে অবতরণ করলেই আমরা দেখতে পাই যে জাতিগত বিশুদ্ধতা কোনকালে ছিল না। 'আর্য্য ও তামিল' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি আরও বলেছেন "আর্য ও দ্রাবিড় ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগমাত্র করোটিতত্ত্বগত (craniological) বিভাগ নহে, সে-ধরনের বিভাগের পক্ষে কোন দ্বিতীয় যুক্তিই নাই।" ভারতের আদি ইতিহাসে আছে এই জাতি-সংমিশ্রণের ভূরি ভূরি প্রমাণ—"যে বর্ণের হস্তে তরবারি সেই বর্ণই ক্ষত্রিয় হইয়া দাঁড়ায়; যাহারা বিদ্যাচর্চ্চা লইয়া থাকে, তাহারাই ব্রাহ্মণ, ধনসম্পদ যাহাদের হাতে থাকে তাহারাই বৈশ্য। শক-পুরোহিতগণ আমাদের ব্রাহ্মণ সমাজের অঙ্গীভূত হ'ন।"[১]

ভাষাতত্ত্বের সহায়তাও স্বামীজী গ্রহণ করেছেন ভারতীয় ইতিহাসের এই জাতীয়ধারা ব্যাখ্যানে, বলছেন "ভাষাতাত্ত্বিকদের 'আর্য' ও 'তামিল' এই শব্দ দুইটির নিহিত তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, এমনকি যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে ভারতীয়দের এই দুই বিশিষ্ট শাখা ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত পার হইয়া আসিয়াছিল, তবু অতি প্রাচীন কাল হইতে এই বিভাগ ভাষাতত্ত্বগত রক্তগত নহে।" এ বিষয়ে আমরা দেখি স্বামীজীর সঙ্গে বর্তমানের সকল জাতি-বিশেষজ্ঞগণ একমত। ১৯৫০ সাল হতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন দেশের জাতিবিশেষজ্ঞরা ইউনেস্কো দ্বারা আহুত হয়ে জাতি সমস্যা সম্বন্ধে দুইটি বিবৃতি দেন। এই উভয় বিবৃতি, তার সমালোচনা ও সমালোচনার উত্তর সহ ইউনেস্কো হতে 'The Race Concept'

---

১। 'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ'।

নামক যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তা হ'তে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে জাতিসমস্যা সম্পর্কে বিশেষ ধারণা লাভ করা যায়। তাতে একজায়গায় বলা হয়েছে—"There is no evidence for the existence of so called 'pure' races". "In regard to race mixture, the evidence points to the fact that human hybridization has been going on for an indefinite and considerable time"।[১] এ সম্পর্কে A. Lipschut বিশেষ জোর দিয়ে আরও দেখিয়েছেন যে—"Scientists are generally agreed that all men belong to a single species, Homo Sapiens, and are derived from a common stock, even though there is some dispute as to when and how different human groups diverged from this common stock"। বিবেকানন্দও তদানীন্তনকালে লভ্য তথ্যাদির ভিত্তিতে বলেছিলেন—"শূদ্রেরা সকলে অনার্য নয়"[২] এবং সেজন্য উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"আমার বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি; এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমি গর্বিত; এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যাচারী মৃগয়জীবী কোল-পূর্বপুরুষদের জন্য আমি গর্বিত; মানবজাতির যে আদিপুরুষেরা প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন, তাহাদের জন্য আমরা গর্বিত।"

পুরাতত্ত্ব অনুশীলন করে স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকটি যুক্তিসম্মত মৌলিক অভিমতও দিয়েছেন। যেমন, তিনি মনে করতেন যে, "মিশরীয়গণের আদিভূমি ভারতের মালাবার উপকূল।" "সমগ্র মিশরীয়গণ মালাবার তীর হইতে সমুদ্র পার হইয়া নীলনদের তীর ধরিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণের দিকে ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল। এই পন্টকে তাহারা পবিত্রভূমিরূপে সাগ্রহে স্মরণ করিত"।[৩]

১। P. 62 Sec 7.

২। তৃতীয় খণ্ড-'বাণী ও রচনা'—পৃঃ ২৯২-২৯৩।

৩। 'আর্য ও তামিল'।

দ্বিতীয়তঃ স্বামীজী মনে করতেন যে যে মিশ্রজাতি ভারতে আর্যনামে খ্যাত তারা বহিরাগত নয়। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম যুক্তি: "In what vedas, in what suktas, do you find that the Aryans came into India from a foreign country? When do you get the idea that they slaughtered the wild aborigines?"—অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যে আর্যগণের বিদেশ বাসের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি: "প্রাচীন নথীপত্র অনুসারে আর্যদের বাসভূমি ছিল তুর্কীস্থান, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের মধ্যবর্তী দেশ।" এ সম্পর্কে স্বামীজীর মতের অনুমোদন আমরা পাই পুরাতত্ত্ববিদ্ Dr. Eichotedt-এর মতের মধ্যে, যাঁর সিদ্ধান্ত হ'ল যে বৈদিক আর্যগণের পূর্বপুরুষগণ পরবর্তী তুষার যুগ হ'তে (Late Ice-Age) হিন্দুকুশ পর্বত অঞ্চলের অধিবাসী।

তৃতীয়তঃ স্বামীজীর অভিমত বৈদিক আর্যজাতি ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী ইউরোপীয়গণের কল্পিত আর্যজাতি—এ দুই এক ও অভিন্ন নয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন জাতির শারীরিক লক্ষণাদি সংক্রান্ত নৃতাত্ত্বিক বিষয় তাঁর সাহায্যে এসেছে। এই নৃতাত্ত্বিক উপাদান সহায়ে তিনি কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্‌দেরই প্রচলিত ভ্রান্তির উপর নিদারুন আঘাত করেছেন,—"In the opinion of modern savants, the Aryans had reddish white complexions, black or red hair, straight noses and well drawn eyes, etc… when the complexion is dark, there the change has come to pass owing to the mixture of the pure Aryan blood with black races……But the European Pundits ought to know by this time that, in the southern parts of India, many children are born with red hair and blue or grey eyes……whether of pure or mixed blood, the Hindus are Aryans"।[১]

এই আর্যজাতির ধারণাকে স্বামীজী ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"সংস্কৃত

১। Complete works—Vol v P. 368.

যেমন ভাষা সমস্যার সমাধান, আর্য তেমনি জাতিগত সমস্যার সমাধান। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রগতি ও সংস্কৃতির এবং সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান ব্রাহ্মণত্ব।" ভারতীয় জাতির ঐক্যের মূলমন্ত্র এই কথা কয়টির মধ্যে নিহিত রয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে আর্যরা একত্ব স্থাপন করেছে ভারতে ধর্মকে অবলম্বন করে। স্বামীজী পুরাতত্ত্ব অনুশীলন সহকারে বলেছেন যে একেশ্বরবাদের দ্বারা ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা ও ইহুদী-সভ্যতা এইরূপ ঐক্য-সাধনের প্রয়াস করেছিল। ব্যাবিলোনীয়গণ সব 'বাল' দেবতাকে 'বাল-মেরো ডাচে' পরিণত করে এবং ইহুদীগণ সব 'মোলোক'-দেবতাকে সর্বশক্তিমান "মোলোক যিয়োবাহ'তে পরিণত করে। কিন্তু এতে যে ঐক্য সাধিত হয়, তার দ্বারা ধ্বংসও সাধিত হয়—স্বাধীন বিকাশের পথ আর থাকে না। "স্বৈর রাজতন্ত্রের মতো একেশ্বরবাদ আদেশানুযায়ী দ্রুত কার্য সমাধা করে, কিন্তু ইহার আর কোন বিকাশ সম্ভব হয় না। একেশ্বর-বাদের সর্বাপেক্ষা ত্রুটি—ইহার নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন। যে সকল জাতি এই মতবাদের প্রভাবাধীন হয়, তাহারা অল্পকালের জন্য সহসা উন্নতিলাভ করিয়া অতি শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যায়"। সুতরাং স্বামীজীর মতে বিরাট সমস্যা হ'ল বিভিন্ন জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিনাশ না করে তাদের ঐক্য ও সংহতি সাধন। "ভারতবর্ষে সেই সমস্যা দেখা গিয়াছিল, সমাধান মিলিল 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' বাণীর মধ্যে। সর্বপ্রকার সাফল্যের ইহাই মূলমন্ত্রস্বরূপ, সমগ্র সৌধের ইহাই কেন্দ্রশিলা।" অতএব স্বামীজীর মতে সমাধান একেশ্বরবাদ নয়, অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ যার মূলকথা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব সাধন। জগতের কাছে তাঁর মতে এই হ'ল ভারতের বাণী। আর তাঁর মতে ভারতবর্ষের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব সাধন এবং ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ দ্বারা পশুমানবকে দেব-মানবে রূপান্তর সাধনের প্রয়াস মহিমময় ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করছে।

স্বামীজীর ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা অনুরূপ পুরাতাত্ত্বিক ভিত্তি দেখতে পাই। ইতিপূর্বে আমরা সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছি,

এখানে সে প্রসঙ্গে প্রচলিত পুরাতাত্ত্বিক মতের মৌলিক যে ব্যাখ্যা স্বামীজী দিয়েছেন তা আলোচনার প্রয়াস করবো। আত্মতত্ত্ব বৈদিক আর্যদের দ্বারা আবিষ্কৃত—এই হ'ল স্বামীজীর অভিমত। এ সম্পর্কে হেরোডেটাস হতে আরম্ভ করে ম্যাস্‌পেরো, হেকেল প্রভৃতি যাবতীয় মিশর-তত্ত্ববিদ্‌দের মত উদ্ধৃত করেছেন স্বামীজী। তাঁর সিদ্ধান্ত : যদিও হেরোডেটাস বলেন যে মিশরীয়গণই সর্বাগ্রে আত্মার অমরত্বের ধারণা করতে পেরেছিল, ম্যাসপেরো, আর্মান ও হেকেলের মত যে, আত্মা বা পুনর্জন্ম সম্বন্ধে এদের কোন ধারণা ছিল না। তারপর ক্যাল্ডিয়া, হিব্রু, হেলেনীয় ও পারসীক জাতির উপাসনা পদ্ধতি উল্লেখ করে স্বামীজী সিদ্ধান্ত দেন যে একমাত্র পিথাগোরাস আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে পেরেছিলেন এই কারণে যে এপুলিয়াসের মত তিনিও ভারতে শিক্ষা পেয়েছিলেন। স্বামীজীর শেষ সিদ্ধান্ত : যে সকল জাতি মৃতদেহকে ভস্ম করে ফেলে, তাদের মধ্যেই আত্মার অমরত্ব ও দেহের নশ্বরত্বের ধারণা সুস্পষ্ট দেখা যায়, যে সকল জাতি দেহকে কবরস্থ করে, তাদের মধ্যে দেহবাদ প্রধান, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণার অভাব। এই সকল দেহবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মচেতনার মূলে ভীতির প্রাধান্য দেখা যায়।[1] "সেমিটিক ধর্মে ভয় ও কষ্টের ভাব প্রচুর, ঐ ধর্মের ধারণা এই যে, মানুষ ঈশ্বর দর্শন করিলেই মরিবে।"[2] কিন্তু আর্যজাতির ধর্মচেতনার আদিতে এরূপ ভীতির প্রাধান্য দেখা যায় না। এ সম্পর্কে স্বামীজী বলেন "উহার মধ্যে কোনরূপ দুঃখের ভাব নাই। উহাতে সরল হাস্যের অভাব নাই। বেদের কথা বলিতে আমি যেন দেবতাদের হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইতেছি।" "অনেক বৈদিক মন্ত্রে আছে, যেখানে পিতৃগণ বাস করেন, তাহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও, সেখানে কোন শোক দুঃখ নাই ইত্যাদি। সেজন্যই এ দেশে এই ভাবের উদয় হইল যে নশ্বর শবদেহ যত শীঘ্র দগ্ধ করিয়া ফেলা যায় ততই ভাল। তাহাদের ক্রমশঃ একটি ধারণা হইল যে, স্থূলদেহ ছাড়া

১। বাণী ও রচনা—'পুনর্জন্ম'

২। খেতড়ি বক্তৃতা—'বেদান্ত,' 'বাণী ও রচনা'

আরও একটি সূক্ষ্মদেহ আছে, স্থূলদেহ ত্যাগের পর সূক্ষ্মদেহ এমন এক স্থানে চলিয়া যায়, যেখানে কোন দুঃখ নাই কেবল আনন্দ।" বিভিন্ন দেবদেবী কল্পনা তাঁরা করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের বর্ণনায় যে অপূর্ব কাব্যময় ভাষা দেখা যায়, তার মধ্যে একটি প্রফুল্ল আনন্দের বিকাশ আছে। প্রথমে তাঁরা বহির্জগতে জগৎ-সমস্যার সমাধান খুঁজে-ছিলেন, কিন্তু সেখানে উত্তর পাওয়া গেল না, তাঁরা দেখলেন বহিঃ-প্রকৃতি দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। তখন তাঁরা 'নেতি নেতি' বিচারপূর্বক দেখতে পেলেন অন্তর্জগৎকে, তখন বিভিন্ন দেবগণ এক হয়ে গেলেন; চন্দ্র, সূর্য, তারা, ব্রহ্মাণ্ড সব এক হয়ে গেল।

স্বামীজীর বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট যে ধর্মকে আদিম মনের ভীতিসঞ্জাত কুসংস্কার বলা চলে না, তাকে মননশীল জীবের ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের অনুসন্ধানের স্বাভাবিক প্রেরণা বলা যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের ধর্মগুলিকে অবলম্বন করে এ পর্যন্ত যে সকল পুরাতাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে, প্রায় সবগুলির সিদ্ধান্ত আত্মতত্ত্ব বিরোধী, বস্তুবাদ প্রতিপাদক। কারণ মার্কসকে এঁরা অনুসরণ করেন, আর মার্কস অনুসরণ করেন মর্গানের সেমিটিক-ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত ধর্মের আলোচনাকে। বিবেকানন্দ যে আলোচনা দিয়েছেন তার ভিত্তি সেমিটিক ধর্ম, আর্যধর্ম এবং প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের বিচার। এইরূপে বৈজ্ঞানিক উপাদানসহায়ে বিবেকানন্দ ধর্ম-চেতনার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করেছেন।

অতএব আমরা দেখছি যে বিবেকানন্দের ইতিহাস বিশ্লেষণ পদ্ধতি আধুনিকতম সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি, এবং সর্বপ্রকার মানব-শাস্ত্র—পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদির সাহায্যে তাঁর সিদ্ধান্ত সকল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সকল কল্পনা নয়, যুক্তিগ্রাহ্য ও আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক।

স্বামীজীর সমাজ-দর্শনে জীবতত্ত্ব ও প্রাণিবিজ্ঞানও প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে ক্রমবিকাশ-বাদ সহায়ে তিনি তাঁর ইতিহাস বিবর্তন-তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন।

কিন্তু অকাট্য ভারতীয় দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগে ডারউইন প্রোক্ত ক্রমবিকাশতত্ত্বের তিনি কিঞ্চিৎ পরিশোধনও করেছেন। প্রথমতঃ যেহেতু ভারতীয় তর্কবিধি অনুযায়ী শূন্য হ'তে কিছুই সৃষ্ট হয় না, বীজ হতে গাছ, গাছ হ'তে বীজ, অব্যক্ত হ'তে ব্যক্ত, ব্যক্ত হ'তে অব্যক্ত এইরূপে বিবর্তন চলে, সেই হেতু তাঁর মতে ক্রমবিকাশ থাকলে ক্রমসঙ্কোচনকে অবশ্যই থাকতে হ'বে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর মতে 'survival of the fittest theory' ভুল। পতঞ্জলি-বর্ণিত প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতি হ'তে আর এক জাতির উৎপত্তি সংসাধিত হয়। সুতরাং সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই উন্নতির উপায় নয়। স্বামীজীর এ সম্পর্কে মত "সকল মানবই পূর্ব হইতেই অনন্তশক্তি-সম্পন্ন কেবল এই সকল বিভিন্ন অবস্থা-চক্ররূপ প্রতিবন্ধক বা বাধা তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেগুলি সরাইয়া ফেলিলেই, তাহার সেই অনন্তশক্তি মহাবেগে বাহির হইয়া থাকে। ইতর প্রাণীর ভিতর মনুষ্যভাব অবরুদ্ধ রহিয়াছে। যখন উপযুক্ত সুযোগ হয়, তখনই সে মনুষ্যরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখনই মানবের মধ্যে যে ঈশ্বর বর্তমান, তাহা অভিব্যক্ত হয়।" এ হ'তে স্বামীজী সিদ্ধান্ত দেন যে সমাজ-জীবনের প্রতিষ্ঠা প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর হওয়া উচিত নয়, সকলের সমান সুযোগ লাভের উপর হওয়া উচিত; সকলের বিকাশের পথের বাধাগুলিকে অপসারণ করে দেওয়া কর্ত্তব্য[১]। স্বামীজীর ক্রমবিকাশবাদ সম্বন্ধে এই নূতন ব্যাখ্যা সমাজ-সংগঠনের নানাদিককে আলোকিত করেছে। বাহুল্যভয়ে এখানে সমস্ত দেওয়া সম্ভব হ'ল না।

প্রাণীবিজ্ঞানে কোন কোন বৈজ্ঞানিক Atavism বা পূর্বানুকৃতির কথা বলে থাকেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীদের মধ্যে পূর্বপুরুষ বা আদিমস্তরের লক্ষণসমূহ দেখা যায়। বিবেকানন্দ এই পূর্বানুকৃতির প্রমাণ সহায়েও ক্রমসঙ্কোচবাদ প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস করেছেন।

স্বামীজীর সমাজ-দর্শনে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির স্থান সম্পর্কে এ

১। 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ'—২০ (বাণী ও রচনা পৃঃ ১২০)

আলোচনা অসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই। স্বামীজী এই সকল উপকরণ প্রয়োগ করেছেন সর্বত্র, প্রতি পদে পদে—তাঁর রচনাবলী হ'তে সে সমস্ত সমগ্রভাবে উদ্ধার করা সহজসাধ্য নয়। আমি এখানে যেটুকু আলোচনা করবার প্রয়াস পেয়েছি, তার উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু দেখানো যে বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক ধারণা সকল বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রচুর বৈজ্ঞানিক উপকরণ তিনি ব্যবহার করেছেন, এবং তর্কশাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী সে সকল হ'তে তিনি সিদ্ধান্ত গঠন করেছেন। আশাকরি এই সীমাবদ্ধ আলোচনায় আমার সে উদ্দেশ্যটুকু সফল হয়েছে[১]।

---

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর পুর্ব উল্লিখিত পুস্তকে এ সম্বন্ধে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং বহু তথ্য উদ্ঘাটিত করেছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনা Historical Materialism এর দৃষ্টিভঙ্গী হেতু একদেশদর্শী, তাতে যে উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক উপাদান সমুহ ব্যবহার করেছেন তার বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

# সপ্তদশ অধ্যায়

## বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক কর্মসূচী

"Put the chemicals together, the action will take care of itself"

—*Vivekananda*

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের আলোচনা আমাদের এ সিদ্ধান্তেই উপনীত করে যে বর্তমান যুগের সমাজ-বিপ্লবীগণ যা চেয়েছেন, বিবেকানন্দও তা চেয়েছেন—চেয়েছেন নির্যাতিত শূদ্রসমাজের অভ্যুত্থান,—সমাজ-জীবনে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, চেয়েছেন এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা, যেখানে উচ্চশ্রেণীর দ্বারা নিম্নশ্রেণীর শোষনের অবসান হবে, শ্রমিক শ্রেণীর উপর যুগযুগান্ত ধরে পুরোহিত, রাজন্যবর্গ ও ধনিকশ্রেণীর অত্যাচার-কলঙ্কিত বিশেষাধিকারব্যবস্থা সম্পূর্ণ নির্মূল হ'বে। এজন্য পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদী আন্দোলন-গুলিকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ পর্যন্তই আধুনিক সমাজ-বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য।

কিন্তু তাঁর মনে শূদ্রত্ব সহ শূদ্র আধিপত্যের পরিণাম সম্বন্ধে সংশয়ও ছিল। এ পরিণাম শুভে অশুভে মিশ্রিত দেখেছিলেন তিনি। এবং শুভ যা তাকে সংরক্ষণের জন্য অশুভকে তিনি সযত্নে উৎপাটিত করতেও চেয়েছিলেন। দৃষ্টির এ গভীরতায়, কর্মপন্থার এ মৌলিকতায় বিবেকানন্দ সকল বিপ্লবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী।

তাঁর ব্যাখ্যানুসারে গুণগত জাতি বিভাগের দরুন প্রাচীন ভারতে (এবং বর্তমান পাশ্চাত্য জগতে) শূদ্রগণের মধ্যে যারা জ্ঞানে-বিদ্যায় ধনে-মানে অসাধারণ, তারা উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন। ফলে তাদের বিদ্যার প্রভাব, ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে নিয়োজিত হয়েছে, তার নিজের জাতি তার অংশ কিছুই পায় নি। শুধু তাই নয়, অন্যান্য জাতির যারা নিকৃষ্ট অংশ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যকুলে যারা

পতিত, তারাও শূদ্রকুলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে বর্তমান শূদ্রজাতি শিক্ষা-সংস্কৃতি হ'তে চিরবঞ্চিত নিকৃষ্ট মানুষদের দ্বারা গঠিত এক বিপুলায়তন মানব গোষ্ঠী। অবশ্যই অপরাধ তাদের নয়, উচ্চকুলের শোষণের ফলেই আজ তাদের এ অবস্থা[১]। কোটি কোটি মানুষ আজ সারা পৃথিবী জুড়ে অনাহারে আছে, যুগ যুগ ধরে তারা এমনই অনাহারে ছিল, ঘন কৃষ্ণমেঘের মত অজ্ঞানতার অন্ধকার আজ তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এই সকল পশুত্বে উপনীত মনুষ্যকুল শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হবে, মৈত্রী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হবে, শান্তির মূল্য সর্বাগ্রে স্থাপন করবে—এ আশা কি করে আমরা করতে পারি ?

স্বামীজীর ভবিষ্যৎ বাণীকে সত্য প্রমাণিত করে তাঁর দেহরক্ষার পনের বৎসর পরে রাশিয়ায় শূদ্রবিপ্লব সংঘটিত হয় এবং তার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে চীনেও তা সফল হয়। আজকের চীন-রাশিয়ার ইতিহাস যেন তাঁর বিশুদ্ধ শূদ্রশাসন সম্পর্কিত শঙ্কাকেও সত্য প্রমাণিত করতে চলেছে। এ বিষয়ে তাঁর দূরদর্শিতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টির গভীরতা আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে।

তাঁর প্রথম শঙ্কা ছিল যে শূদ্র-শাসনের কালে সাংস্কৃতিক অবনতি ঘটবে। অপকৃষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন শাসকশ্রেণীর শাসনের অনিবার্য পরিণাম এ ছাড়া আর কি হতে পারে ? এ হ'ল যুক্তির কথা। কিন্তু ইতিহাসও যেন আমাদের এ বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিচ্ছে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের কার্যকালে বর্তমান রাশিয়া প্রভূত পরিমাণে ধনোৎপাদন বৃদ্ধি করেছে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তার অসাধারণ অগ্রগতি আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। স্থলচর মানুষ আজ মহাকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত যথেচ্ছ বিচরণ করছে, অনতিকাল পরেই সে হয়ত গ্রহ হতে গ্রহান্তরে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে সক্ষম হ'বে। কিন্তু মানুষের চিন্তাজগতে এই পঞ্চাশ বৎসর কাল মধ্যে সে কি কোন নূতন চিন্তা তার অবদানস্বরূপ দিতে পেরেছে ? তার কোন পরিচয় এ পর্যন্ত আমরা পাই নি। পরম বিস্ময়ের কথা এই যে যে জাতির

১। 'বর্তমান ভারত'

মানুষেরা অনন্ত বিরাট মহাকাশের অপরিসীম আশ্চর্য রূপরাশি প্রত্যক্ষ করেছে, তাদের মধ্যে যেন যথেষ্ট বিস্ময় জাগেনি, জাগেনি সেই মহাজিজ্ঞাসা যা সকল কালে সকল নূতন চিন্তার মূলে অধিষ্ঠিত— "কো অদ্ধা বেদ,···কুত আজাতা, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ", কে এই মহান যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, কোথা থেকে এই আশ্চর্য বিশ্বসৃষ্টি এল ? এ অপার সৌন্দর্যরাশির রূপকার কে ? জিজ্ঞাসাই ত সকল প্রকার সৃজনমূলক মৌলিক চিন্তার মূলে অধিষ্ঠিত। সেই জীবন জিজ্ঞাসাকে আমরা আজ কতটুকু প্রতিফলিত দেখতে পাচ্ছি রাশিয়ার সাহিত্যে, দর্শনে, অন্যান্য চিন্তার ক্ষেত্রে ?

স্বামীজী তাঁর দ্বিতীয় আশঙ্কার অস্ফুট ইঙ্গিতমাত্র দিয়েছেন, কিন্তু তাও আজকের যুগের ইতিহাস যেন সুস্পষ্ট করে তুলেছে। তাঁর মতে "যুগযুগান্তর ধরিয়া পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই কুক্করবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্র পশুবৎ নৃশংস।"[১] নৃশংসতা, হিংস্রতা কিরূপে কল্যাণ-ফলপ্রদ হতে পারে, কি করে শান্তি ও সাম্য-বাহক হতে পারে ? নৃশংসতার পরিণাম হিংস্র আক্রমণ, ধ্বংসের উল্লাস, যুদ্ধ ও বৈরীতা। বর্তমান চীনের জঙ্গীবাদী জাতিতে পরিণতি আমাদের সকলের মনেই দারুণ এ সংশয় জাগিয়েছে। চীনের ভারত আক্রমণের মধ্যে তার যে পরিচয় আজ উদ্ঘাটিত, তা অন্ততঃপক্ষে সাম্যবাদের কল্যাণমূর্তির কোন পরিচয় বহন করে না। বহুকাল পূর্বে সাম্য-মৈত্রীর কল্যাণ-বাণী যাঁদের দ্বারা উচ্চারিত হয়েছিল, সেই লাওসে কনফুসিয়াসের দেশ সুপ্রাচীন মহাচীনের আজ এ কি রূপান্তর ! যে চীন হ'তে একদা বহু কৃচ্ছ্র সাধন করে, মৃত্যু তুচ্ছ করে, উত্তুঙ্গ হিমগিরিচূড়া পার হয়ে, ফাহিয়ান, হিউয়েনসাঙএর দল এসেছিলেন ভগবান তথাগতের দেশে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে, তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে, সেই চীনই আজ দেবতাত্মা হিমালয়ের ধ্যান সমাহিত অঙ্গে করেছে অস্ত্রাঘাত, ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশে দেখা দিয়েছে পররাজ্যলোভী লুণ্ঠকের বেশে !

১। 'বর্তমান ভারত'

সম্ভবতঃ স্বামীজীর আশ্চর্য গভীর দূরদৃষ্টির সন্মুখে এ সকল সম্ভাবনাই সুস্পষ্ট ধরা পড়েছিল, না হ'লে তিনি এমন স্পষ্ট সতর্ক বাণী কি করে উচ্চারণ করলেন—"Before flooding India with socialistic or political ideas, deluge the country with religious ideas" ? তাঁর দৃঢ় নির্দেশ ধর্মের বন্যায় সর্বাগ্রে দেশকে পরিপ্লাবিত করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ একমাত্র ধর্মের বন্যায় সব পশুত্ব দূরীভূত হ'তে পারে, মানুষ দেবত্বে উন্নীত হতে পারে।

সেজন্য তাঁর সমাজতন্ত্রবাদে যে বৈপ্লবিক 'সমর নীতি' ( plan of campaign ) স্থান লাভ করেছে, তা মার্কসীয় 'সমর নীতি' হতে আকাশপাতাল পৃথক। কারণ তাঁর motto হ'ল "elevation of the masses without injuring religion"। জনসাধারণকে তাদের হৃত ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দিতে হ'বে, কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতাকে আঘাত না করে। "Can you give them their lost individuality without making them to lose their innate spiritnal nature ?" স্বামীজীর মতে এখানেই রয়েছে প্রকৃত সমস্যা এবং এর সমাধান করা সম্ভব অদ্বৈত-বেদান্তবাদের প্রচার দ্বারা। অদ্বৈত বেদান্তের অভীঃমন্ত্র এক মহাবিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র। এই অগ্নিমন্ত্র সহযোগে সমগ্র সমাজের মূলদেশে তিনি অগ্নি সংযোগ করতে চেয়েছিলেন।

অবশ্য এ কথা আমাদের প্রতিপাদ্য নয় যে স্বামীজী কেবল ধর্ম প্রচার করতেই চেয়েছেন। তিনি দারিদ্রের অভিশাপ, পৌরহিত্যরূপ পাপ আর উচ্চবর্ণের শোষণ সর্বাগ্রে অবসান করতে চেয়েছেন— "গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। পৌরহিত্যরূপ পাপ দূরীভূত করিতে হইবে।" এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি—অধিক ধনোৎপাদন, দ্রুত শিল্পায়ণ নষ্ট পুরাতন হস্তশিল্পের পুনরুদ্ধার, অধিক কর্মপ্রবাহের সৃষ্টি—এ সকলের উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৩] দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ

৩। "Material civilisation, nay even luxury, is necessary to create work for the poor"—Letters P. 141

করছি,—অধিক ধনোৎপাদনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি নিম্নোক্ত নির্দেশ দিয়েছেন—"ভারতে কত জিনিস জন্মায়। বিদেশী লোক সেই material ( কাঁচামাল ) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মত তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে সব দ্রব্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার উপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিস তোয়ের করে বড় হয়ে গেল, আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করে বেড়াচ্ছিস।" ঠিক এমনি করে শিক্ষাকে শিল্পনির্ভর করবার জন্য পুরাতন হস্তশিল্পের পুনরুদ্ধার করতে বলেছেন তিনি নানাস্থানে।[১] শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য আর্থিক উন্নতি ও ধনোৎপাদনে দক্ষতা অর্জন, তাও তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,—"তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরাণীগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় কেরাণীগিরিরই রূপান্তর একটা চাকরী এই তো, এতে তোদেরই বা কি হ'ল? আর দেশেরই বা কি হ'ল? একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে, তোদের শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর—চাকরী গুখুরী করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে।"

আর অধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে বিবেকানন্দের পরিকল্পিত বিপ্লবের দুটি স্তর। একটি প্রাথমিক স্তর—ঐহিক উন্নতি সাধন। অপর আধ্যাত্মিক জীবনের পথে এগিয়ে চলা। তাঁর কর্মসূচীর অভিনবত্ব এখানে যে আর্থিক উন্নতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি ধর্ম বা অদ্বৈতবেদান্তবাদকে নিয়োগ করতে চেয়েছেন। বলছেন এক জায়গায় এই ধারণাটি সুস্পষ্ট করে উপস্থাপিত করে—"বেদান্তের অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব……যা গাঁয়ে গাঁয়ে, সকলকে ধরে ধরে বলগে যা তোমরা অমিতবীর্য, অমৃতের

১। 'পরিব্রাজক'—শেষাংশ।

অধিকারী। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত করে দেশের লোককে নিজের পায়ের পরে দাঁড় করা, উত্তম অশন-বসন, উত্তম ভোগ আগে শিখুক, তারপর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন হ'তে কি করে মুক্ত হ'তে পারবে তা বলে দে।"[১]

সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তের প্রচার সহায়ে তিনি তাঁর বিপ্লব সাধন করতে চেয়েছেন। তিনি অজ্ঞ, অন্ধ, মেরুদণ্ডহীন দুর্বল জনগণকে কোনপ্রকার লক্ষ্যের দিকে—তা যতই বড় হোক না কেন, তাড়িত করে নিয়ে যাওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত —"They are to be given ideas, their eyes are to be opened to what is going on in the world around them, and then they will work out their own salvation।" এবং কারুর মুক্তি অন্য কেউ এনে দিতে পারে না, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক গোষ্ঠী, প্রত্যেক নরনারীকে আপন ভাগ্য নির্ধারিত করতে হয়।[২] তাদের নিজপায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করা— এ ছাড়া আর অধিক কিছু করবার প্রয়োজনও নেই। কারণ তারপরের যা কিছু তা আপনিই স্বাভাবিক কার্য-কারণ সম্বন্ধ হেতু আসে। সুতরাং তাঁর ইঙ্গিত—শুভ বুদ্ধি প্রণোদিত, জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত জীবনে উন্নীত, সদাচার সম্পন্ন মানব-গোষ্ঠী আপনিই কল্যাণসমাজ গঠন করতে পারবে। সেজন্য তাঁর মত : শূদ্রকুলকে শিক্ষিত করে তোলাই একমাত্র কাজ, এ ছাড়া আর কিছুই করবার নেই—"Ours is to put the chemicals together, the crystallization comes in the law of nature. Our duty is to put ideas into their heads, they will do the rest."

বিবেকানন্দের নির্দেশিত এ কর্মপন্থার অনেক সমালোচনা হয়েছে। প্রধানতঃ এরই জন্য একদল বামপন্থী তাঁকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' ও 'হিন্দু রিভাইভালিস্ট' বলে অভিহিত করেন। অপর যাঁরা তাঁকে বিপ্লব-নায়ক বলে স্বীকার করেন, তাঁরাও তাঁর এই কর্মসূচী বাদ দিয়ে

১। 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ'।
২। Letters—P, 102

তাঁকে গ্রহণ করেন। তিনি শূদ্রবিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এইটুকুই তাদের বক্তব্যের মধ্যে তারা ধরেন। সেজন্যে বিবেকানন্দের কর্মসূচীর যথাযথ মূল্যবিচার আজও হয়নি।

এরা সকলেই বলেন একটি একটি করে এই বিশাল দেশের চল্লিশ কোটি নরনারীকে শিক্ষিত করে, তারপরে সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর সাধন করা হ'বে? তাতে তো অনন্তকাল কেটে যাবে, এবং "In the long run we will be all dead!" সুতরাং বিবেকানন্দের স্বপ্ন কোনদিনই কার্যে পরিণত হবে না এবং এ একটি pious wish বা ইউটোপীয়ান ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু বিচার এবং বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যায় যে যে কোনও বিপ্লব সাধনের এই একটি মাত্রই বাস্তবপন্থা আছে—শিক্ষা প্রচার। রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করবার দিকেও যদি জনগণকে তাড়িত করতে হয়—তাহলেও তাদের বিপ্লবের মন্ত্রে দিতে হয় দীক্ষা; বিপ্লবের পদ্ধতি সম্বন্ধে, তার প্রত্যেকটি ধাপ সম্বন্ধে, দিতে হয় দীর্ঘকাল ধরে সযত্ন ও সুনিপুণ শিক্ষা। রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখি এই পন্থাই সেখানে অবলম্বন করা হয়েছে। এর একটি সুন্দর চিত্র গোর্কি তার বিখ্যাত উপন্যাস "মা"-তে অঙ্কিত করেছেন। সেখানে দেখা যায় বিপ্লবের মন্ত্রকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে, কারখানাতে, কামারশালায়, ছাত্রাবাসে। বস্তুতঃ রাশিয়ায় বিপ্লব শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়েছে জনগণকে দীর্ঘকাল ধরে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরে।

স্বামীজীও ঠিক অনুরূপ পন্থাই অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। অদ্বৈতবেদান্তের শক্তি ও জাগরণের অগ্নিমন্ত্র তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, চাষীর কৃষি-ক্ষেত্রে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ভুনাওয়ালার উনুনের ধারে, ছাত্রাবাসে—সর্বত্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ-স্পর্শের ন্যায় অগ্নিসঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। রাশিয়ার বিপ্লবীদের কার্যপদ্ধতির সঙ্গে এ কার্যপদ্ধতির কি প্রভেদ আছে?

তাছাড়া স্বামীজী দেশের সমস্ত গণ-সমিতিগুলি বিপ্লবের মন্ত্র প্রচারের জন্য অধিকার করতে চেয়েছিলেন যা রাশিয়ার বিপ্লবীদেরও অন্যতম পন্থা ছিল। ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ও বিপুল প্রসারিত এরূপ গণসংস্থা তখন ছিল গ্রামে গ্রামে 'হরিসভা'। স্বামী অখণ্ডানন্দকে এক পত্রে এ সম্পর্কে তিনি লিখছেন "ঐ হরিসভাগুলি অধিকার করতে হবে।" এবং এগুলি অধিকার করে "কতকগুলি চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখতে পড়তে শেখাও ও অনেকগুলি ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও—তারপর গ্রামের চাষারা চাঁদা করে তাদের একটাকে নিজেদের গ্রামে রাখবে।" এইভাবে অল্পকাল মধ্যে সারাদেশে দ্রুত এই অভিনব বিপ্লবের প্রস্তুতি অগ্রসর হবে—এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা।

জানি না কোন বিপ্লবী কোন যুগে এর চাইতে অধিক কার্যকরী পন্থা আবিষ্কার করেছেন। যে কোনও 'positive idea' বিদ্যুৎ গতিতে কাজ করে। স্বামীজী 'physical', 'mental' ও 'spiritual'—প্রতিক্ষেত্রে কেবলমাত্র 'positive idea'ই মানুষকে দিতে চেয়েছিলেন। এর প্রভাব অমোঘ। রাশিয়াই তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 'positive idea' প্রচার সেখানে তড়িৎ গতিতে কার্যকরী হয়েছে। অতএব কি কারণে এ ক্ষেত্রেও এমন সর্বাঙ্গীণ positive ধারণাসকল লোকমনে ক্রিয়া করবে না? এইজন্য স্বামীজী স্থিরনিশ্চয় ছিলেন—"We will be throwing the whole world to convulsion—victory to Guru"। জয় সুনিশ্চিত, সারা পৃথিবীতে আগুন জ্বলে উঠবে।

তাঁর বৈপ্লবিক কর্মসূচীতে আরও দু'টি বিষয়ের স্থান আছে। একটি হ'ল বিপ্লবীদের সংগঠন এবং অপরটি বৈপ্লবিক কর্ম-যন্ত্র স্থাপন।

প্রথমটি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"I am born to organise these young men……and I want to send them rolling like irresistible waves over India bringing comfort, morality, religion, education to the doors

of the meanest and the most downtrodden. And this I shall do or die"।[১] তিনি সুস্পষ্ট বলছেন তিনি এই বিপ্লবীদলকে গঠন করতে আবির্ভূত। এঁদের তিনি অপ্রতিরোধ্য সমুদ্র তরঙ্গের মত সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। এবং এরূপ অগণিত তরঙ্গের পর তরঙ্গ এই বিরাট উপমহাদেশকে এক বিপুল মহাপ্লাবনে ভাসিয়ে দেবে এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। অপূর্ব স্বপ্ন—"লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহ-বিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক—মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক!" তা শুধু নয় "শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার কতশত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে। কেবল বিশ্বাসী হও,—বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি···। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত, অগ্রসর হও। পশ্চাতে চাহিও না, কে পড়িল দেখিতে চাহিও না। আগাইয়া যাও, সম্মুখে সম্মুখে।" একজন বিপ্লবী যিনি আপনার মধ্যে এক জ্বলন্ত আত্মাকে বহন করছিলেন, এ তাঁরই অগ্নি উদ্গীরণ। এই অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীগণই তাঁর বিপ্লবের প্রধানতম উপকরণ—"a thousand such men and the whole world will be revolutionised।" শুধু চাই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত সহস্র যুবক। চাই প্রকৃত বিদ্রোহীদের যারা যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিতদের উপর নৃশংস অত্যাচারের সকল দায় নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেছে, যারা এ দায়ের কথা ভেবে উন্মাদ হয়েছে, যাদের এ জন্য সুখনিদ্রা ঘুচে গেছে, তুচ্ছ হয়ে গেছে গৃহসুখ, আত্মসুখ, আর সব সুখ। তিনি "নরবিদ্রোহী, নারীবিদ্রোহী" উভয়কেই চেয়েছেন—"মেয়েমদ্দ, দুই

১। Letters—79-80

চাই,···যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, ছুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে।"

এদের গঠনের জন্য বৈপ্লবিক সংগঠনের উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছেন—"organisation চাই—কুঁড়েমী দূর করে দাও। ছড়াও, ছড়াও, আগুনের মতো যাও সব জায়গায়।"

এই সংগঠন সম্পর্কে তিনি তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন নিম্নোক্ত উক্তিতে—"My whole ambition in life is to set in motion a machinery which will bring noble ideas to the door of everybody"। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৯৭ সালের ১লা মে তারিখে 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন' স্থাপন করলেন। এই সঙ্ঘের ক্রোড়পত্রে এর কর্মনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এর উদ্দেশ্য হ'বে: (১) জনসাধারণের দৈহিক ও মানসিক মঙ্গলের জন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার পক্ষে উপযুক্ত কর্মী তৈরী করা, (২) শ্রমশিল্প (industry) ও চারুকলার উন্নতি করা ও সেজন্য উৎসাহ দেওয়া, (৩) সাধারণ বৈদান্তিক ও অন্যান্য ধর্মীয় ভাবগুলি রামকৃষ্ণের জীবনে যে অর্থ লাভ করেছে, সেই অর্থে সেগুলির প্রবর্তন ও প্রচার করা। এই কর্মযন্ত্রের দু'টি শাখা হ'বে। প্রথমটি,—অন্যের শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন এরূপ সন্ন্যাসী ও সংসারী শিষ্যদের শিক্ষা দেবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত মঠ ও আশ্রম; দ্বিতীয়টি,—সর্বমানবিক কল্যাণের জন্য বিদেশে স্থাপিত আধ্যাত্মিক সাধনার কেন্দ্র।

মিশনের এই কর্মনীতি ও কার্যশাখার বিভাগ দেখলে সহজেই অনুমিত হয় যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ কর্মীদের গঠন এই কর্ম-যন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য, এঁরাই তাঁর পূর্ববর্ণিত বিপ্লবীদল। এই সন্ন্যাসী ও সংসারী কর্মীদের উদ্দেশ্য হবে তাঁর ভাষায় 'নিজে ভগবান হওয়া ও অপরকে ভগবান হ'তে সাহায্য করা"। এঁরা কখনও আপন ভুক্তি-মুক্তি কামনা করবে না, আপন মোক্ষই এদের একমাত্র লক্ষ্য হ'বে না। এদের যে-রীতিতে গঠন করা হ'বে তা তাঁর বিপ্লবের

আদর্শানুগ—"তোমাদিগকে তোমাদের জীবনে বিপুল আদর্শের সহিত বিপুল কর্মশক্তির মিলন ঘটাইতে হইবে। এখনই তোমাদের গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, পরমুহূর্ত্তেই আবার তোমাদিগকে শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইবে—পরমুহূর্ত্তেই মাঠে চাষ করিতে যাইবার জন্য তৈয়ারী হইতে হইবে, ক্ষেতের ফসল বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য যাইতে হইবে।··· আশ্রমের উদ্দেশ্য হইল মানুষ তৈয়ার করা; সত্যকার মানুষ হইল সেই, যে শক্তির মতোই শক্তিমান, অথচ নারীর মতোই যাহার হৃদয় কোমল।"[১] তাঁর মত ছিল "শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীরাই শ্রেষ্ঠ কর্মী হতে পারেন, কারণ তাঁহাদের কোনও বন্ধন নাই।" শুধু মাত্র এরূপ মহৎ মানসিক বিকাশই এদের জন্য তিনি চান নাই, দৈহিক গঠনের উপরও তিনি জোর দিয়েছেন—"আমি আমার ধর্মের বাহিনীতে কুলী মজুর চাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের পেশীকে শিক্ষিত করিয়া তোলো। কৃচ্ছ্র-সাধকদের জন্য নিগ্রহই যথেষ্ট। কিন্তু কর্মীর জন্য চাই সুগঠিত দেহ, চাই লৌহের পেশী, চাই ইস্পাতের পেশী।"

এতকাল সন্ন্যাসীদল অরণ্যাচারী ছিল, আত্মমুক্তিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এরূপ উদ্দেশ্যকে তিনি চরম স্বার্থপরতা বলে মনে করেছেন। এই ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী-সমাজকে, যার সংখ্যা ভারতে নগণ্য নয়—এই শিক্ষাপ্রচার কর্মে তিনি ব্রতী করতে চেয়েছিলেন। এদের পিছুটান নেই, এরা সর্বত্যাগী, সর্বত্র যেতে পারে, কোনও একস্থানে বসে থাকার মত কোনও বাধ্যবাধকতা এদের নেই, এরাই এ কাজ করবার জন্য সর্বোতোভাবে উপযুক্ত। আর তাছাড়া, স্বামীজী মনে করতেন সমগ্র সমাজের সেবায় এদের আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য; যাদের প্রদত্ত ভিক্ষান্ন দ্বারা এরা দেহধারণ করে তাদের প্রতি এদের এ কর্তব্যের দায়। ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে বসে, সমগ্র ভারত ভ্রমণ শেষ করে, তিনি যেসকল জগৎ আলোড়নকারী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, এ হ'ল তার অন্যতম। এঁদের কর্মের এই

১। রোঁমা রোঁলা—বিবেকানন্দের জীবন (অনুবাদ—ঋষি দাস) পৃঃ ১২৪

দিক লক্ষ্য করে মনীষী বিনয় সরকার এঁদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন যে এই সকল রামকৃষ্ণের সৈনিকবৃন্দ সারা পৃথিবীতে আশা ও শক্তির বাণী প্রচারিত করে সকলকে শক্তিমান হতে ও অত্যাচার অবিচারের উর্ধ্বে মস্তক তুলে দাঁড়াতে সহায়তা করছে ; সুপ্রাচীন 'চরৈবেতি' বাণীর এঁরাই এ যুগে ধারক, বাহক ও প্রচারক।

বিবেকানন্দের এই বৈপ্লবিক কর্মনীতি বিশ্লেষণ করলে যা আমাদের অভিভূত করে তোলে তা হ'ল এর বাস্তবতা। সুস্পষ্ট কতগুলি কর্মসূত্রকে আমাদের চোখের সামনে তিনি তুলে ধরেছেন। এর প্রয়োগকুশলতা প্রদর্শন করে এর প্রয়োগধর্মীতাও প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন তিনি নিজে। শুধুমাত্র 'আধ্যাত্মিক ধোঁয়ার' সৃষ্টি করেই যান নি।[১] বস্তুতঃ প্রাচ্যের প্রত্যক্ষবাদ আর পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ তাঁর মধ্যে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক অভিনব বস্তুনিষ্ঠা। যে ধর্ম বাস্তব নয়, তা তিনি চান নি ; যে কর্মরীতি সুস্পষ্ট নয়, প্রয়োগশীলতা নেই যার, (এমন কর্মপন্থা), তিনি চান নি। তাঁর কথা : "An ounce of practice is much more important than tons of theories"। সেইজন্য তিনি সংস্থা-গঠন, কর্মী-গঠন, গণ-শিক্ষা, গণ-সমিতি অধিকার ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছেন। এই নীতিগুলিই পৃথিবীর সর্ব দেশে সর্বকালে বৈপ্লবিক কর্মরীতির প্রধান কথা—উদ্দেশ্য বিভিন্ন হতে পারে। বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য জড়ের উপর চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা, মনুষ্যত্বের পূর্ণ উদ্বোধন এবং প্রবুদ্ধ জনগণের শ্রেণীবিহীন সাম্যসমাজ পরিণামে আনয়ন। এই কর্মসূচীর কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিবেকানন্দের নিজের কোন সংশয় ছিল না—তিনি বলেছিলেন "মনে রেখো আমরাই অনেক বড় কাজ করবো। সারা জগতে আগুন জ্বালিয়ে দেব।"

এই বাস্তব কর্মনীতিকে চালু করার জন্য শেষ জীবনে তাঁর সকল

---

১। আধ্যাত্মিকতার 'আলো' কথাটা আমরা জানতাম, 'ধোঁয়া' কথাটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত। আধ্যাত্মিকতা সংজ্ঞানুসারে কখনও ধোঁয়া হতে পারে না। যে জ্ঞান সকল জ্ঞানের আকর, যে জ্ঞান সব অন্ধকারকে দূর করে' তাই অধ্যাত্মজ্ঞান।

ব্যগ্রতা, সকল ব্যস্ততা দেখা যায়। তিনি যা সত্য বলে মনে করেছেন, তা পরিপূর্ণ ভাবে কর্মে পরিণত করবার জন্য আয়াস করেছেন। এও তাঁর একান্ত বস্তুনিষ্ঠারই প্রমাণ দেয়। শুধু তত্ত্ব নয়, তত্ত্বের বাস্তব রূপায়ণ তিনি নিজ হাতে সম্পন্ন করে দিতে প্রয়াস পেয়েছেন—"একটি মাত্র চিন্তা আমার মাথার মধ্যে জ্বলিতেছে—সে চিন্তা হইল ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতির যন্ত্রটাকে চালু করা……। আমি বুঝি আমার কাজ ফুরাইয়া আসিয়াছে, বড়ো জোর আর তিন-চার বছর আমি বাঁচিব।……আমি দেখিতে চাই, আমার কাজের যন্ত্রটি সবল ও শক্তভাবে কাজ করিতেছে। অন্ততঃ পক্ষে ভারতে মানুষের কল্যাণের জন্য আমার যন্ত্রটা আমি চালু করিতে পারিয়াছি এবং সে যন্ত্র কেউ থামাইতে পারিবে না। একথা নিশ্চিতভাবে জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যেন মরিতে পারি।"…… এই উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশন নিজহাতে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি, আর ইচ্ছা করেছিলেন যে একটি স্ত্রী-মঠও প্রতিষ্ঠিত হোক 'নারী বিদ্রোহিনী' সৃষ্টির জন্য[১]।' এই উভয় মঠের কর্মীবৃন্দের জন্য তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন—"অনন্তজ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া" চাই; আর "আমরা সন্ন্যাসী, ভুক্তি, মুক্তি—সব ত্যাগ। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।" অর্থাৎ এঁরা হ'বেন মহৎ মানবিক ও বৈপ্লবিক আদর্শের ধারক, বাহক ও প্রচারক। ধর্মের এই অন্তর্নিহিত বিপ্লব-সত্তা, ধর্মাচরণকারীদের এই বিপ্লবীরূপ উদ্‌ঘাটন—বিবেকানন্দের মৌলিক ও অত্যন্ত ব্যবহারিক দিক হতে অতি মূল্যবান অবদান।

---

১। ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন—"I want a veritable lioness for India"

## অষ্টাদশ অধ্যায়

### বিবেকানন্দের রাষ্ট্রাদর্শ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ

"Freedom is the first condition of growth"

—*Vivekananda*

বিবেকানন্দ রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন না এবং নিজেকে তিনি নানাভাবে রাজনীতি হতে বিচ্ছিন্ন করেছেন। একটি পত্রে সুস্পষ্টভাবেই বলছেন "আমি রাজনৈতিক কর্মী নই, আমার কার্য আত্মার ক্ষেত্রে।" আবার বলছেন "আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।" সেজন্য রাজনৈতিক মতামত নিয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামান নি। কিন্তু রাষ্ট্র কিরূপ হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব আদর্শ ছিল, কারণ রাষ্ট্রাদর্শ সমাজাদর্শের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

স্বামীজী মনে করতেন যে ব্যক্তি বা সমাজের আদর্শ হবে "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" কর্মনীতি। এমন সমাজ ব্যবস্থা তিনি কখনও সমর্থন করতেন না যেখানে বহুর দাবী অস্বীকৃত হবে। যথা, হিন্দুসমাজের আদর্শ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে জনকতক ব্যক্তিকে ধর্মাচরণে সুযোগ দেবার জন্য অন্য সকলের ঐহিক-সুখ বিসর্জন দেওয়া, এজন্য সমগ্র জাতির দারিদ্রে নিমজ্জিত হওয়া, কখনও সমর্থন যোগ্য নয়। "……in all India, there are say hundred thousand really spiritual men and women. Now for the spiritualisation of these, must three hundred millions be sunk in savagery and starvation"—অর্থাৎ রাষ্ট্র এবং সমাজ বহুর সুখ-সুবিধা বিধান করবে এই ছিল তাঁর আদর্শ। কিন্তু তা' বলে তিনি হেগেল, গ্রীণ বা মার্কসের মত রাষ্ট্রের ও সমাজের যুপকাষ্ঠে ব্যক্তি-

স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়া—এও সমর্থন করতেন না। এ দিক দিয়ে তাঁর আদর্শ পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা।

তাঁর রাষ্ট্রাদর্শে সেজন্য বহুর মঙ্গল সাধনে ব্যক্তির সুখ-সুবিধা বর্জন নীতির সঙ্গে পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান আছে। এ সমস্যার সমাধানসূত্রটি তাঁর দেওয়া 'liberty' বা স্বাধীনতার সংজ্ঞার মধ্যে রয়েছে। তাঁর এ সংজ্ঞা হ'ল—"Liberty does not mean the absence of obstacles in the path of misappropriation of wealth etc., by you and me, but it is our natural right to be allowed to use our own body, intelligence or wealth according to our will, without doing harm to others ; and all the members of a society ought to have the same opportunity for obtaining wealth, education or knowledge।"[১] এর থেকে প্রতীয়মান স্বাধীনতাকে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মত নেতিবাচক অর্থে ধরেন নি, তার তিনি সমাজতন্ত্রবাদীদের মত একটি ইতিবাচক সংজ্ঞাই দিয়েছেন। এবং দেহ-মন-বুদ্ধির পূর্ণ ব্যবহারের সুবিধা এর প্রথম উপাদান। দ্বিতীয় উপাদান : ধনসম্পদ, জ্ঞানার্জন, বিদ্যালাভ—এ সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ। অর্থাৎ স্বাধীনতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধযুক্ত হ'ল সাম্য বা equality। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পাশ্চাত্য দেশে ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে হার্বার্ট স্পেন্সারের হাতে যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তাতে আর্থিক ক্ষেত্রে—উচ্চতর জীবনধারণের মানে—দরিদ্রদের কোন সুযোগদান অর্থহীন বলে বিবেচিত হয়েছিল। 'Survival of the fittest' তত্ত্ব আর্থিক ক্ষেত্রে এ অভিমতই এনে দিয়েছিল যে দরিদ্র যারা তারা টিঁকে থাকবার উপযুক্ত নয়। এই দারুন অশ্রদ্ধেয় মতের বিবেকানন্দ কঠোর সমালোচনা করেছিলেন—"...those who say that if the ignorant and the poor be given liberty i.e., full

১। Letter No.—387

right to their body, wealth, etc., and if their children have the same opportunity to better their condition and acquire knowledge as that of the rich and of the highly situated, they would be perverse—do they say this for the good of the society, or blinded by their selfishness ?" অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থের জন্যই লোকে বলে যে দরিদ্রগণ জীবনযুদ্ধে পরাজিত, তাদের টিঁকে থাকবার উপায় নেই। অতএব আমরা দেখছি মিল, স্পেন্সার, বেন্থাম প্রভৃতি উনিশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক মতানৈক্য রয়েছে।

কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয়-সর্বাত্মক-ক্ষমতার পক্ষপাতীও নন। এ বিষয়ে হেগেল, বোসাঙ্কে, গ্রীণ এবং মার্কস প্রভৃতি হতে তিনি ভিন্নমত পোষণ করতেন। অদ্বৈতবেদান্ততত্ত্বে বিশ্বাসী বিবেকানন্দ ব্যক্তির মুক্তিকে সর্বাপেক্ষা বড় স্থান দিতেন। সেজন্য মুক্তির আদর্শের পরিপন্থী সর্বপ্রকার সামাজিক ব্যবস্থার তিনি বিপক্ষে ছিলেন—"To advance oneself towards freedom, physical, mental and spiritual, and help others to do so is the supreme prize of man. Those social rules which stand in the way of unfoldment of this freedom are injurious, and steps should be taken to destroy them speedily."

সুতরাং তিনি মিল-পন্থী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নন, মার্কসপন্থী সর্বাত্মক-রাষ্ট্রীয়-ক্ষমতার সমর্থকও নন। তাঁর মতের যথাযথ বিচার করে দেখলে আমরা দেখি যে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদেরই প্রচারক, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পূর্বোক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর একখানি চিঠিতে তিনি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন[১]। তাঁর মত : ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমস্যা বিবেচনা করলে দেখা যায় সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জনের দোষগুণ দুই-ই বর্তমান। গুণের মধ্যে এই যে সমাজ-নির্দিষ্ট কর্মে

১। Letters—P. 387

ব্যক্তির নিপুণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর ক্রটি হ'ল এই যে এতে জীবন্ত মানুষ প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হয়। সর্বপ্রকার মানসিক ক্রিয়া, হৃদয়ের বিকাশ, জীবনের স্পন্দন, আশার উদ্দীপনা, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, আনন্দ ও দুঃখের তীব্রতাবোধ—কিছুরই স্ফুরণ হয় না, এবং সৃজনী প্রতিভা, নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা, নূতনের প্রতি আকর্ষণ সেখানে পরিস্ফুট হয় না। এ সকল মানুষের মনের উপর চির-কুজ্‌ঝটিকার রাজ্য বিরাজ করে, চির-রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে সেখানে উষার আলো কখনও দেখা দেয় না। মনের ভালমন্দ বিচারশক্তি সমূলে বিনষ্ট হয়, শ্রেয়তর অবস্থা থাকতে পারে তা তখন তার দুর্বল কল্পনা-শক্তি চিন্তাও করতে পারে না; যদিও বা পারে, বিশ্বাস করবার মত শক্তি সে খুঁজে পায় না; বিশ্বাস যদিও বা হয়, সে অবস্থালাভের জন্য তার প্রয়াসের অভাব থাকে, এমন কি প্রয়াস যদিও বা থাকে, উদ্দীপনা থাকে সম্পূর্ণ মৃত। এরূপ অবস্থায় ভালর কোন মানে নেই। গাছপালা, স্টীমার, রেল-এঞ্জিন আপন কাজ করে যায়। এ সকল প্রাণহীন বস্তু, ভালও নয়, মন্দও নয়। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র কীট ট্রেন আসতে দেখে পলায়ন করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারে। সুতরাং ইচ্ছাশক্তির স্বাধীন স্ফুরণের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। স্বামীজীর মতে—"Greater is the happiness, higher is the Jiva, in proportion as this will is more successfully manifest. The will of God is perfectly fruitful and therefore He is the highest"। অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির বিকাশের উপরই জীবনের সার্থকতা ও কল্যাণ নির্ভর করে। অতএব ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিক কল্যাণপ্রদ। সেইজন্য স্বামীজী যে কোন প্রকার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বিকাশের পক্ষপাতী ছিলেন—"It is more blessed, in my opinion, even to go wrong impelled by one's free will and intelligence than to be good as an automaton"। সুতরাং একমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ কল্যাণপ্রদ; এর অন্যথা হ'তে

পারে না—"...can that be called society which is formed by an aggregate of men who are like lumps of clay, like lifeless machine, like heaped up pebbles? How can such a society fare well?"[১]

তাহ'লে সমাধান কি? ব্যক্তিস্বাধীনতা না সমাজের সকলের যৌথ-মঙ্গল? স্বামীজী এর অতি সুন্দর সমাধান নির্দেশ করেছেন। তা হ'ল এই যে যখন ব্যষ্টির জন্য স্বতঃস্ফূর্ত ত্যাগ উদিত হবে, তখনই সামাজিক প্রাধান্যের নিকট ব্যক্তির আত্মত্যাগ কল্যাণপ্রদ হ'বে। স্বাধীনভাবে, স্বেচ্ছায়, আইনদ্বারা বাধ্য হয়ে নয়, বুদ্ধের মত সহানুভূতির দ্বারা উদ্বোধিত হয়ে, সর্ব জীব সর্ব মানবের প্রতি প্রেমভাবে ব্যক্তির সুখ-ত্যাগই শ্রেয়। অন্য কোন প্রকারে ব্যক্তির উপর সমাজের আধিপত্য বাঞ্ছনীয় নয়। সেজন্য আমরা দেখি স্বামীজী ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' মন্ত্র যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সমাজ বহুর কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হ'বে। কিন্তু ব্যক্তিকে আইনদ্বারা তার স্বাধীন ইচ্ছা বিসর্জন দিতে বাধ্য করবে না। মঙ্গল ইচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে স্বাধীন মানুষ সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের কাছে স্বেচ্ছায় মাথা নত করবে—এই ছিল বিবেকানন্দের রাষ্ট্রীয় আদর্শ।

সেজন্যই সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি বাহুবল প্রয়োগ সমর্থন করেন নি। তাঁর কথা: "I believe in evolution, in slow growth"। এবং তাঁর মতে—"Freedom is the first condition of growth।" এজন্য তাঁর মত: সর্বাগ্রে জনসাধারণকে ধারণা দিতে হ'বে, তারপর তাদের নিজের ভাগ্য তারা নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবে। তাদের জ্ঞানের জীবনে উত্তীর্ণ করতে হ'বে, বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত করতে হ'বে, শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে হ'বে, তখন তারা নিজেরা নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ণয় করে যথার্থ কল্যাণ-সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে।

---

১। Letters—P. 205

বিবেকানন্দ এ সমস্ত আলোচনাটা করেছেন সমাজতন্ত্রবাদের পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ এইখানেই তিনি সমাজতন্ত্রবাদের নিম্নোক্তরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন—"The doctrine which demands the sacrifice of individual freedom to social supremacy is called socialism, while that which advocates the cause of the individual is individualism।" নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রাদর্শে বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ গণতন্ত্রী। বর্তমান পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংঘর্ষ। বিবেকানন্দ তার একটি সুন্দর সমাধান দিয়েছেন। অবশ্য মনে রাখতে হ'বে বিবেকানন্দ ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। ধনতন্ত্রের শোষণ, বিশেষ-সুবিধা ব্যবস্থা, একচেটিয়া সুবিধার প্রসার—এ সকলের তিনি সমালোচনা করেছিলেন কঠোরভাবে—"যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুটোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুটছে, শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশদেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে—জিত হ'লে, তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো ত সেখানেই মারা গেল।"[১] ধনতন্ত্র যতই গণতন্ত্রের কাঠামোর ভিত্তিতে দাঁড়াক, তা পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদে, এই হ'ল বিবেকানন্দের কথার তাৎপর্য। বিবেকানন্দের একথাগুলির প্রতিধ্বনি আছে লেনিনের 'Imperialism' শীর্ষক গ্রন্থে। সে যাই হোক, আমাদের সিদ্ধান্ত বিবেকানন্দের রাষ্ট্রাদর্শ সর্বাত্মক-ক্ষমতাশালী-রাষ্ট্র-ভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদ নয়, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত অভিনব এক সমাজতন্ত্রবাদ। Delisie Burns তাঁর সুবিদিত গ্রন্থ 'Political Ideals'এর শেষাংশে বলছেন—"If we could imagine an ideal at once individualistic and socialistic, such would be the effective ideal for the most thinking men।" কারণ বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব হ'ল আসল আদর্শ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বৈচিত্র্যের উপর জোর দেয়, গণতন্ত্রের উপর জোর

১। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (পৃঃ ২৫)।

দেয়, আর সমাজতন্ত্রবাদ দেয় সকলের যৌথ মঙ্গলের উপর—অর্থাৎ একত্বের উপর। তাই উভয়কেই প্রয়োজন। তাই Burns আরও বলেছেন—"The individualist is right in aiming at the variety of individuals, and so is the socialist in impressing on all their common interest, for the fullest development of each is to be found in the performance of his function in the life of the whole।" তাই দেখা যাচ্ছে, যা অধিকাংশ চিন্তাশীলব্যক্তি কামনা করেন—ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয়—বিবেকানন্দের রাষ্ট্রাদর্শে তাই সুন্দররূপে মূর্ত।

# ঊনবিংশ অধ্যায়

## বিবেকানন্দের সহিত প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদের সংযোগ

"Is it possible for the Hindu race to be Russianised"?
—*Vivekananda*

আমরা আমাদের পূর্ববর্তী অধ্যায়সকল আলোচনা কালে দেখেছি যে মার্কস-এর সঙ্গে বিবেকানন্দের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য কেবল শ্রেণী শোষণ ও সংগ্রামের ধারণা সম্পর্কে, আর প্রতিটি বিষয়েই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি অধ্যাত্মবাদ আর মার্কস-এর জড়বাদ। মার্কস মনে করেছেন ধর্ম শোষণের যন্ত্র, বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন ধর্ম শোষণের অবসান। মার্কস মনে করেছেন ধর্মবিশ্বাসের উৎপত্তি আদিম মানুষের অপরিণত মনের ভয় ও কুসংস্কার হতে, বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন ধর্মের উৎপত্তি মানুষের ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করবার স্বাভাবিক প্রেরণা হ'তে। বিবেকানন্দের মতে ধর্মের মূল কাজ আমাদের জড়তা দূর করা, শক্তি দেওয়া, নির্ভীক করে তোলা, আত্মার জাগরণ ঘটানো ও সক্রিয় করে তোলা, আর মার্কস-এর মতে ধর্ম হ'ল "opium of the people"। বিবেকানন্দ ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং 'Historical-Scientific-Spiritualism'-এর প্রতিষ্ঠা করেছেন, মার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং 'Historical-Scientific-Materialism'-এর প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিবেকানন্দ 'তরঙ্গাকারে উন্নতি তত্ত্বে' বিশ্বাসী, আবার মার্কস 'সরল রেখায় উন্নতি-তত্ত্বে'। মার্কস-এর মতে সভ্যতার অবনতির মূলে ধর্ম কাজ করেছে, উন্নতির চরম-সোপানে ধর্ম শূন্যে বিলীন হবে এবং বস্তুবাদ থাকবে, আর বিবেকানন্দের মতে ধর্মই সভ্যতার প্রাণশক্তি—সমাজের অধঃ-পতনের কারণ ধর্ম নয় জড়বাদ, এবং সভ্যতার উন্নতি আধ্যাত্মিকতাকে

আশ্রয় করে ঘটে, উন্নততম সমাজে ধর্মের প্রতিষ্ঠা হবে তার কেন্দ্রে। রাষ্ট্রাদর্শের ক্ষেত্রেও দেখি মার্কস ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন স্থান দেন নি, বিবেকানন্দ ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিবেকানন্দ সর্বাত্মক বিপ্লব চেয়েছেন—আত্মিক ও ঐহিক, মার্কস শুধু আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লবের কথা বলেছেন। বিপ্লবী-কর্মীগণ বিবেকানন্দের মতে আসবেন সন্ন্যাসীদের কেন্দ্র করে, আর মার্কস-পন্থীগণ সন্ন্যাসীদের কোতল করবার ব্যবস্থা সমর্থন করেন। বিবেকানন্দ রাজনীতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেন নি এবং তাঁর ধারণা রাজনৈতিক বিপ্লব আত্মিক বিপ্লবের পরিণামে আপনা হতেই সিদ্ধ হবে। আর মার্কস রাজনীতিকেই প্রধান আশ্রয় করেছেন, তাঁর কর্মনীতির মূল লক্ষ্য রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করা।

এর থেকে আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে বিবেকানন্দ আর যাই হোন মার্কসপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী নন। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে তাঁর অনুজ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের এ সিদ্ধান্তও ভুল যে পাশ্চাত্যের সমাজ-বিপ্লবীদের সম্পর্কে এসে তিনি সমাজতন্ত্রবাদী হয়েছিলেন। অবশ্য পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদীদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। আমরা জানি প্যারিস্ মেলায় তাঁর প্রিন্স ক্রোপটকিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনা ও পত্রে এ সংযোগের প্রমাণও দিয়েছেন। যথা, 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে তিনি Socialist, Anarchist ও Nihilist-দের উল্লেখ করেছেন। পত্রাবলীতে তিনি সমাজতন্ত্রবাদের একটি সংজ্ঞাও দিয়েছেন—"The doctrine which demands the sacrifice of the individual freedom to social supremacy is called socialism, while that which advocates the cause of the individual is called individualism।" সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। যথা, মিসেস লেগেটকে এক পত্রে তিনি লিখছেন "শুনে আশ্চর্য হবেন যে, অনেক চিন্তাশীল ইংরেজ নরনারী মনে করেন যে হিন্দুদের জাতি-বিভাগই সামাজিক সমস্যার একমাত্র সমাধান। আপনি হয়তো

কল্পনা করতে পারবেন না, সেই ধারণা মাথায় নিয়ে তারা সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদের ঘৃণা করে"।[১] সর্বাপেক্ষা অধিক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি আমরা এ সম্বন্ধে পাই তাঁর মিস্ ম্যাকলাউডকে লেখা একখানি চিঠিতে—"What the learned friend of A—says about Russia is almost the same I think myself. Only there is one difficulty of thought—is it possible for the Hindu race to be Russianised ?" এ উক্তি তাঁর পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদী ও বিপ্লবকর্মীদের সঙ্গে সংযোগ ও তাদের কার্যকলাপের মূল্যায়ণ ইঙ্গিত করছে বলে মনে হয়। ভারতীয়গণের পক্ষে রুশীয় হওয়া অসম্ভব এবং ভারতকে তাঁর নিজের পথেই চলতে হবে—এই ইঙ্গিত দিয়েই তিনি প্রসঙ্গটির পরিসমাপ্তি করেছেন। তাই অন্যস্থলে তিনি ভারতের সম্মুখে উন্নতির পন্থা নির্দেশকালে বলেছেন—"ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নহে, চৈতন্যের শক্তিতে, বিনাশের বিজয় পতাকা লইয়া নহে, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া সন্ন্যাসীর বেশ সহায়ে, অর্থের শক্তিতে নহে, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে।" সুতরাং আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে রুশীয় বিপ্লববাদীদের মতকে তিনি যথাযথ বিচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। যদিও তখনও বলশেভিক দলের জন্ম হয় নাই আর মাও সে তুঙ্‌ও জন্ম নেন নি, তথাপি তিনি এ সম্পর্কে তাঁর ইতিহাসের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় জ্ঞান-সহায়ে অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য Miss Macleod-এর যে চিঠিখানার উত্তরে বিবেকানন্দ রুশীয় পন্থা সম্বন্ধে উপরোক্ত উক্তি করেছেন, তা যদি প্রকাশিত হ'ত আমরা এ সম্পর্কে আরও তথ্য পেতাম।

এ ছাড়া তাঁর কলম্বো বক্তৃতায় তিনি সমাজতন্ত্রবাদের উল্লেখ করেছেন এবং 'শ্রম ও মূলধনের সম্পর্ক' কথাটা উল্লেখ করেছেন। মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর যে ভালমত পরিচয় ছিল, এ হ'ল তার প্রমাণ।

---

১। ২১৬ নং পত্র।

সমাজশাস্ত্র ও ইতিহাসে সুগভীর বুৎপত্তিহেতু আর গণ-মানসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে স্বামীজী জানতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত রয়েছে, জানতে পেরেছিলেন যে শূদ্রবিপ্লব আসন্ন এবং পাশ্চাত্য মার্কস-গোষ্ঠীভুক্ত সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে তিনি সুস্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন কি পন্থাবলম্বনে তা ঘটতে চলেছে, কাদের দ্বারা আর কোথায়। বিধিনির্দেশই হয়তো তাঁর সঙ্গে পাশ্চাত্য বিপ্লববাদীদের সংযোগ ঘটেছিল। কারণ এরই ফলে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের কতটুকু মূল্য বা স্থান তা তিনি নির্দেশ করে গেছেন "...half a loaf is better than no bread।" তাকে স্বাগতও জানিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার নবরূপায়ণ, যাকে আমরা দেবরূপায়ণও বলতে পারি, তাও করে গিয়েছেন এবং সর্বোপরি এই উচ্চতর বিপ্লবসাধনে আত্মনিয়োগ করে গিয়েছেন।

সেইজন্য আমাদের সিদ্ধান্ত বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বতন্ত্র।

---

'স্বামীজীর অস্ফুট' স্মৃতি পুস্তিকার লেখক শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন স্বামীজীর সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদীদের সংযোগ সম্বন্ধে। এই পুস্তিকায় একস্থলে স্বামীজী বলছেন—"লণ্ডনে ইনি ( Edward Carpenter ) অনেক সময় আমার কাছে এসে বসে থাকতেন। আরও অনেক Socialist Democrat প্রভৃতি আসতেন। তাঁরা বেদান্তোক্ত ধর্মে তাঁদের নিজ নিজ মতের পোষকতা পেয়ে বেদান্তের উপর খুব আকৃষ্ট হতেন।"

## বিংশ অধ্যায়

### বিবেকানন্দের শক্তিবাদ ও সক্রিয়তাধর্মী সমাজ-দর্শন : বৈদান্তিক নীতিতত্ত্ব

"I will drink the ocean, at my will
mountains will crumble up"—*Vivekananda*

এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে বিবেকানন্দের অভিনব সমাজ-দর্শন নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত—'জীবের দেবত্ব', জীবনের অপ্রতিরোধ্য আধ্যাত্মিক প্রবণতা', 'বিশেষ-সুবিধা-তত্ত্ব', 'বহুত্বের মধ্যে একত্ব' 'ইতিহাসের চক্রপথে বিবর্তন' 'ক্রমবিকাশ-ক্রমসঙ্কোচন 'প্রক্রিয়া' 'ধর্ম ও পুরোহিততন্ত্রের মৌলিক প্রভেদ' 'বিশেষ-জাতীয়-সংস্কৃতিতত্ত্ব' 'ব্যক্তি স্বাধীনতাবাদ' 'শ্রেণীসংগ্রামবাদ' 'আধ্যাত্মিকতায় সভ্যতার প্রাণশক্তি' ইত্যাদি তত্ত্ব। এর প্রত্যেকটিকেই তিনি বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সহায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ছাড়া আমরা দেখি যে বিবেকানন্দ আমাদের একটি অতি বাস্তব বৈপ্লবিক কার্যসূচীও দিয়েছেন—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় : "He gave an advanced social revolutionary programme"।

কিন্তু এ পর্যন্ত লক্ষ্য করলেই যে বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়। আধ্যাপক বিনয় সরকারের মতানুসারে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী প্রত্যেককে প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন করতে, সমাজের অন্যায় শাসনের নিগড় ভেঙ্গে ফেলতে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে, আর উদ্‌বুদ্ধ করছে ভারতকে সর্বপ্রকার ঐহিক উন্নতি সাধন করতে। স্মরণাতীত কাল হতে হিন্দু শক্তিবাদ বিশ্বকে সঞ্জীবিত করেছে, অগ্রগতির পথে নিয়ে চলেছে তাকে,—সেই শক্তিবাদই পুনর্বার মূর্ত বিবেকানন্দ ও তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে।

এই মতের উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা বিবেকা-নন্দের সমাজ-দর্শনের আরও একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই, তা' হ'ল

এর সক্রিয়তাধর্ম ও শক্তিবাদ। এ সমাজ-দর্শনের ব্যবহারিক দিক হ'তে একটিই মাত্র মূলকথা আছে—'চরৈবেতি'। বিবেকানন্দ দর্শন-প্রণেতা নন, বাস্তবজীবন হতে দূরে বসে ভেবে ভেবে কোন নূতন দর্শনতত্ত্ব উদ্ভাবন তিনি করে যান নি। তিনি একমাত্র প্রয়াস করেছেন বহু মানুষকে বহু প্রকার বন্ধন-শৃঙ্খল হতে মুক্তি দিতে। এই প্রয়াসই তাঁর সমাজ-দর্শনের মূল উৎস। তত্ত্ব ব্যতীত কর্ম উদ্দেশ্যহীন এবং বিশৃঙ্খল কর্ম কখনও সফল হয় না। সেজন্যই তাঁর তত্ত্ব উদ্ভাবন। এ তত্ত্ব প্রধানতঃ 'light-bearing' ( তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ ) নয়, প্রধানতঃ 'fruit-bearing' ( ফলপ্রদ )। এজন্য তাঁর তত্ত্ব কর্মের তত্ত্ব, সক্রিয়তার তত্ত্ব, শক্তির তত্ত্ব, গতির তত্ত্ব। তিনি নিজ কর্ম-সাধনের জন্য হাজার হাজার মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করেছেন দ্রুতবেগে, সারা পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে আর একপ্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছেন ঝঞ্ঝার মতো, দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়েছেন, পরিশেষে এই কর্ম সম্পাদন করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের মত একদিন মৃত্যুকে বরণ করেছেন। এই ঝঞ্ঝা-গতিই সেইজন্য তাঁর দর্শনে অন্যতম প্রধান মতবাদরূপে স্থান পেয়েছে—তাঁর নিজের এই শক্তি, বীর্য ও নির্ভীকতা নীতিসূত্ররূপে দেখা দিয়েছে তাঁর সমাজ-দর্শনে। এই নীতিসূত্রগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অভিনব।

তিনি যা কিছু বলেছেন সে সবের মধ্যে এই 'সক্রিয়তা' লক্ষণীয়। যথা, তাঁর ধর্ম হ'ল "দেবত্বের বিকাশ", শিক্ষা 'পূর্ণত্বের বিকাশ'—"জীবন হ'ল নিরন্তর সংগ্রাম।" অর্থাৎ বিকাশ—manifestation, রূপান্তর ক্রিয়া—এই হ'ল তাঁর মোটকথা।

এজন্য তাঁর নীতি-নির্দেশ হ'ল—"Strength is life ; weakness is death, strength is felicity, life eternal, immortal ; weakness is constant strain and misery ; weakness is death।" এবং দৈবশক্তি নয় আত্মশক্তির কথাই তিনি বলেছেন। আত্মশক্তি আনে বিপুল অধ্যবসায় যার কাছে সকল প্রতিকূলতাই দূর হয়—"I will drink the ocean, says the

persevering soul, at my will mountains will crumble up"; have that sort of energy, that sort of will, work hard and you will reach the goal"। তাঁর মতে সমুদ্র-পর্বত লঙ্ঘন করবার দৃঢ়তা চাই, তবেই মানুষ মানুষ। নির্ভীকতা ব্যতীত এই দৃঢ়তা—সমুদ্র শোষণ ও পর্বত চূর্ণ করবার এ সুদৃঢ় সঙ্কল্প লাভ হয় না। সুতরাং এই নির্ভীকতাকেই তিনি বিশেষ করে তুলে ধরেছেন সকলের সামনে—"The religion that ought to be taught is the religion of fearlessness"। তাঁর মতে ধর্ম এই ভয়শূন্যতা এনে দেয়, মানুষকে অশেষ শক্তিমান করে তোলে, তাকে জগত-সংসারে সম্রাটের আসন দেয়। বেশীর ভাগ মানুষই দাসের ভূমিকায় জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ মানুষকে সর্বপ্রকার বন্ধন হ'তে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, দিতে চেয়েছিলেন তাকে এক ভয়হীন, মৃত্যুঞ্জয়ী সর্বশক্তিমান স্বাধীন সম্রাটের জীবন।

বিবেকানন্দের সক্রিয়তাধর্মী সমাজ-দর্শন তাই আমাদের কয়েকটি নূতন বাস্তব কর্ম-সূত্র দিয়েছে,—"এগিয়ে চলা", "শক্তিমান হওয়া", "আত্মশক্তিতে জাগ্রত হওয়া", "সমুদ্র-পর্বত লঙ্ঘন করবার দৃঢ়তা অর্জন", "জ্যোতির্ময় আত্মস্বরূপকে প্রকাশ করা"। এ কয়টির উপর ভিত্তি করে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের নূতন সংজ্ঞা দিয়েছেন বিবেকানন্দ। সেইজন্য তাঁর এই নীতিতত্ত্ব তাঁর সমাজ-দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ নীতিতত্ত্বের ভিত্তিতে না দাঁড়ালে কোন কিছুই বাস্তব হয়ে ওঠে না। তাঁর এই নীতিতত্ত্বের মূল কথাগুলি সূত্রাকারে দিয়েছেন তিনি। যথা :

১। "যে কর্মের দ্বারা আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম। যদ্দ্বারা অনাত্মভাবের বিকাশ তাহাই অকর্ম"।

২। "অনন্ত শক্তিই ধর্ম বা ঈশ্বর"।

৩। "শক্তিই পুণ্য, দুর্বলতাই পাপ"।

৪। "শক্তিই জীবন আর দুর্বলতাই মৃত্যু"।

৫। "শক্তিই সর্বসুখের আকর, অমৃতত্ব ও অনন্ত জীবন, দুর্বলতা নিরন্তর দুঃখ ও অশান্তি"।

৬। "যাহা কিছু বলপ্রদান করে তাহাই অনুসরণীয়। অন্যান্য বিষয়েও যেমন ধর্মেও তদ্রূপ। যাহা তোমাকে দুর্বল করে, তাহা একবারেই ত্যাজ্য"।

৭। "যাহা স্বার্থপর তাহাই নীতিবিরুদ্ধ, যাহা নিঃস্বার্থপর তাহাই নীতিসঙ্গত"।

৮। "সম্প্রসারণই জীবন—সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু ; প্রেমই জীবন, দ্বেষই মৃত্যু।"

৯। "জ্ঞানই জীবন, অজ্ঞানতাই মৃত্যু"।

১০। "যাহা কিছু উন্নতি পরিপন্থী বা অধঃপতনের সহায় তাহাই পাপ, আর যাহা কিছু উন্নত হইতে সাহায্য করে তাহাই পুণ্য"।

এগুলি এত অর্থবহ যে অধিক টীকা সংযোজনা নিষ্প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে এগুলি সমাজ-সংসারের রক্ষাকবচ, শোষণ ও অবক্ষয় নির্মূল করবার প্রধানতম অস্ত্র। সমাজ-জীবনে এই শক্তি-মন্ত্র-ভিত্তিক নীতি-সূত্রগুলির মূল্যনির্দেশ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলছেন— "Strength is the one thing needful. Strength is the medicine for the world's disease. Strength is that the poor must have when tyrannised over by the rich. Strength is the medicine which the ignorant must have when oppressed by the learned. And it is the medicine the sinners must have when tyrannised by other sinners".

যে কোন অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের সমাজদর্শনের বৈজ্ঞানিকত্ব, যুক্তিবত্তা—এ সব কিছুর সঙ্গে এর এই dynamism ও strength 'সক্রিয়তা ও শক্তি'র বাণী বিশেষ ভাবে ধরা পড়ে। এই সক্রিয়তা-বৈশিষ্ট্য এক বিপুল কর্মপ্রেরণা, অগ্রগতির নিদারুণ গতিবেগ, বিস্ময়কর ভয়হীনতা ও ত্যাগ ও অপরিসীম বীর্য এনে দেয়।

তাই মনীষী বিনয় সরকার আমাদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে বলেছেন—"And it is under the inspiration of this synthesis that an India of secular activities and cultural adventure, an India of materialistic social service—has been absorbing the interests of constructive thinkers and statesmen of young India."

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শনের অন্যতম মূলতত্ত্ব এই সক্রিয়তার মন্ত্র ও শক্তিবাদ। একে বাদ দিলে এ সমাজ-দর্শনের অনেকখানি মূল্য হারিয়ে যায়। এ বৈশিষ্ট্যের দরুনই তাঁর সমাজ-দর্শন বিশেষ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে।

# একবিংশ অধ্যায়

## বিবেকানন্দের বস্তুবাদ

"Vivekanda is the father of modern materialism in India" —*Benoy Sarkar*

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত ভ্রান্তমত যা আজ আমাদের দেশের তরুণচিত্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে, তাহ'ল এই যে, বিবেকানন্দ ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে 'Materialism' গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এ মতের সমর্থনে বিবেকানন্দের কয়েকটি উক্তি পাওয়া যায়—"We talk foolishly against material civilisation," "The terrible mistake of religion was to interfere in social matters···Hands off, keep yourself to your own bounds and everything would come right" ( Letters—P. 84 )। স্পষ্টতঃ তিনি এ কথা পুরোহিতদের লক্ষ্য করে বলেছেন। একই চিঠির পরবর্তী পৃষ্ঠায় তার উল্লেখও আছে—"What business had the priest to interfere, to the misery of millions of human beings, in every social matter ?" বলছেন আর এক জায়গায় "The grapes are sour ···no priestcraft, no social tyranny"। এবং আমরা পূর্বেই দেখেছি যে পুরোহিত-তন্ত্রের আবির্ভাবের জন্য তিনি দায়ী করেছেন জড়বাদকে, ধর্মকে নয়। তাঁর সম্পর্কে এ ভ্রান্তির উৎস ডাঃ ভূপেন দত্তের মত মার্কসবাদীগণ, কারণ তারা নিজেদের মতের পরিপোষক হ'বে বলে বিবেকানন্দের কয়েকটি মাত্র উক্তিকে বিছিন্ন করে গ্রহণ করেছেন।

তথাপি এও সত্য যে জড়বাদকে তিনি গ্রহণও করেছেন এবং অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের এ মতও সত্য যে—"Vivekananda

is the father of modern materialism in India"। আমরা দেখেছি যে অনুন্নত ভারতের আর্থিক উন্নতি তিনি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করেছেন, ভারতবর্ষের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য তিনি সর্বপ্রকার ঐহিক উন্নতির প্রয়াস চেয়েছেন, এমনকি নিজে সন্ন্যাসী হয়েও একথা বলেছেন: "Material civilisation, nay, even, luxury is necessary to create work for the poor"। বলেছেন আরও—"Bread, bread, I do not believe in a God that cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven"। এ সম্পর্কে তাঁর মত এই যে, যে কোন দেশেই সর্বকালে আধ্যাত্মিকতার পথে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তি চলতে পারে। এ পথ সর্বসাধারণের পথ নয়। অতএব জাগতিক উন্নতি চাই। চাই ঐহিক জীবনে প্রসার ও সম্পদ-সৃষ্টি। স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য ও আত্ম-মুক্তির জন্য সমগ্র দেশের সর্বসাধারণকে ঘোর দারিদ্র্যে নিপতিত করা তিনি অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করেছেন।

তথাপি তিনি চেয়েছেন সমাজের মূলকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হ'বে 'দেবত্বকে', এবং সব মানুষকে দেবত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দিতে হ'বে। যে যতটা পারবে তাতেই সে শক্তিমান হবে, বীর্যবান হ'বে। তাছাড়া সভ্যতার মূলে আধ্যাত্মিকতার আদর্শের প্রতিষ্ঠা না হলে পরিণামে হয় বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি, সংঘর্ষ আসে এবং অবশেষে ধ্বংস। পৃথিবীশুদ্ধ লোককে সন্ন্যাসী হ'তে হ'বে একথা তিনি বলেন নি, বলেছেন কর্মে, আচরণে জীবনের স্ব স্ব ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকে যেন দেবত্ব, শক্তি ও শুভবুদ্ধি প্রকটিত করতে পারি। তাহ'লে একজন ছাত্র হবে ভাল ছাত্র, একজন গৃহী ভাল গৃহী, একজন মৎসজীবি আরও ভাল মৎসজীবি—তাঁর ভাষায়: "তুমি যে কর্মই কর না কেন, তোমার জন্য বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের এই সকল মহানতত্ত্ব অরণ্য অথবা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটীরে, মৎসজীবির গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে, সর্বত্র এই

সকল তত্ত্ব, কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালক বালিকা, যে যে কার্য করুক না কেন, যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। অতি অল্প কর্মও যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইলে অদ্ভুত ফললাভ হয়; অতএব যে যতটুকু পারে করুক। মৎস্যজীবি যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবি হইবে; বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হইবে।" এ কথাগুলির তাৎপর্য আজকের দিনে অত্যন্ত ভাল করে অনুধাবন করতে হবে। স্বামীজী বলেছিলেন, 'যে ভগবান মানুষকে অন্ন দিতে পারে না, সে ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না' বলেছিলেন 'শঙ্খ ঘণ্টা পূজো ফুজো ফেলে দে, বিরাটের পূজা কর', বলেছিলেন 'আমি সমাজতন্ত্রবাদী'। এই তিনটি কথা একসঙ্গে যুক্ত করে নিয়েই কেউ কেউ বলেন যে স্বামীজী সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে ধর্মকে বর্জন করে 'বস্তুবাদী' হ'তে বলেছেন। এ অত্যন্ত ভ্রান্ত মত। স্বামীজী বস্তুনিষ্ঠ হতে বলেছেন, বেদান্তের প্রচারিত তত্ত্বকে কর্মে পরিণত করতে বলেছেন, জড়বাদী হ'তে বলেন নি। তাঁর মত : "মানুষের অন্তরে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহা উদ্বুদ্ধ হইলে মানুষ অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সব কিছুই অনায়াসে করিতে পারে।" এবং "আত্মার এই অনন্ত শক্তি জড়ের উপর প্রয়োগ করলে জগতের উন্নতি হয়, চিন্তার উপর প্রয়োগ করলে মনীষার বিকাশ হয় এবং নিজের উপর প্রয়োগ করলে মানুষ দেবতা হইয়া যায়।" এই উক্তি হ'তে দেখা যাচ্ছে ঐহিক উন্নতিও তিনি আধ্যাত্মিক জাগরণের দ্বারা সম্ভব বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ তাঁর 'বস্তুবাদ'-ও (materialism) অধ্যাত্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দার্শনিক দিক হতেও আমরা দেখি তিনি বস্তুবাদকে সর্বথা পরিত্যজ্য বলেননি। অদ্বৈতবেদান্ত-তত্ত্বের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের সামঞ্জস্য-সূত্রও তিনি উদ্ঘাটিত করে গেছেন—"It seems clear that the conclusions of the modern materia-

listic science can be acceptable, harmoniously with their religion, only to the Vedantins or Hindus as they are called. It seems clear that modern materialism can hold its own and at the same time approach spirituality by taking up the conclusions of the Vedanta. It seems to us that the conclusions of modern Science are the very conclusions of the Vedanta, only they are written in the language of matter।" এখানে বিবেকানন্দ অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলছেন একমাত্র বেদান্তই জড়বাদকে গ্রহণ করতে পারে, একমাত্র হিন্দুগণই ধর্মের সঙ্গে জড়বাদকে সমন্বিত করতে সক্ষম। বিজ্ঞান আজ যে সিদ্ধান্ত দিচ্ছে হিন্দুধর্ম তা বহুকাল পূর্বে দিয়েছে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানবাদ বিশ্বের ঐক্য খুঁজে পেয়েছে পদার্থের মধ্যে, আর বেদান্ত পেয়েছে আত্মায়। একত্ব এ উভয়েরই প্রতিপাদ্য বিষয়। এজন্য আধুনিক বিজ্ঞান ও অদ্বৈতবাদ একই সামঞ্জস্য-সূত্রে গ্রথিত। অবশ্য বেদান্ত আর এক পা অধিক এগিয়েছে, পদার্থের অন্তর্নিহিত চৈতন্যময় বস্তুকে দেখিয়েছে। অতএব ঐক্য-দর্শন হিসাবে বেদান্তই শ্রেষ্ঠ দর্শন, সেজন্য বিভিন্ন ঐক্য-দর্শন বেদান্তের মধ্যে একই সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে—"বর্তমান যুগের যত ভাবান্দোলন আছে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেগুলি এক অপূর্ব ঐক্যমূলক দর্শন—অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিরূপ ; আর মানব আজ পর্যন্ত যত প্রকার একত্ব-দর্শন আবিষ্কার করিয়াছে তন্মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম।" অদ্বৈতবেদান্তের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ—"তা জড়কে অতিক্রম করে গিয়েছে।" বিবেকানন্দের সমসাময়িককালে বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন যে এই একবস্তু পদার্থ নয়, ঘনীভূত শক্তি, কোন কোন হিন্দুদর্শন এই শক্তিপুঞ্জের উপর গুরুত্ব দেয় এবং তাকে 'তন্মাত্রা' নামে অভিহিত করে। কে জানে হয়ত এমন একদিন আসবে যে দিন বিজ্ঞান বলবে এই শক্তিপুঞ্জ চৈতন্য-স্বরূপ। বস্তুতঃ বিবেকানন্দের পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের উন্নতি দর্শন ও বিজ্ঞানকে একই সংযোগস্থলে ( cross-road ) এনে দাঁড়

করিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের মোট প্রতিপাদ্য আজ বিবেকানন্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবেদান্ত-তত্ত্বের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়।[১]

---

১। "For this modern science matter has become but a condensed form of energy which dematerialises into radiation. The material atom is already dissolved into more than thirty "non-material, criptic, arcane, perplexing, enigmatic and inscrutable" elementary particles : 'the electron and the anti-electron, the proton and the anti-proton, the pheton, the meson, etc., or into the image of waves which turn into the waves of probability, waves of consciousness which our thought projects afar'..."। অর্থাৎ পদার্থ নয় বিশ্বের মূলে চৈতন্যসত্তাই অবস্থিত—তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট পাওয়া যায়।—P. A. Sorokin—'Three Basic Trends of Our Time.'

# দ্বাবিংশ অধ্যায়

## সমন্বয়াচার্য বিবেকানন্দ ও তাঁহার পূর্ণাবয়ব সমাজ-দর্শন

"In two words equilibrium and synthesis the constructive genious of Vivekananda can be summed up"— *Romain Rolland.*

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের যে সক্রিয়তাধর্মী সমাজ-দর্শনের পরিচয় আমরা পেয়েছি তা হ'ল পূর্ণাবয়ব। অর্থাৎ এগুলি বিচ্ছিন্ন কতকগুলি উক্তি বা ঈঙ্গিতমাত্র নয়, তা যদি হ'ত তাহলে সেগুলির মধ্যে আমরা অসঙ্গতি ও পরস্পর বিরোধিতা দেখতাম। কিন্তু আমরা দেখছি যে এ বিষয়ে তাঁর সমগ্র চিন্তাধারা দৃঢ়সন্নিবদ্ধ একটি লজিকাল পদ্ধতি, একটি স্তরের সঙ্গে অপরটি অতি সুন্দর সম্বন্ধযুক্ত। এবং এর মধ্যে আমরা সমাজবিকাশের এক অভিনব নূতন চিত্র পেয়েছি। সমাজের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের মূল উদ্দেশ্যের, সমাজ-বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের বিকাশের সংগতি—অতি সুন্দর ভাবে এতে প্রদর্শিত হয়েছে। এ সংগতি ইতিপূর্বে মার্কসীয় দর্শনে বা অন্যান্য কোন দর্শনে আমরা এত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হ'তে দেখিনি।

অদ্বৈতবাদের সত্যতত্ত্ব হতে এর আরম্ভ। এক সত্য আছেন, মায়ার আবরণ-হেতু তা বহু বলে প্রতীয়মান। সর্বজীব স্বরূপতঃ সেই ব্রহ্ম, বিকাশের তারতম্য-হেতু বৈচিত্র্য প্রতীয়মান। সমাজ-জীবন ব্যক্তি-জীবনের আশ্রয়, তার বিকাশের সহায়, তাই ব্যক্তির স্বরূপ-বিকাশের সহায়তাকল্পে সমাজ-সংগঠন চলে। যুগে যুগে যখন সমাজ-জীবন এই উদ্দেশ্য সাধনের পথ হতে চ্যুত হয়, তখনই আসে অসাম্য, শ্রেণীসংঘর্ষ, বিশেষ-সুবিধা। যখন সমাজ এ লক্ষ্যের পথে পুনঃ অধিষ্ঠিত হয় তখনই আসে সাম্য, শান্তি ও মৈত্রী। ধর্ম মানুষের স্বরূপ বিকাশের সহায়, তাই ধর্মের প্রসার ঘটলে সমাজ-জীবনও তার লক্ষ্য পথে অধিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এই প্রাতিভাসিক জগতের সৃষ্টি মায়ার দ্বারা, যে মায়ার বৈশিষ্ট্য—ভাল-মন্দ, দুঃখ-সুখ, উন্নতি-অবনতি, জীবন-মৃত্যুর সহাবস্থান। সেজন্য এই মায়ার জগতে কোনও বিকাশই পূর্ণত্বে পৌঁছায় না, এমন সত্যযুগ কখনও আসে না যখন লোভ-মোহ বাসনা-কলুষ অধ্যুষিত মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবে বহু মানুষ যখন ধর্ম ভাবে অনুপ্রাণিত হয় তখন তাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে সত্য, দয়া, মৈত্রী, ক্ষমা, ধৃতি, করুণা, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণের স্ফুরণ হয়—শুধু যে সমাজই তখন সাম্য-শান্তির উপর অধিষ্ঠিত হয় তা নয়, বহু মানুষের মধ্যে আত্মশক্তির বিকাশে নব নব সৃজনীশক্তিও বিকশিত হয়। অতএব ধর্মই সভ্যতার প্রাণশক্তি, ধর্মই শোষণের অবসানের উপায়।

অতএব সমাজ-সংগঠনকারীদের সমাজ-জীবনের মূলগত উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সে-লক্ষ্য মানবের জীবনে তার স্বরূপ দেবত্ব বিকাশের যে অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা আছে তাকে সহায়তা করা। সুতরাং সব ধর্ম, সব রাষ্ট্র, সব সমাজকে মানবজীবনের এই দেবত্বের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে, এবং মানুষের সব স্বার্থকে দেবত্ব বিকাশের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

এই হ'ল বিবেকানন্দের 'Historical Scientific Spiritualism'এর মূল সিদ্ধান্ত। বস্তুতঃ এই 'Historical Scientific Spiritualism' কোন বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে না, ইতিহাসের কোন তথ্য অস্বীকার করে না বা যুক্তি-পরিপন্থী এমন কোন কিছুকে স্থান দেয় না। এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্য সক্রিয়তা বা dynamism।

এই সমাজ-দর্শনে পৃথিবীর যাবতীয় ইতিবাচক দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-চিন্তা স্থান পেয়েছে এবং এর মধ্যে নেতিবাচক কোন কিছুই নাই। সেজন্য এর নাম দিয়েছেন অধ্যাপক বিনয় সরকার 'Neo-Vedantic Positivism'।

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন আলোচনান্তে আমরা ঠিক সেই সিদ্ধান্তে এসে পেঁাছই যে সিদ্ধান্তে তাঁর জীবনী ও বাণী আলোচনান্তে পেঁাছেছিলেন রোঁমা রোঁলা—"In two words, equilibrium

and synthesis Vivekanada's constructive genius may be summed up"। বিবেকানন্দের সংগঠনী প্রতিভার দুটি বৈশিষ্ট্য : এক ভারসাম্য, দুই সমন্বয়। সত্যই আমরা দেখি আপাতবিরোধী ভাবনাসকল—অতীন্দ্রিয়তা ও বস্তুনিষ্ঠা, অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ, দর্শন ও বিজ্ঞান, মায়াসাহিত্য, সন্ন্যাস ও সমাজ-কল্যাণ-সাধন, নির্বিকল্প অনুভূতি ও ব্যবহারিক কর্ম, আর্থিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি—এ সকলই কি অপূর্ব সামঞ্জস্য-সূত্রেই না গ্রথিত হয়েছে তাঁর মধ্যে। কাজেই আমরা পদার্থবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেদান্তের সিদ্ধান্তের ঐক্য দেখি, দেখি ধর্মের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের, রক্তাক্ত বিপ্লবের সঙ্গে ধর্মপ্লাবনের, সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের, বহুর দাবীর সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের। তিনি কোন যুক্তিসহ মত অগ্রাহ্য করেন নি, বরঞ্চ প্রত্যেকটি মতকে পূর্ণতা প্রদান করেছেন—মার্কসীয় মতবাদকে পৌরোহিত্য ও সমাজে ধর্মের স্থান, বিপ্লবের কল্পনাও শ্রেণী-বিন্যাসের ধারণা ইত্যাদির দিকে সুসংস্কৃত করেছেন ; সোরোকিনের সমাজদর্শনে involution-তত্ত্ব সংযুক্ত করে তাকে পূর্ণায়ত করেছেন। তিনি কারও অনুবর্তী নন ; তাঁর মধ্যে সকল-মতই স্থান পেয়েছে তা শুধু নয়, সবগুলি তাদের ত্রুটি ও দৌর্বল্য মুক্ত হয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ জ্যোতির্ময় সূর্য যেমন সব কিছুকে আলোকিত করে, প্রদীপ্ত করে, বিবেকানন্দ আবহমানকালের সমুদয় চিন্তাকে ঠিক তেমনি করে আরও প্রদীপ্ত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। সেজন্য তিনি জড়বাদী, আবার অধ্যাত্মবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী আবার গণতন্ত্রী, ধর্মযাজক আবার বিপ্লবী। এ সকলের মধ্যে যে বিরোধিতা তা তিনি চিরতরে দূর করেছেন।

তাঁর সুবিশাল চিন্তাধারা একটি অভিনব ঐক্যবদ্ধ পদ্ধতি, যাতে বহুবিচিত্র্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ স্থান আছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য তাঁরই ভাষায় বর্ণনা করে বলা যেতে পারে "it is a unity in diversity"। এই বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য-সাধন বিবেকানন্দের জীবন-ইতিহাসের একটি সুবৃহৎ অংশ। এর অত্যন্ত

আকর্ষণীয় কাহিনী মেরী লুই বার্ক১ তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। বিপুল অধ্যয়ন, গণ-মানসের সঙ্গে সংযোগ ও আত্মজ্ঞান-লব্ধ-প্রজ্ঞা দ্বারা স্বামীজী এক দুঃসাধ্য বিস্ময়কর সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে প্রভূত আলোকপাত করে মেরী লুই বার্ক বলছেন—"Knowing as we do, that everything that concerned man was of deep concern to him and knowing of the vast knowledge he possessed of human life in all its phases, we can be sure that he studied and understood modern civilisation with the combined insight of a sociologist, psychologist, historian, philosopher and a mystic. As was said of him, he acquired greatest familiarity with the institutions of this country, religious, political and social. Nor was this familiarity acquired through contact with the intellectuals alone; as he said, during the course of his midewestern tour he spoke also with labourers and farmers; his finger was on the pulse of the nation"। তিনি বুদ্ধিজীবি শ্রমজীবি সকলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং একাধারে মনস্তত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ্, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের জ্ঞান এবং অভিনব অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে আধুনিক জীবনের সব সমস্যার সমাধানের প্রয়াস করেছিলেন। এ সমাধান লাভের জন্য তাঁকে আগ্রহ-ব্যাকুল অন্তরে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে মেরী লুই বার্কের মত—"Being born a world teacher, he must have felt a spontaneous urge to seek a comprehensive solution to all the many and complicated problems that beset and imperiled the world. Indeed, I feel sure that the latter part of 1894 was of great mental strains for him. New

---

১। Swami Vivekananda in America—New Discoveries, Chapter—"The Dawn of the World Mission".

ideal, new answers must have pressed forward his mind, some to be rejected and replaced by other, until by the beginning of 1895 the final answer—Vedanta emerged in clear outline."

এই হল মহাসমন্বয়াচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নববেদান্তবাদের জন্মের ইতিবৃত্ত। অসংখ্য নদীজলধারা বহু বিভিন্ন পথ বেয়ে যেমন অবশেষে সমুদ্রে এসে মিলিত হয় এবং সেখানে এক অখণ্ড বিপুলায়তন জলরাশিতে পরিণত হয়, ঠিক তেমনিই বহু কালের বহু বিচিত্র চিন্তা ও ভাবনা, বহু বিচিত্র উৎস হতে উদ্গত হয়ে, বহু বিচিত্র মানসে বিকাশ লাভ করে বিবেকানন্দের বিশাল জলধি-তুল্য চিন্তাধারার মধ্যে এসে মিলিত হয়েছে এবং পরিশেষে এক সামগ্রিক অভিনব চিন্তাধারায় পরিণত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের মনীষার প্রকৃত পরিচয় এইখানে। চিন্তার এই উৎকর্ষ, এই উত্তুঙ্গ হিমগিরিচূড়া-সদৃশ উচ্চতা, এই জলধিতুল্য গভীরতা ও আকাশ-সদৃশ অসীমতা আজও পৃথিবীতে অনতিক্রম্য হয়ে আছে, দূর ভবিষ্যতেও তা অতিক্রম করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ আছে। বিবেকানন্দ যে কত বিরাট প্রজ্ঞাবান সত্যদ্রষ্টা ঋষি তাঁর এই অদ্ভুত মনীষা ও সমন্বয় প্রতিভাই তার প্রমাণ। বহু যুগ অন্তর পৃথিবীতে এ ধরনের বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হয় এবং বহু যুগের উপযোগী চিন্তা এঁরা দিয়ে যান। সাধারণতঃ সমাজ-জীবনের বিপুল ক্রান্তিকালে এঁদের আবির্ভাব হয়, এবং এঁদের জীবনেই পুরাতন মূল্যবোধের নব-মূল্যায়ন ঘটে ও নূতন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এঁরা তাই আসেন কালান্তরের অধিনায়করূপে, মানুষের অগ্রগতির মহানায়করূপে। আজকের পৃথিবী এক মহাযুগসঙ্কটের সম্মুখীন। সমাসন্ন এই ক্রান্তিমুহূর্তে অধিনায়করূপে যিনি দেখা দিয়েছেন, তাঁর চিন্তা-চেষ্টা-কর্ম তাই আজ আমাদের বিশেষ অনুধাবনের বস্তু।

# পরিসমাপ্তি

## 'অশরীরী বাণী'

চিন্তার উৎকর্ষের এই উত্তুঙ্গ স্বর্ণচূড়া হতে যে রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে, তা এক দুর্বার অগ্রগতির উৎসমূলে প্রাণ-সঞ্চার করছে, এক মহান কর্তব্য সম্পাদনে সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে—"মানুষের বন্দী আত্মার সুপ্তশক্তিসকলকে জাগ্রত ও মুক্ত করিতে হইবে, সত্তাকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে।" এই স্বর্ণদ্যুতিময় জ্যোতির্লেখ বাণী মানুষের সব খর্বতা, সব দুর্বলতা, সব মোহান্ধতার উপর বজ্র-কঠিন আঘাত হানছে, বলছে—"ওঠো জাগো, আর দেরী নয়, এসো আগুনে ঝাঁপ দাও।" তাই বিবেকানন্দ আজ বিশ্বের সকল দেশের শক্তিমান সত্যপূজারী কল্যাণতপস্বীদের কাছে এক অশরীরী বাণী,[১]—দেশহীন, কালহীন এক চিরন্তন বাণী, যা এক অমোঘ আহ্বান নিয়ে নীরবে প্রাণের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়—"এসো আমার প্রাণের আগুন থেকে তোমার প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নাও।" এ আহ্বান এক ক্ষমাহীন নিয়তির মতো, তাকে ফেরানো যায় না,—যার প্রাণের তন্ত্রীতে বাজে, তাকে চলতেই হয় নির্মম দুঃসহ কঠিন দুঃখের পথে, সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে।

তাই 'মূলদেশে অগ্নি' তিনি স্বহস্তে সংযোগ করে গিয়েছেন। সে বৈদিক যজ্ঞাগ্নি বহুকালের পারে ঊর্ধ্বশিখা-অভ্রভেদী এক আকাশ-প্রদীপ হয়ে অনির্বাণ জ্বলবে,—কতকাল, তা খণ্ডকালের সীমায় সীমিত মানুষ আমরা দেখতে পাচ্ছি না; হয়ত সে অনন্তকাল[২], কারণ একমাত্র আত্মার অমৃতময় জাগরণের কাছে কাল পরাজিত।

তাই তাঁর তিরোভাবের ষাটবৎসর পরেও দেশেবিদেশে আজ কত নূতন মানুষ তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—কত বিচিত্রবেশী, কত বিচিত্রমনা মানুষ। সর্বোপরি আজ জাগছে জনগণ—যুগ যুগ ধরে পদদলিত

---

১। "I am a voice, without a body"—বিবেকানন্দ

২। "Vivekananda's message shall echo through the halls of time until time shall be no more"—জনৈক পাশ্চাত্যদেশীয় অনুরাগী

নিপীড়িত বঞ্চিত অগণন নরনারী—তাঁর আরাধ্য "পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র-নারায়ণ।" তারা জাগছে আজ বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, হয়ত তার সবটাই আমাদের মূল্যমান-অনুযায়ী সর্বোচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা নয়, হয়ত তাদের জাগরণ আজ অতি উদ্ধত দুর্বিনীত স্পর্দ্ধার মতো প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু সন্দেহ নাই, এ জাগরণ আজ ছোটখাট আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাগলেও ক্রমেই ঊর্ধ্বগামী হ'বে,—আজকের উত্তম অশন-বসন, আরাম উপভোগের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা একদিন জ্ঞানবিদ্যা, সৃষ্টি ও মুক্তির গগনবিহারী আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হ'বে। একজন মহাপ্রাণ বিরাট পুরুষ আপনার হৃদয়-শোণিত দিয়ে এ আশা লালন করেছিলেন। এ রক্ত-রাঙা আশা ফলতেই হ'বে। এই আশ্বাসই আজকের এই চরম নৈরাশ্যের দিনে বিশ্বের কল্যাণ-তপস্বী মানস-কর্মীদের হৃদয়-মনকে প্রদীপ্ত করে রেখেছে—"বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর প্রভুর আজ্ঞা ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, সাধারণ ও দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে; আর আনন্দিত হও যে তোমরাই তাঁহার কার্য করিবার নির্বাচিত যন্ত্র। ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুই উহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না—অনন্ত অনন্ত সর্বগ্রাসী প্লাবন।" দিন আগত ঐ, তাই "সকলেই সম্মুখে যাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক।"[১]

ঊর্ধ্বলোক হতে পদ্মপলাশনেত্র মহাবীর-সন্ন্যাসী আজও অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছেন যুগযুগান্তের পথের দিকে, তাঁর মহাযজ্ঞের হোতাদের অপেক্ষায়, কবে তারা আসবে, কবে তাঁর এই বিপ্লব সফল হ'বে।[১] সেই অনাগত মহাদিনের সেই-সকল মহাবল মহাপ্রাণ মানুষদের উদ্দেশ্যে স্বাগত প্রণাম রেখে এই গ্রন্থ এখানে সমাপ্ত করলাম।

---

১। "যতদিন না আমার দেহত্যাগ হয়, ততদিন অবিশ্রান্ত কাজ করে যাব, আর মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে থাকব"—পত্রাবলী

## গ্রন্থ-পঞ্জী

Swami Vivekananda—Complete Works (8 Volumes).

Eastern & Western Disciples—Life of Swami Vivekananda

Romain Rolland—Life of Swami Vivekananda.

Sister Nivedita—The Master as I Saw Him.

Sister Nivedita—The Web of Indian Life.

Marie Louise Burke—Swami Vivekananda in America : New Discoveries.

Dr. Bhupendra Nath Dutta—Swami Vivekananda : The Patriot-Prophet.

Romain Rolland—Life of Sri Ramkrishna.

Benoy Kumar Sarkar—Villages and Towns as Social Patterns.

Benoy Kumar Sarkar—Political Philosophies since 1905.

Benoy Kumar Sarkar—Creative India.

R. C. Majumdar, Pushalkar & others—History of Indian People and Culture.

Ramakrishna Mission Institute of Culture—Cultural Heritage of India.

Rahul Sanskrityana—From Volga to Ganga.

P. A. Sorokin—Social and Cultural Dynamics.

P. A. Sorokin—Contemporary Sociological Theories.

P. A. Sorokin—Sociology of Revolution.

Karl Manheim—Systematic Sociology.

Karl Manheim—False and True Concept of History and Society.

MacIver—Society.

Ogburn and Nimkoff—Handbook of Sociology.

Karl Marx—Capital.

Marx and Engels—Selected Works.

Lenin—Imperialism.

Lenin—State and Revolution.

Lenin—Religion.

Lenin—Empirico-Criticism.

Bertrand Russel—Theory and Practice of Bolshevism.

Bertrand Russel—The Impact of Science on Society.
James Jeans—The Mysterious Universe.
James Jeans—Physics and Philosophy.
Eddington—The Nature of the Physical world.
C. E. M. Joad—Philosophical Aspects of Modern Science.
C. E. M. Joad—Guide to Philosophy.
C. E. M. Joad—Introduction to Modern Political Theory.
Martin Gardner—Great Essays in Modern Science.
Haldane—Philosophical Basis of Modern Biology.
Atindra Nath Bose—Crossroads of Science and Philosophy.
M. White—The Age of Analysis.
Henry D. Aicken—The Age of Ideology.
Falckenberg—History of Modern Philosophy.
Toynbee—Study of History.
Toynbee—The World and the West.
Oswald Spengler—Decline of the West.
Gordon Childe—What Happened in History.
Benimadhab Barua—Philosophy of Progress.
R. H. Tawney—Religion and the Rise of Capitalisim.
Lowie—Primitive Religion.
Lowie—Primitive Society.

Hoeble—An Anthropologist Looks at the Basic Problems of Modern Life ( Paper read at the East-West Conference—1961 ).

Brojendra Nath Seal—The Meaning of Race, Tribe and Nation ( Paper read at the First Universal Races Congress—1911 ).

UNESCO—The Race Concept.
Sabine—History of Modern Political Theory.
Laski—Grammar of Politics.
D. Burns—Political Ideals.
Hobhouse—Social Evolution and Political Theory.
Schumpeter—Socialism, Capitalism and Democracy.
Maurice Dobb—History of Soviet Economic Development.
Maxmuller—History of Ancient Sanskrit Literature.
D. C. Sen—History of Bengali Language and Literatue.

স্বামী বিবেকানন্দ—বাণী ও রচনা—দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম খণ্ড।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—বিবেকানন্দ-চরিত।

প্রমথনাথ বসু—স্বামী বিবেকানন্দ।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়—স্বামীজীর জীবন-কথা।

স্বামী সুন্দরানন্দ—জাতি-সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় উনবিংশ শতাব্দী।

স্বামী সারদানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ।

স্বামী বিরজানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী (পরিশিষ্ট—'অতীতের স্মৃতি'—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ)।

তারকচন্দ্র রায়—পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস।

ডাঃ রমা চৌধুরী—বেদান্ত-দর্শন।

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—ভারতদর্শনসার।

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত—নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য—পদার্থ-বিদ্যার নবযুগ।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—লোকায়ত-দর্শন।

রবীন্দ্রনাথ—ইতিহাস।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত—ইতিহাসের মুক্তি।

বিনয় ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি।

বিনয় ঘোষ—বাংলার নবজাগৃতি।

নির্মলকুমার বসু—হিন্দু-সমাজের গড়ন।

ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা।

ক্ষিতিমোহন সেন—ভারতের সংস্কৃতি।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস।

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস।

মোহিতলাল মজুমদার—বাংলার নবযুগ।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ—ভারতের সাধনা।

দীনেশচন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ।

সুখময় শাস্ত্রী—মহাভারতের সমাজ।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—বেদের দেবতা।

ডাঃ সুকুমার সেন—বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস।
স্বামী গম্ভীরানন্দ—উপনিষদ-সংগ্রহ।
স্বামী কমলেশ্বরানন্দ—শ্রুতি-সংগ্রহ।
রাজশেখর বসু—মহাভারত।
রাজশেখর বসু—রামায়ণ।
Encyclopaedia of Social Sciences—গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহ।
Bernard Stern—Lewis Henry Morgan.
Emil Ledder—Technology.
Franz Boas—Race.
Mellville I Herskovits—Race Mixture.
H. W. Schneider—Religious Revival.
Alfred Marshall—Priesthood.
Alfred Mensol—Proletariat
Lewis L. Lorwin—Class-Struggle
Manhart—Class.
Alfred Mensol—Revolution and Counter-revolution.
Crane Brinton—Revolutions.
Hans Kohn—Russian Revolution.
Mauice Dobb—Bolshevism.
Kroeber—Culture Area.
Joseph Needham—Evolution.
Alexander Goldenweiser—Social Evolution.
Karl Beer—Progress.
Max Lerner—Social Process.

## সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ

P. A. Sorokin—Three Basic Trends of Our Time. ( Vedanta and the West No. 139 )
স্বামী বাসুদেবানন্দ—ঋগ্বেদ-পরিচয় ( বসুমতী )।
ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়—এশিয়ার ধর্মজীবন ( দেশ )।
গুরুদাস বর্মণ—শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত ( উদ্বোধন, ১৩১৬ )।
স্বামী সুন্দরানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজতন্ত্রবাদ ( আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫২ )।

# নির্দেশিকা

*গ্রন্থমধ্যে অপর একজন নির্মলকুমার বসুর উল্লেখ করা হয়েছে দশম ও একাদশ অধ্যায়ে।